আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই-২০১৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জুলাই-২০১৪ খ্রি.

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ মাসুদ আলম
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক
মোঃ আমিনুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রেজি. নং-৫৪
শিক্ষাবর্ষ:২০১১-২০১২ খ্রি.
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম. ফিল গবেষক মোঃ আমিনুল ইসলাম এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ইমামদের ভূমিকাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমাদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি তার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমাদের জানা মতে এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ বিশেষ অন্যত্র ডিগ্রি লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করায় অভিসন্দর্ভটি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার অনুমতি দেয়া হল।

(ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

(ড. মোঃ মাসুদ আলম)
যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। আমি এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
এম.ফিল গবেষক
রেজি. নং-৫৪
শিক্ষাবর্ষ: ২০১১-২০১২ খ্রি.
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

V

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। যার অপার কৃপায় **"আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট"** শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি যথা সময়ে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি, তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কিরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীদের প্রতি।

যথাযথ সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ স্যারের প্রতি ও আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের যুগ্ম তত্ত্বধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদ আলম স্যারের প্রতি। যাঁরা আমাকে হাত ধরে গবেষণাকর্ম শিখিয়েছেন। শতব্যস্ততা সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়কদ্বয় সর্বক্ষণ আমার গবেষণা কর্মের তদারকি করেছেন। তাঁদের নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা আন্তরিকভাবে সময় দিয়ে এ অভিসন্দর্ভটির আদ্যপান্ত পাঠ করে এতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতির নিঁখুত প্রয়োগ, অধ্যায় বিন্যাস ও এর অবয়বসহ ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার কারণেই। এজন্য আমি তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়া আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে স্মরণ করছি আমার জান্নাতবাসী আব্বা আলহাজ্ব মোঃ শামেস উদ্দিনকে যার কঠোর শাসন আর অতুলনীয় আদরে আমি আজ এতদূর আসতে পেরেছি। আমি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সর্বোচ্চ সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বৃদ্ধা মা আমেনা বেগমের প্রতি। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বড় ভাই কলেজ শিক্ষক মোঃ নজরুল ইসলাম, মেঝ ভাই ব্যাংক কর্মকর্তা মোঃ আজিজুল ইসলাম, সেঝ ভাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারী বিভাগের চেয়ারম্যান, সহযোগী অধ্যাপক, ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম-এর প্রতি। তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা আর সঠিক দিক নির্দেশনা আমাকে এ গবেষণা কর্মে উৎসাহ যুগিয়েছে। আরও কৃতজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করছি আমার দুই বোন সাজেদা বেগম ও নাসিমা আক্তারের প্রতি যারা আমাকে সর্বদা একাজে উৎসাহ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সস্ত্রীক জাপান প্রবাসী ভাগ্নে শাহীনসহ নাজমুল, নাকিবুল ও সোহানের প্রতি আমাকে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করার জন্য।

আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ছোট ভাই রাফেজ আলম ও ওয়ারেছের প্রতি তারা অভিসন্দর্ভটির বিষয় নির্বাচনে আমাকে সহযোগিতা করেছে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বড় ভাই মওলানা কামরুল ইসলামের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তিনি আমাকে প্রস্তাবনা লেখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের সকলের সুস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করছি।

আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দেশী-বিদেশী সম্মানিত লেখকদের প্রতি যাদের মূল্যবান রচনাবলী আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভকে সমৃদ্ধ করেছে। সর্বোপরি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই সেই অগণিত শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি যারা ছোটবেলা থেকে অদ্যবধি আমাকে শিক্ষার আলো দেখিয়েছেন।

অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরি, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি, গণগ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ যারা আমার এ গবেষণাকর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

সবশেষে আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আল্লাহ্ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন
(‘আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا- অ	ز- য	ق- ক	ـُ-أ	يا- ইয়া
ب-ব	س- স	ل- ল	ـُ-او	يی-য়ী
ت-ত	ش-শ	م-ম	ای-ঈ, য়ী	ی-যূ
ث-স	ص-স	ن- ন	او-ঊ	يو-ইউ
ج-জ	ض-দ,য	و-ও, ব	و-ওয়া	ع-‘আ
ح-হ	ط- ত	ه-হ	وا-ওয়া	عا-‘আ
خ- খ	ظ-য	ء-’	وی- বী, ভী	ع-‘ই
د-দ	ع-‘	ی-য়	و- উ	عی- ‘ঈ
ذ-য	غ- গ	أ-া	وو- ঊ	ع- ‘উ
ر- র	ف- ফ	إ- ি	ي- য়্যা	عو- ‘ঊ

বি. দ্র.

- ء আলিফের মতো। তবে সাকিন হলে _’_ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যথা- تأويل = তা’বীল এবং ع এ সাকিন হলে _‘_ ব্যবহৃত হয়, যথা: نعت = না‘ত।
- উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কোন কোন বানান বালাভাষায় অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।
- যেসব ‘আরবী শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল-কুর'আন, ০২:১৫২		প্রথম সংখ্যা সূরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
সা.	:	সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম
'আ.	:	'আলাইহিস সালাম
রা.	:	রাযী আল্লাহু আনহু
ইমাম বুখারী	:	আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	:	আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	:	আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	:	আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ আছ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	:	আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ	:	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমাদ	:	আহমাদ ইব্ন হাম্বল
ইমাম ত্বহাবী	:	আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আত-ত্বহাবী
ইব্ন কাছীর	:	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	:	আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী
র.	:	রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
হি.	:	হিজরী
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
মৃ.	:	মৃত্যু
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
ই.ফা.বা.	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	:	খণ্ড
সং	:	সংস্করণ
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
লি.	:	লিমিটেড
অনু.	:	অনুবাদ
p.	:	page
Pp.	:	Pages
ibid	:	ibidem
Ob.cit	:	Open cito
v	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

সূ চি প ত্র

প্রত্যয়নপত্র III
ঘোষণাপত্র IV
কৃতজ্ঞতা স্বীকার V-VI
শব্দ সংকেত VII
প্রতিবর্ণায়ন VIII
সূচিপত্র IX-X
ভূমিকা XI-XIII

প্রথম অধ্যায় : সমাজ পরিচিতি.....১-৯

প্রথম পরিচ্ছেদ : সমাজের ধারণা ও সংজ্ঞা..... ২-৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সমাজের লক্ষ্য, উদ্দ্যেশ্য ও বৈশিষ্ট্য..... ৫-৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ মানব জীবনে সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা..... ৮-৯

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইসলামে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার ধারণা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ১০-৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজ..... ১১-১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ধারা..... ১৩-১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আদর্শ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য..... ১৫-৩০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা.....৩১-৩২

তৃতীয় অধ্যায়ঃ মসজিদঃ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা..... ৩৩-১৬৬

প্রথম পরিচ্ছেদ : মসজিদ পরিচিতি..... ৩৪-৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস..... ৪০-৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মসজিদের মিহরাব ৮১-৮৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মসজিদের মিম্বার ৮৯-৯৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মসজিদের ক্রমবিকাশ..... ৯৮-১৪৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইসলামী সমাজে মসজিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা..... ১৪৮-১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ইমাম পরিচিতি..... ১৬৭-১৭৯

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইমাম শব্দের অর্থ ও পরিচয়..... ১৬৮-১৬৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইমামতের প্রকার ও শর্তাবলী..... ১৭০-১৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলী এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য..... ১৭৩-১৭৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কুর'আন হাদীসের আলোকে ইমামদের মর্যাদা..... ১৭৬-১৭৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা ও ইমাম সমাজ..... ১৭৮-১৭৯

পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইমামদের ভূমিকা.....১৮০-২৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ পরিচিতি..... ১৮১-১৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার.....১৮৭-১৯২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইমামগণের ভূমিকা...১৯৩-২০৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইমামদের অবদান.....২০৮-২১৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ ২১৭-২২৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে মসজিদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংগঠন.....২২৫-২৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইমাম প্রশিক্ষণ ও তার অবদান...২৩৯-২৫১

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইমাম প্রশিক্ষণ পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য..... ২৪০-২৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য..... ২৪৩-২৪৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইমাম প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য.. ২৪৫-২৫১

উপসংহার..... ২৫২-২৫৪

গ্রন্থপঞ্জি..... ২৫৫-২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

XI

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি ইসলামকে বিশ্বজনীন শান্তির ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি। যিনি ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। দেশটির আকার বড় না হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০% মুসলমান। এ দেশের মুসলমানগণ ধার্মিক এবং ধর্মের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। ধর্মীয় দায়িত্ববোধ থেকেই দেশের প্রতিটি জনপদে গড়ে উঠেছে তিন লক্ষাধিক মসজিদ। আর প্রতিটি মসজিদেই অন্তত একজন ইমাম ও একজন মুয়াজ্জিন তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, দাওয়াতি কার্য পরিচালনা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বিচার-সালিশসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করা হতো মসজিদ থেকে। আর এ সকল কাজের নেতৃত্ব দিতেন মসজিদে নববীর ইমাম, বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী বন্ধু শান্তির দূত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)।

ইমাম শব্দের অর্থ নেতা। একজন আদর্শ নেতা যে সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকেন, এর চেয়ে আরো বেশি গুণাবলী থাকলেই কেবল তাকে মসজিদের ইমাম নির্বাচন করা হয়। তাই ইসলামে ইমামের মর্যাদা এত উচ্চ যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাতে মানুষের নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে ইমামগণকে যদিও জুমু'আ বা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়, কিন্তু ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নাবিয়্যিন সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, ইসলামের সকল কর্মকাণ্ডই ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাদের বলে দেয়, মসজিদই ছিল সকল কর্মকাণ্ডের মিলনায়তন। ইসলামের কার্যক্রম শুরু হয় মসজিদ থেকে এবং বিস্তৃতিও ঘটেছে এই মসজিদের মাধ্যমেই। তাই শুক্রবারের জুমু'আর সমাবেশে খুৎবা হয়ে উঠতো জাতির দিক নির্দেশক ভাষণ। এই মসজিদেই অনুষ্ঠিত হতো উপদেষ্টা পরিষদের সভা, এটাই ছিল রাষ্ট্র প্রধানের অফিস। দেশ ও জাতির উন্নয়নের পরিকল্পনা হতো মসজিদেই।

সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে একজন ইমামের পরিচিতি, যোগাযোগ ও মেলামেশা অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। সমাজের মানুষ অন্যান্য নেতাদের কথা ও মত যেভাবে গ্রহণ করে ইমামদের দিক নির্দেশনা তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। তাই একজন ইমামকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে স্বাধীনভাবে সমাজ সেবা করার সুযোগ প্রদান,

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের কল্যাণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়নে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইমামদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া হতো। আজও যদি ইসলামের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে ইমামদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া যায়, তবে এর ইতিবাচক প্রভাব আমাদের বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতিটি স্তরে প্রস্ফূটিত হবে। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, অনাচার, শোষণ, নির্যাতন দূরীভূত হয়ে সত্য ও সুন্দরের আলোতে সমাজ আলোকিত হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে পৌঁছে যাবে উন্নয়নের বার্তা।

মসজিদের ইমাম সাহেবগণ আমাদের সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর্থ-সামাজিক নানা যুগোপযোগী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে ফলপ্রসু অবদান রাখতে উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা যায়। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষার পাশাপাশি পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যু, নিরাপদ মাতৃত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্যানিটেশন, যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন, কৃষি ও বনায়ন, মৎস চাষ, হাস, মুরগি ও গবাদিপশু পালন ইত্যাদি উপার্জনমুখী ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নমূলক নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে যুগান্তকারী অবদান রাখার সুযোগ প্রদান করা যায়। এর ফলে সমাজে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মসজিদের ইমামগণ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। ইমামগণ হলেন, শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত নেতৃবৃন্দ, যারা তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থানে থেকে তাদের সময়োপযোগী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় একজন ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য কত বেশি। ইমামদের এই ভূমিকাকে আরও সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করার আকাঙ্খা থেকেই **"আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট"** শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রয়াস । এ অভিসন্দর্ভটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি কল্যাণকর ধারণা উপস্থাপন করবে বলে আমি আশাবাদী। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের জন্য আলোচ্য বিষয়কে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম: সমাজ পরিচিতি। এ অধ্যায়ে সমাজের ধারণা ও সংজ্ঞা, সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সমাজের বৈশিষ্ট্য, মানব জীবনে সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার ধারণা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। এ অধ্যায়ে ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের পরিচিতি, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার বিকাশধারা, আদর্শ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসহ আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় মসজিদ পরিচিত। এ অধ্যায়ে মসজিদের শাব্দিক ও ব্যবহারিক পরিচয়, মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মসজিদের মিহরাব ও মিম্বার পরিচিতি, মসজিদের ক্রমবিকাশ ও ইসলামী সমাজে মসজিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ইমাম পরিচিতি। এ অধ্যায়ে ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ইমামতের প্রকার ও শর্তাবলী,ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলী, ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য, কুর'আন হাদীসের আলোকে ইমামদের মর্যাদা এবং বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ও ইমামদের অবস্থান নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইমামদের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে ইমামদের অবদান, বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইমামদের ভূমিকা, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইমামদের দায়িত্ব, বাংলাদেশের সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাংলাদেশের মসজিদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠায় ইমামদের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইমাম প্রশিক্ষণ। এ অধ্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচিতি, প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য, ইমাম প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির কতিপয় সীমাবদ্ধতা এবংতা উত্তোরণে কিছু প্রস্তাবনাও পেশ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার এবং একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি গবেষণায় কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। আমার এ গবেষণা কর্মটিও এর ব্যতিক্রম নয়। তথাপিও আল্লাহর মেহেরবানীতে আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে একটি সুন্দর অভিসন্দর্ভ রচনা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ভুল-ত্রুটি ও অনিচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের জগতে এক নতুন বিষয় সংযোজিত হবে এবং এর দ্বারা মুসলিম সমাজ, গবেষক ও সাধারণ পাঠক অত্যন্ত উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আবারো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করছি। "আল্লাহুম্মা আমীন।"

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

গবেষক

মোঃ আমিনুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রেজি. নং-৫৪
শিক্ষাবর্ষ:২০১১-২০১২ খ্রি.
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। দেশটির আকার বড় না হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০% মুসলমান। এ দেশের মুসলমানগণ ধার্মিক এবং ধর্মের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। ধর্মীয় দায়িত্ববোধ থেকেই দেশের প্রতিটি জনপদে গড়ে উঠেছে তিন লক্ষাধিক মসজিদ। আর প্রতিটি মসজিদেই অন্তত একজন ইমাম ও একজন মুয়াজ্জিন তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, দাওয়াতি কার্য পরিচালনা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বিচার-সালিশসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করা হতো মসজিদ থেকে। আর এ সকল কাজের নেতৃত্ব দিতেন মসজিদে নববীর ইমাম, বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী বন্ধু শান্তির দূত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)।

ইমাম শব্দের অর্থ নেতা। একজন আদর্শ নেতা যে সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকেন, এর চেয়ে আরো বেশি গুণাবলী থাকলেই কেবল তাকে মসজিদের ইমাম নির্বাচন করা হয়। তাই ইসলামে ইমামের মর্যাদা এত উচ্চ যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাতে মানুষের নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে ইমামগণকে যদিও জুমু'আ বা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়, কিন্তু ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নাবিয়্যিন সায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, ইসলামের সকল কর্মকাণ্ডই ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাদের বলে দেয়, মসজিদই ছিল সকল কর্মকাণ্ডের মিলনায়তন। ইসলামের কার্যক্রম শুরু হয় মসজিদ থেকে এবং বিস্তৃতিও ঘটেছে এই মসজিদের মাধ্যমেই। তাই শুক্রবারের জুমু'আর সমাবেশে খুৎবা হয়ে উঠতো জাতির দিক নির্দেশক ভাষণ। এই মসজিদেই

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত হতো উপদেষ্টা পরিষদের সভা, এটাই ছিল রাষ্ট্র প্রধানের অফিস। দেশ ও জাতির উন্নয়নের পরিকল্পনা হতো মসজিদেই।

সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে একজন ইমামের পরিচিতি, যোগাযোগ ও মেলামেশা অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। সমাজের মানুষ অন্যান্য নেতাদের কথা ও মত যেভাবে গ্রহণ করে ইমামদের দিক নির্দেশনা তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। তাই একজন ইমামকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে স্বাধীনভাবে সমাজ সেবা করার সুযোগ প্রদান, জনগণের কল্যাণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়নে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইমামদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া হতো। আজও যদি ইসলামের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে ইমামদেরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া যায়, তবে এর ইতিবাচক প্রভাব আমাদের বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতিটি স্তরে প্রস্ফূটিত হবে। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, অনাচার, শোষণ, নির্যাতন দূরীভূত হয়ে সত্য ও সুন্দরের আলোতে সমাজ আলোকিত হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে পৌঁছে যাবে উন্নয়নের বার্তা।

মসজিদের ইমাম সাহেবগণ আমাদের সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর্থ-সামাজিক নানা যুগোপযোগী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে ফলপ্রসু অবদান রাখতে উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা যায়। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষার পাশাপাশি পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যু, নিরাপদ মাতৃত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্যানিটেশন, যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন, কৃষি ও বনায়ন, মৎস চাষ, হাস, মুরগি ও গবাদিপশু পালন ইত্যাদি উপার্জনমুখী ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নমূলক নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে যুগান্তকারী অবদান রাখার সুযোগ প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। এর ফলে সমাজে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মসজিদের ইমামগণ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। ইমামগণ হলেন, শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত নেতৃবৃন্দ, যারা তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থানে থেকে তাদের সময়োপযোগী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় একজন ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য কত বেশি। ইমামদের এই ভূমিকাকে আরও সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করার আকাঙ্খা থেকেই **"আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ইমামদের ভূমিকাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট"** শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রয়াস । এ অভিসন্দর্ভটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি কল্যাণকর ধারণা উপস্থাপন করবে বলে আমি আশাবাদী। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের জন্য আলোচ্য বিষয়কে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম: সমাজ পরিচিতি। এ অধ্যায়ে সমাজের ধারণা ও সংজ্ঞা, সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সমাজের বৈশিষ্ট্য, মানব জীবনে সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার ধারণা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। এ অধ্যায়ে ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজের পরিচিতি, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার বিকাশধারা, আদর্শ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসহ আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় মসজিদ পরিচিত। এ অধ্যায়ে মসজিদের শাব্দিক ও ব্যবহারিক পরিচয়, মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মসজিদের মিহরাব ও মিম্বার পরিচিতি, মসজিদের ক্রমবিকাশ ও ইসলামী সমাজে মসজিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ইমাম পরিচিতি। এ অধ্যায়ে ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ইমামতের প্রকার ও শর্তাবলী,ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলী, ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য, কুর'আন হাদীসের আলোকে ইমামদের মর্যাদা এবং বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ও ইমামদের অবস্থান নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইমামদের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে ইমামদের অবদান, বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইমামদের ভূমিকা, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইমামদের দায়িত্ব, বাংলাদেশের সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাংলাদেশের মসজিদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠায় ইমামদের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইমাম প্রশিক্ষণ। এ অধ্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচিতি, প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য, ইমাম প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির কতিপয় সীমাবদ্ধতা এবং তা উত্তোরণে কিছু প্রস্তাবনাও পেশ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার এবং একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি গবেষণায় কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। আমার এ গবেষণা কর্মটিও এর ব্যতিক্রম নয়। তথাপিও আল্লাহর মেহেরবানীতে আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে একটি সুন্দর অভিসন্দর্ভ রচনা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ভুল-ত্রুটি ও অনিচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের জগতে এক নতুন বিষয় সংযোজিত হবে এবং এর দ্বারা মুসলিম সমাজ, গবেষক ও সাধারণ পাঠক অত্যন্ত উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সমাজ পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	সমাজের ধারণা ও সংজ্ঞা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	সমাজের লক্ষ্য-উদ্দ্যেশ্য ও বৈশিষ্ট্য
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	মানব জীবনে সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সমাজের ধারণা ও সংজ্ঞা

সমাজের ধারণা ও সংজ্ঞা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে সমাজবদ্ধভাবেই বেঁচে থাকতে হবে। এজন্যই এরিস্টিটল বলেছেন, 'মানুষ সামাজিক জীব। যে মানুষ সমাজে বসবাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা।'[১] মানুষ জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথেই সমাজবদ্ধ হওয়ায় প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। সুতরাং সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষের বসবাস করার বিষয়টি আকস্মিক নয় বরং কাঙ্খিত ব্যাপার। শুধু মানুষ নয়, যে কোন প্রাণীর ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। তাই ম্যাকাইভার বলেছেন, "It has been contended that whenever there is life there is society because life means heredity and so far as we know, can arise only out of and in the presence of there life."[২]

বুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ বলতে যা বুঝায়, তা হল একত্রে গমন, একত্রে বসবাস ইত্যাদি। তাই মানুষে মানুষে একত্রে গমন, একত্র বসবাসের ফলে গড়ে উঠে সমাজ। সমাজবদ্ধতার মূলভিত্তি হল যুথবদ্ধতা বা দলবদ্ধতা। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন রকম কাজ কর্মের স্বার্থে এবং আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলনের প্রয়োজনীয়তা থেকে সমাজবদ্ধ জীবনের সৃষ্টি হয়। প্রাণীকূলের মধ্যেও দলবদ্ধতার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। পিপীলিকা আর মৌমাছি হল এর জলন্ত প্রমাণ। এই মাসাজিক সম্পর্ক ক্রমশ: বিচিত্র ও জটিল আকার ধারণ করে। এভাবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা বিচিত্র ও জটিল সামাজিক সম্পর্ককেই সাধারণভাবে বলা হয় সমাজ।

সমাজের পরিচিতি

সমাজ প্রত্যয়টির ধারণা খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমাজ বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ সমাজকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজের পরিচিতি সম্পর্কিত কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

Dictionary of Sociology তে বলা হয়েছে: Society is a group of people with a common and at least some what distinct culture. Who occupy a particular territorial area, have feeling of unity and regard themselves as a distinguishable extity. Like all groups, a society has structure of interrelated roles with proper role behavior prescribed by social norms. However a society is a special type of group with a comprehensive social system that includes all of the basic social instutions required to meet basic human needs. It is independent not in the sense that it is necessarity complety economically self-sufficient, but in that it includes all of the organizational forms necessary for its own survival. In addition, a society has the means to svervive for a long period of time and recruits its members at least in part by biological reproduction within the group it self.

---

১. ড. অনাদি কুমার মহাপাত্র, *বিষয় সমাজ তত্ত্ব*, কলকাতা: ইন্ডিয়া বুক কনসার্ন, ২০০৩, পৃ. ৯৩

২. MacIver and page, *Society*, Chapter-1; মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলাম: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-২০০৬, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ হল, নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত এমন এক জনগোষ্ঠী, যাদের একটি ন্যূনতম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সাধারণ জীবনধারা, সংস্কৃতি ও ঐক্যের অনুভূতি রয়েছে এবং যারা নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করে। সকল মানব গোষ্ঠী সামাজিক আদর্শ দ্বারা নির্ধারিত পরস্পর সম্পর্কিত ভূমিকা এবং ভূমিকা সংশ্লিষ্ট আচার-আচরণের সমন্বয়ে সমাজের একটি কাঠামো থাকে। বিশেষ ধরণের মানবগোষ্ঠী বিধায়, মানুষের মৌল চাহিদা পূরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটা সামগ্রিক সিসটেম হল সমাজ। সমাজ স্বনির্ভর, তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিপূর্ণ স্বনির্ভরতার অর্থে নয়; বরং সমাজের স্থায়িত্বের বা টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সাংগঠনিক গঠন কাঠামোর দিক হতে সমাজ স্বনির্ভর। এছাড়া দীর্ঘ সময়ব্যাপী টিকে থাকার মতো বিভিন্ন উপায় সমাজে বিদ্যমান থাকে। সমাজ-এর সদস্যদের জৈবিক প্রজননের জন্য গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্গী নির্বাচনের সুযোগ করে দেয়।[৩]

অপর এক সংজ্ঞায় ম্যাকাইভার এবং C.H. Page বলেন, Society is a system of usages and procedures of authority and mutal aid, of many grouping and divisions, of controls of human behaviour and of liberties, This ever-changing complex system we call society. It is the wave of social relationships and it is always changing.

সমাজ হল মানুষের আচার ও কার্য-প্রণালী, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সাহায্য, বিভিন্ন সংঘ ও বিভাগ, মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা এসব কিছুর সমন্বয়ে গঠিত সদা পরিবর্তনশীল একটি জটিল ব্যবস্থা। সমাজ হল সদা পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের একটি প্রবাহমান ধারা।[৪]

সমাজ বিজ্ঞানী ল্যাপিয়ার (Lapiere) এর মতে, "The term society refers not to group but to the complex pattern of the norms of interaction that arise among and between them".

"সমাজ বলতে একদল লোকের সমষ্টিকে নির্দেশ করেনা, বরং মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার আদর্শের জটিল ধরণকে বোঝায়; যা মানুষের নিজেদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে ঘটে থাকে।"[৫]

সমাজ বিজ্ঞানী জিসবার্ট (Gisbert) বলেন, "Society in general consists in the complicated network of social relationship by which every human being in inte-connceted with his fellowmen."

"সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল হাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।"[৬]

সমাজ বিজ্ঞানী গিডিংস (F.H. Giddings)-এর মতে, "Society is a number of like-minded individuals who know and enjoy their like-mindedness and therefore able to work together for common ends".

---

৩. William P. Scott, *Dictionary of Sociology*; আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪. R.M. Maciver and Charles H. Page, *Society: An Introductory Analysis*, Delhi: Macmillan india Limited, 1986, P. 5

৫. F. H Giddings*: Principles of sociology*, 3rd end P.5; আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৬. P. Gisbert; *Fundamentals of Sociology*. P.8; আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

"সমাজ হল সমমনোভাবাপন্ন এমন একদল লোকের সমাবেশ, যার সদস্যরা তাদের অভিন্ন মানসিকতা সম্পর্কে জানে এবং সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করে।"[৭]

পিয়ারসন (Pearson)-এর ভাষায়, Society may be defined as the total complex of human relationships in so far as they grow out of action. in terms of mean end relationship intrinsic or symbolic."

সমাজকে মানব সম্পর্কের সামগ্রিক জটিল রূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সমন্বিত ক্রিয়ার মধ্য থেকে উদ্ভুত। এটি সহজাত কিংবা প্রতীকী হতে পারে।[৮]

সমাজের সংজ্ঞায় কুলি: (C.H Colley) বলেছেন, Society is a complex of forms or processes each of which is living and growing by inter-action with the others. The whol being so unifited that what takes place in one part affects all the rest.

"সমাজ হচ্ছে এমনই একটি জটিল রূপ অথবা প্রক্রিয়া যা সমাজস্থ সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এভাবে সমাজের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হলে একে অন্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে।"[৯]

অধ্যাপক মরিস জিনসবার্গ (Morris Gins berg) এর মতে, The term society may be used to include all or any dealing of man with man, whether these be direet or indirect, organised or unorganised, conscious or uncnconsious, co-operative or antagonistic."

মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, সংগঠিত বা অসংগঠিত, সচেতন বা অচেতন, সহযোগিতামূলক বা বৈরীতামূলক সমস্ত সম্পর্কই হল সমাজ।"

সমাজ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, A society is a colleetion of individuals united by certain relations or modes of behaviour which mark them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behaviour."

সমাজ হচ্ছে ব্যক্তি বর্গের একটি সমষ্টি, যারা সুনির্দিষ্ট কতক সম্পর্ক অথবা আচরণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থাকে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যারা উক্ত সম্পর্কের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হবে না কিংবা আচরণের দিক থেকে আলাদা সংশ্লিষ্ট সমাজের সদস্য নয়।[১০]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মানব গোষ্ঠী যখন একই সূত্রে আবদ্ধ হয়ে কতিপয় রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কতগুলো আদর্শ অনুসরণ করে তখন তাকে সমাজ বলে।

---

৭. Ibid

৮. ড. রংলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, *প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স মার্চ-২০০৩ খ্রি., পৃ. ১৩৩; Pearson: *Family-Socialization and interaction Process*, London; আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৯. C.H. Cooley: *Social Organization*, New York; আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত।

১০. ড. রংলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সমাজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

মানব জাতির আদি ও প্রাচীনতম সংগঠন হচ্ছে সমাজ। অতীতেও মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমানেও সমাজবদ্ধ অবস্থায় বসবাস করছে। প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমাজের সৃষ্টি। পারস্পরিক সহযোগিতার পাশাপাশি আরও কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই সমাজের পথ চলা। এমন কতিপয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরা হল–

- ম্যুনষের সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা।
- বিপদাপদে পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা।
- বৈধ ও সুস্থ চিত্তবিনোদনের আয়োজন করা।
- স্নেহ-মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।
- সমাজ বদ্ধ মানুষের মনস্তাত্তিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক চাহিদা পূরণ করা।
- সমাজকে কাঙ্খিত গতিধারায় পরিচালিত করে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবন করে সামাজিক জীবনকে আরামপদ করে তোলা।
- সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম অধিকার নিশ্চিত করা।
- দক্ষ, যোগ্য ও সঠিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো ।
- বিবাহ, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন এবং শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিবার গঠন করে সামাজিক অগ্রগতিকে তরান্বিত করা।
- মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- সমাজে বসবাসরত প্রতিটি মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূর করে বন্ধুত্বমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।[১১]

সমাজের বৈশিষ্ট্য

সমাজ সম্পর্কিত ধারণা পর্যালোচনা করলে সমাজের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ-বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই সমাজ অন্যান্য সংগঠন থেকে স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করে। তন্মধ্যে মৌলিক কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ সমাজ একটি বিমূর্ত ধারণা, সমাজ সম্পর্কে মানুষ আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক বিতর্ক করলেও এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বাহ্যিক অবয়ব নেই। সমাজকে দেখে বা স্পর্শ করে অনুভব করার সুযোগ নেই। তাই সমাজ হল একটি বিমূর্ত ধারণা বিশেষ বা অনুভূতির বিষয়। তাই কারো কারো মতে, সমাজ হলো একটি মনস্তাত্বিক ধারণা বিশেষ এবং মানষিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম।

১১. মিয়া মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ*, ঢাকা: নবেল পাবিলিশং হাউস, ২০০৫, পৃ. ২০-২১

Dhaka University Institutional Repository

রিটারের ভাষায়, "Just as life is not a thing but a process of living, So Society is not a think but a process of associating."[১২]

দ্বিতীয়তঃ সমাজের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল-সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সচেতনতা। পারস্পরিক সচেতনতা ছাড়া সামাজিক সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। প্রাণহীন কোন বস্তুর মাঝে সচেতনতার গুণটি অনুপস্থিত বলে সমাজ সৃষ্টি হয়না। সমাজের অন্যতম বড় একটি বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক সচেতনতা। তাই মানব সমাজে এর উপস্থিতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।[১৩]

তৃতীয়তঃ সমাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর সর্বব্যাপকতা। কেবল মানবজাতির মধ্যেই সমাজ ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণী ও প্রজাতির মধ্যেও সমাজ ব্যবস্থায় অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সমাজের এই সর্ব ব্যাপকতার বিষয়টি অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেগ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে– æIt has been contended that whenever there is life there is society, because life means heredity and so far as we know, can arise only out of and in the presence of other life, but in the lowest stages of life social awarness, if it exists, in extremely clean and the social eontect often extremely fleeting. Among all higher animals at least there is a very definite. Society, arising out of requrements of there nature and the conditions involved in the perpetuation of there species."[১৪]

চতুর্থঃ সমাজ হ'ল প্রাচীনতম সংস্থা। কেননা সমাজ মানব জাতীর মতই প্রাচীন। মানব সমাজের বহু সংগঠন আছে- যেমন রাষ্ট্র, মঠ ও মন্দির উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসবের অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছে সমাজ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিশ্ব সংসারে সমাজ হল সমকালীন। সমাজের অস্তিত্ব ছিলনা এমন কোন সময়ের কথা মানব সত্যতার ইতিহাসে বিরল। এ কারণেই সমাজ প্রাচীনতম সংস্থা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তাই সমাজতত্ত্ববিদদের অভিমত হল- Society precedes the state just as it precedes the family, the churchs, the corporation, the political party, it unites all of these as the tree, unites its branches.[১৫]

পঞ্চমতঃ সমাজ হল একটি সর্বজনীন সংগঠন। সমাজের মত অন্য কোন মানবিক সংস্থা এতটা সর্বজনীন স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা পায়নি। মানবজাতির মধ্যে নানা বৈচিত্র ও বৈসাদৃশ্য থাকলেও তারা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে বাধ্য। অথচ পৃথিবীর অন্য কোন সংস্থার ক্ষেত্রে এরূপ স্বাভাবিক বাধ্যবাধকতা পরিলক্ষিত হয়না। এজন্য গ্রীক পণ্ডিত এরিস্টটল যথার্থই বলেছেন, "মানুষ হল সামাজিক জীব। সমাজের বাইরে যে বসবাস করে হয় সে পশু না হয় সে দেবতা।"[১৬]

ষষ্ঠতঃ সংঘবদ্ধভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীল জীবন যপান করা। সমাজের প্রতিটি মানুষকেই কোন না কোনভাবে সমাজের অন্য কারো উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। কারণ মানুষের জন্মই হয় সম্পূর্ণ

---

১২. F.B Reuter, *Hand book of Sociology*, New york, P.8; আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭
১৩. ড. অনাদি কুমার মহাপাত্র, *বিষয় সমাজ তত্ত্ব*, কলকাতা: ইন্ডিয়া বুক কনসার্ন, ২০০৩, পৃ. ৯৩
১৪. MacIver and Page, *Society: An intorductory Analysis*, London, P.11; আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত।
১৫. ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরশীল অবস্থায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই কোন না কোনভাবে তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করতেই হয়। তাই মানুষ সামাজিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদান। এজন্যই সমাজের সবাই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সমাজে সাধারণভাবে বেঁচে থাকর জন্য আমাদের যে সকল প্রয়োজন রয়েছে তার সব কিছুর জন্য আমরা একজন অন্য জনের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যৌন সম্পর্ক, নিদ্রা, চিত্তবিনোদন, আদর, স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ইত্যাদি সকল প্রয়োজনে মানুষকে মানুষের উপরই নির্ভরশীল হতে হয়।

সপ্তমত: সমাজের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল গতিশীলতা। সমাজ একটি গতিশীল বিমূর্ত বিষয়। সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠিত মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমাজকে গতিশলীতা দান করে। তবে শৃঙ্খলাহীন গতিশীলতা সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থি বিষয়। সমাজকে অনুকূল গতিশীলতায় পরিচালিত করার জন্য সামাজিক সদস্য হিসেবে মানুষকে বিভিন্ন রীতি-নীতি, বিধি-বিধান, আইন-কানূন ও প্রথা মেনে চলতে হয়। এসব রীতি-নীতি ও বিধি-বিধানের স্থায়িত্বের ভিত্তিতেই সমাজের গতিশীলতা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

অষ্টমত: প্রত্যেকটি সমাজ স্বতন্ত্র। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থা অন্য সব সমাজ থেকে স্বতন্ত্র। কেননা প্রত্যেকেরই আছে কিছু নিজস্ব সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান। তাই একটি মুসলিম সমাজের আচার অনুষ্ঠান অন্য একটি হিন্দু সমাজ থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এভাবেই প্রত্যেক জাতি বা গোষ্ঠীরই আছে তাদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহকে সমাজ বিজ্ঞানীগণ সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মানব জীবনে সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার পর মানব জীবনে সমাজের গরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য দলীয়ভাবে সমাজে বসবাস করা প্রত্যেকের জন্যই অপরিহার্য। কারণ সামাজিক অভিজ্ঞতা, কার্যক্রম ও সাহচর্য প্রত্যেক মানুষের জীবনেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেককে সামাজিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়েই সামাজিক জীবন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজ ব্যতিত কারো পক্ষে সুস্থভাবে বসবাস করা সম্ভব নয়। তাই ম্যাকাইভার ও পেগ বলেছেন, "নিরাপত্তা, সুখ, পুষ্টি, শিক্ষা, উপকরণ, সুযোগ এবং সমাজের দেয়া আরো বহু পরিচর্যার জন্য মানুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার চিন্তার উপাদানের জন্য, তার স্বপ্নের ও আকাঙ্খার জন্য এমনকি তার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল।[১৭]

শুধু তাই নয়, জীবন রক্ষার প্রয়োজন মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য করে। জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের জন্য সমাজ গঠন অত্যাবশ্যক। মানুষ জীবনের প্রতিটি স্তরে সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সমাজের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে প্রথমেই মানুষের বহুমূখী প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারটি এসে যায়। কেননা বহুমূখী প্রয়োজন পূরণের তাগিদে মানুষকে সমাজ গড়ে তুলতে হয় এবং সামাজিক পরিবেশে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করতে হয়। অপরদিকে মানুষ প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের তাগিদে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনে বাধ্য হয়। সমাজবদ্ধ জীবনই মানুষকে প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সুযোগ দান করেছে।[১৮]

মানব জীবনে সমাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সামাজিকীকরণ প্রসঙ্গটি আলোচনাযোগ্য। কেননা সমাজবদ্ধ জীবনই মানুষকে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে বসবাসের উপযোগী করে দেয়। আর তাই প্রতিটি মানুষ সামাজিক পরিবেশে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়। সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী, প্রতিবেশী প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য সমাজবিজ্ঞানী কুলী "দলীয় জীবনকে মানব জীবনের সেবিকা" বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৯]

সামাজিক জীবন যাপনের মাধ্যমে মানুষ স্বীয় ক্ষমতা ও সামর্থ্য যথাযথভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে সম্পদ সৃষ্টি, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের সুযোগের মাধ্যমে উন্নত জীবন যাপনের ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলে। সমাজের বাইরে উন্নত ও আদর্শ জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। মানুষ নিজ সহজাত চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সমাজ সৃষ্টি করলেও সামাজিক

---

১৭. MacIver and Page op, cit. P. 8

১৮. মোঃ আতিকুর রহমান, *বাংলাদেশ সমাজ ও পরিবেশ*, ঢাকা: অনার্স পাবলিকেশন, ২০০৫, পৃ. ২৩

১৯. C. H. Cooley, *Socieal Organisation*, New york; মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

জীব হিসেবে সে যা ইচ্ছা করে তা করতে পারে না। সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে পারস্পরিক সহযোগিতার ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সামাজিক নিয়ম-কানুনই মানুষকে সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবের সম্মানে ভূষিত করে। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, সহানুভূতি, প্রশংসা ইত্যাদি মৌলমানবিক অনুভূতি আদান-প্রদান মানুষের মৌলিক বাসনা। মানুষের এসব মৌলিক মানসিক বাসনার পরিতৃপ্তির উত্তম ক্ষেত্র হল সমাজ। নিঃসঙ্গ একাকী জীবনের মাধ্যমে এসব কামনা চরিতার্থ করা আদৌ সম্ভব নয়। সামাজিক জীবনই এসব মানবিক অনুভূতিগুলো বিনিময়ের নিশ্চয়তা বিধান করে।[২০]

সামাজিক পারিবেশে ব্যক্তি বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ ও ভূমিকা পালনের মাধ্যমে স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। ফলে ব্যক্তির মানবীয় সুকুমার বৃত্তিগুলোর স্ফুরণ ঘটে এবং ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ অনেকগুণ বেড়ে যায়। তাই ব্যক্তির প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশে সমাজের বিকল্প নেই। সমস্যা বিজরিত জীবনে প্রতিটি মানুষই মনস্তাত্তিক নিরাপত্তা কামনা করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজবদ্ধ জীবন থেকে অনুভূত চাহিদা, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ও অন্যের সাহচর্য লাভ করে। প্রতিটি সমাজেই নিজস্ব কতকগুলো নীতি সংস্কৃতি মূল্যবোধ ও আদর্শ থাকে। এগুলো সামাজিক সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গতিকে ত্বরান্বিত করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণই সামাজিক সংহতি এবং শৃঙ্খলার মূল নিয়ামক। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজে বসবাস ব্যতীত সম্ভব নয়।[২১]

মানুষ মাত্রই তার পূর্ণ সত্তার বিকাশ এবং স্বীয় মর্যাদার স্বীকৃতি চায়। প্রত্যেক মানুষই তার সুপ্ত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে আত্মমর্যাদার স্বীকৃতি পেতে চায়। সামাজিক পরিবেশেই মানুষ স্বীয় প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ লাভ করে। সমাজ জীবনের বাইরে মানব মর্যাদার স্বীকৃতি মেলে না।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি, জীবনের নিরাপত্তা, উন্নত-জীবন যাপন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। ম্যাকাইভার এবং পেগের ভাষায়, "সমাজে মানুষের জন্মগ্রহণই মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তার পরিপূর্ণ পরিচয় বহন করে। স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য সামাজিক সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য।"[২২] বংশগত ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে সামাজিক মানুষ। বংশ হল মানব সত্তার ধারক আর সামাজিক পরিবেশ হল সুপ্ত মানব সত্তার বিকাশের ক্ষেত্র। আর সমাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমেই বিকাশিত হয় মানব জাতির সুপ্ত প্রতিভা।

---

২০. মোঃ আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২১. মিয়া মোঃ সোলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
২২. MaIver & Page, op.cit. P. 8

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার ধারণা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ধারা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	আদর্শ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামের আলোকে আদর্শ সমাজ

আদর্শ সমাজের পরিচিতি

সাধারণত সমাজ ব্যবস্থা বলতে বুঝায় কোন বিশেষ রীতিনীতি, আইন-কানূন ও একটি অবকাঠামো, যা দ্বারা সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বলতে বুঝায় ইসলামী রীতি-নীতি, আইন কাঠামো ও বিধি বিধান দ্বারা যে সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলামী পরিভাষায় সমাজকে 'উম্মত' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১] তাই আদর্শ সমাজ বলতে এমন সমাজকে বুঝায় যেখানে নাগরিকগণ আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান ও পরকালের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজে উদ্যোগী হয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকে। সুতরাং বলা যায় যে সমাজের সদস্যগণ মুসলমান, যারা তাওহীদে বিশ্বাসী অভিন্ন জীবন যাপন করে সেটাই ইসলামী সমাজ। ইসলামী সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত-পরনিন্দা ইত্যাদির লেশমাত্র থাকবে না। সেখানে মানুষ একে অপরকে ভালবাসবে, একজনের বিপদে অপরজন এগিয়ে আসবে, এক কথায়, কারো সুখে সবাই সুখী হবে আবার কারো ব্যথায় সবাই ব্যথিত হবে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধোনে এগিয়ে আসবে। একটি আদর্শ সমাজে প্রতিটি নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে। তারা সেখানে সকল প্রকার ব্যক্তি স্বাধীনতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হবে।

আদর্শ সমাজ গঠন মূলত আল-কুর'আন ও সুন্নাহের আদেশ-নিষেধের ওপর নির্ভরশীল। ইসলাম মানুষের সাধারণ রুচি ও স্বভাবের সাথে সঙ্গতি রেখে আদর্শ সমাজ গঠনে এক সুদুরপ্রসারী পথ নির্দেশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যা সর্বকালে সর্বযুগে সমভাবে উপযোগী। তাই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা স্বয়ং এমন একটি উন্নত ও যুক্তি সম্মত সমাজ, যেখানে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের উত্তম দিকগুলোর অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। বস্তুত মানব জীবনকে সার্বিকভাবে সৎ ও সুন্দর, সুশৃংখল ও সুখময় করার জন্য ইসলাম এক সর্বোত্তম সমাজ ব্যবস্থা প্রদান করেছে। আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় তার নীতিসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে সেখানে কোনো অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার, রাহাজানি, মারামারি, ছিনতাই, ধর্ষণ, অপহরণ, গুম, খুন ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কোন অপরাধই সংগঠিত হবে না।

মুসলমানদের সামাজিক জীবন আল্লাহ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। এর লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। শ্রেণি বৈষম্য ও সমাজের উপর কতিপয় ব্যক্তির কর্তৃত্ব ইসলামের সামাজিক জীবনের পরিপন্থি। কুর'আন বা হাদীসের কোথাও শ্রেণি, বংশ বা সম্পদের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার কোন দলীল নেই। বরং এর বিপরীতে কুর'আনের বহু আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান আছে যা ইসলামের কাঠামোতে মূলনীতি স্বরূপ কাজ করছে।

ইসলামে সামাজিক জীবনের কাঠামো অত্যন্ত নিখুঁত, মহৎ ও বৃহৎ। এই কাঠামোর মৌল উপাদানগুলো হল, প্রতিটি মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা,

১. আল-কুর'আন, ২:২১৩

Dhaka University Institutional Repository

আর্তমানবতার প্রতি সমবেদনা, রুগ্ন ব্যক্তির সেবা ও পরিচর্যা, ব্যথিতের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া। জীবন, সম্পদ ও সম্মানের প্রশ্নে অন্যের অধিকারের প্রতি দায়িত্বশীল, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ববান হওয়া।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি, বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সকল খবর রাখেন।[২]

পবিত্র হাদীস শরীফেও সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যেমন:

عن ابى عمر رض عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخد المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة.

হযরত ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না উপর যুলুম করতে পারে, আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরনে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন অসুবিধা (বা বিপদ) দূর করে দেয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে কিয়াতমের দিন তার কষ্ট ও বিপদের অংশ বিশেষ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।[৩]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে।[৪]

রসূলুল্লাহ (সা.) অপর হাদীসে বলেন,

ان كل مسلم اخو المسلم وان المسلمين اخوة.

প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।[৫]

---

২. আল-কুর'আন, ৪৯: ১০ ও ১৩

৩. ইমাম নববী (র.) অনুবাদ, মওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, *রিয়াদুস সালেহীন*, ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, নভেম্বর, ২০০১, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩

৪. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ ২০০৪, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১২, পৃ. ১৯

৫. হাকিম আবূ 'আব্‌দিলণ্ঢাহ নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরিক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার বিকাশধারা

মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, নতুন সভ্যতার বিনির্মাতা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনের প্রাক্কালে পৃথিবী ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দ্বন্দ্ব, সংঘাত, অবিচার, সবল কর্তৃক দুর্বলদের উপর শোষণ, নির্যাতন, মদ, জুয়া, সুদ, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, বিদ্বেষ, হানাহানি ও স্বার্থপরতা ছিল মানুষের নিত্য সংগী। মানবতা ছিল ভূ-লুণ্ঠিত। পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত সমাজের সর্বত্র ছিল জালিমের নিপীড়ন ও অত্যাচারের দৌরাত্ম্য। পৃথিবীর পুরাতন ধর্মগুলো বিকৃতির এমন পর্যায়ে নেমে এসেছিল যে, আল্লাহর একত্ববাদের কথা ভুলে গিয়ে মানুষ তাদের মনগড়া প্রতিমা ও প্রকৃতি পূজায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

এই তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে পবিত্র কুর'আনের আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন মানবতার মুক্তিদূত রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি অধঃপতিত মানব জাতিকে দিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যাতে রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি ও শান্তি। যারা গোত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব ও রক্তের সম্পর্ক ছাড়া মানুষে মানুষে অন্য কোন যোগসূত্র স্বীকার করতো না, তাদের তিনি ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ়বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করলেন। শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবতার এ শাশ্বত-সুমহান আহ্বানের ফলে পৃথিবীর সব মুসলমান হলেন। একে অন্যের ভাই ও কল্যাণকামী। মানব জাতির ইতিহাসে সূচিত হল সাম্য, শান্তি ও পরমতসহিষ্ণুতার এক মহান বিপ্লব। মানুষ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সকল হীনতা, নীচতা ও নিষ্ঠুরতা বিসর্জন দিয়ে জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু, কর্মস্পৃহা, মার্জিত, রুচিসমৃদ্ধ, তৌহিদের অমিয় ধারার সিক্ত শাশ্বত কল্যাণময় সভ্যতার সূচনা করল।

৬১০ খ্রি. রমযান মাসে লায়লাতুল কদরে হেরা গুহায় সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রচারের গুরুদায়িত্ব লাভ করেন। দিন সপ্তাহ মাস বছর এভাবে দীর্ঘ তের বছর মক্কার অলিতে-গলিতে ঘুরে মানুষকে সত্যের বাণী শুনাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই তা পাথরের উপর বীজ নিক্ষেপের ন্যায় নিষ্ফল হয়। হাতেগনা মুষ্টিমেয় মুসলমানই কেবল তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। একদিকে সময়ের তুলনায় ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য অপরদিকে নতুন মুসলমানদের উপর মক্কার কাফির মুশরিকদের নির্যাতনের ভয়াবহ অবস্থা রাসূলকে নিয়মিত কষ্ট দিচ্ছিল। নিরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আর কিছুই করার ছিল না। অবশেষে তিনি প্রিয় সাহাবীদেরকে হিজরতের নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশে নিজেও হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রিয় বন্ধু আবূ বকর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) 'কাসওয়া' নামক উটনীতে আরোহণ করলেন, হযরত আবূ বকর ও আমর একটি উটনীতে আরোহণ করলেন, অপর এক উটে আব্দুল্লাহ আরোহণ করে রাসূলকে পথ দেখাতে থাকলেন। মাত্র চারজন আরোহীর ক্ষুদ্র কাফেলা প্রকাশ্য বাণিজ্য পথ যথাসম্ভব এড়িয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে গোপন ও অপরিচিত পথ ধরে চলতে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমাগত আট দিন আট রাত পথ চলার পর নবম দিনের ভোরে ইয়াসরিবের উপাত্যকা কুবা পল্লীতে পৌঁছেন এবং এখানে এক সম্ভ্রান্ত নও মুসলিম ইব্ন কলসা তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়ে নিজ গৃহে নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর আতিথিয়তা গ্রহণ করে মুগ্ধ হন এবং তাকে ধন্য করেন। সময়টা ছিল ৬২২ খ্রি. ২ জুলাই/২৪ সেপ্টেম্বর।[৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এক সপ্তাহকাল কারো মতে বারদিন কুবায় অবস্থান করেন। সমবেত লোকদেরকে সাথে নিয়ে নামায আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল্লাহর পর এটাই দুনিয়ার প্রথম মসজিদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমনের পর থেকে মদীনায় ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলল। অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে নিয়ে উপদেশে মাশগুল থাকতেন। এদিকে বিচক্ষণ আবূ বকর (রা.) ইয়াসরিববাসীদের মাঝে তাঁদের আগমনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকেন। সাত-আট দিনের মধ্যেই প্রতীয়মান হয় যে, মদীনার অবস্থা নবী (সা.) ও তাঁর মুহাজির সঙ্গীদের জন্য অনুকূল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রকাশ্যে মদীনা নগরীতে প্রবেশের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। নবী (সা.)-এর এই সংকল্পের কথা জানাজানি হলে মুহাজির ও আনসার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দোল্লাসের ধুম পড়ে যায়। কোন এক শুক্রবারে রাসূলুল্লাহ (সা.) সকলকে সঙ্গে নিয়ে নগরের পথে যাত্রা শুরু করলেন এবং পথিমধ্যে সবাইকে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে জুমার নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রিয় উষ্ট্রী 'কাসওয়া'র পৃষ্ঠে আরোহণ করে পুণরায় যাত্রা শুরু করলেন। পথিমধ্যে মদীনার শিশু-কিশোর আবাল-বৃদ্ধ বণিতা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই রাসূলকে স্বাগতম জানিয়ে সাদরে গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নাজ্জার পল্লীতে আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর গৃহে মেহমান হলেন। এরপর দয়ার নবী ১০ দিরহাম মূল্যে একখণ্ড জমি ক্রয় করে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন কররেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে উক্ত মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদই মসজিদে নববী। এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই মদীনায় আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয়।[৭]

৬. মোহম্মদ বরকতুলণ্ঢাহ, *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ (সা.)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর-২০০৫, পৃ. ১৩-১৪

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেকটি সমাজ ব্যবস্থারই কিছু প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য থাকে। একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

তাওহীদ কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা

তাওহীদ হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিষয়। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা তাওহীদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রেই তাওহীদের বিষয় ছিল এক ও অভিন্ন। তাওহীদ মানে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা। একত্ববাদের অর্থ হল সর্বত্র আল্লাহকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করা এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ডে একচ্ছত্র আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করা।

তাওহীদ অর্থ আল্লাহ একক, তিনি পবিত্র ও সর্বদোষমুক্ত। তিনিই সকল সৃষ্টির সৃষ্টি কর্তা, অধিকর্তা ও পালনকর্তা। জীবন দান ও জীবন হরণ একমাত্র তাঁরই অধিকারে। তিনিই সকল প্রয়োজন পূরণকারী, তিনিই ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য এবং সাহায্য কেবল তাঁর কাছেই প্রাপ্য। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেন না এবং তিনি কারো থেকেই জন্ম লাভ করেননি। তিনি কোন কাজে কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তিনি অতুলনীয় সত্ত্বা। তাওহীদ অর্থ তিনি আদি স্রষ্টা, বিশ্ব জগতের চালক ও নিয়ন্তা। তিনি আদি ও অনন্ত, তিনি অসীম ও চিরঞ্জীব। তাওহীদ অর্থ তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। তাওহীদে বিশ্বাস মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব না করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত না করতে সাহসী করে তোলে। তাওহীদের কল্যাণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন উশৃঙ্খলা হতে মুক্ত হয়ে শৃঙ্খলিত হয়। তাওহীদের বিশ্বাস বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে সুদৃঢ় করে। তাওহীদের বদৌলতে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে। এক কথায়, তাওহীদের শিক্ষায় মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আসে অনাবিল আনন্দ।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে অত্যন্ত সুন্দর ও দ্ব্যর্থহীনভাবে একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছেন, আল্লাহ বলেন, (হে নবী আপনি) বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক, আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।[৮]

আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সেখানে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে ও যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।[৯]

---

৮. আল-কুর'আন, ১১২:১-৫

৯. আল-কুর'আন, ৪৫:১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ছাড়া অন্যকোন ইলাহ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু। নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে। তথাপি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়। যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেমন বুঝবে, হায়! এখন যদি তারা তেমন বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহর এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।[১০]

যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে, তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে তুমি বল: 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক' তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, সুতরাং তোমরা তাঁর 'ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারে না কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।[১২]

মহান আল্লাহ আরও বলেন, তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার 'ইবাদতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন।[১৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমাময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ।[১৪]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁর প্রতি একত্ববাদের শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। যাতে তারা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের জীবনকে তাওহীদের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে।

---

১০. আল-কুর'আন, ০২:১৬৩-১৬৫
১১. আল-কুর'আন, ০৬:৫৪
১২. আল-কুর'আন, ০৬:১০২-১০৩
১৩. আল-কুর'আন, ২৪:৪১-৪২
১৪. আল-কুর'আন, ০৭:৫৪

Dhaka University Institutional Repository

রিসালাত কেন্দ্রীক সমাজ

আদর্শ সমাজের আরও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হল তা হবে রিসালাত কেন্দ্রীক। অর্থাৎ নবী রাসূলগণ আল্লাহর কাছ থেকে যে রিসালাতের শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো সমাজে বাস্তবায়ন করা। রিসালাতে বিশ্বাস ইসলামী আকীদার একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আল্লাহর সত্ত্বা অদৃশ্য। তাই তাঁর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান প্রচারের জন্য কোন দৃশ্যমান মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল। নবী-রাসূলগণ হলেন আল্লাহর সেই আদেশ নিষেধ প্রচারের মাধ্যম। তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যাদেশ বাণীর সাহায্যে মানুষকে আল্লাহর বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত করেন।ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান লাভ ও সুক্ষ্মতত্ত্ব অর্জনের বিশুদ্ধতম উৎস হচ্ছে ওহী তথা নবুওয়াত ও রিসালাত।[১৫]

একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত ওহীর সাহায্যেই মানুষ তাওহীদের নিগূঢ় তত্ত্বকে হৃদয়াঙ্গম ও উপলব্ধি করতে সক্ষম। আল্লাহ কর্তৃক নবীগণের প্রেরণের উদ্দেশ্যই হল মানব জাতির হিদায়াত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের পথ নির্দেশ। নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন সমাজ হতে সকল প্রকার গোমরাহী দূর করে সমাজে সত্য ও জ্ঞানের আলো প্রতিষ্ঠার জন্য। সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার দূর করে ন্যায় ও বিচারের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য , সমাজকে যুলুম ও শোষণ থেকে মুক্ত করে ইনসাফ ও নিষ্ঠার সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। সর্বোপরী সমাজে আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণমূলক যাবতীয় বিধান বাস্তবায়নের জন্য। তাই একটি আদর্শ সমাজের জন্য রিসালাতের শিক্ষা অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য।

পরকালীন চিন্তাভিত্তিক সমাজ

পরকালে বিশ্বাস ইসলামী আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিশ্বাসের কারণেই মানুষ দুনিয়াতে নেক আমল করতে প্রচেষ্টা করে এবং খারাপ কাজ পরিহার করতে সচেষ্ট থাকে। ইসলামে পরকালীন জীবন সম্পর্কিত বিশ্বাসের মূল হল, পরকালে প্রত্যেক মানুষকে পার্থিব জীবনের সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। আর ব্যক্তির সুখ-দুঃখ নির্ভর করবে পার্থিব জীবনের আমলের উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে সে সুখী হবে আর যে খারাপ বা অন্যায় কাজ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। আল-কুর'আনের বহু আয়াতে কিয়ামত বা শেষ দিবসের কথা বলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন মানুষকে পুণরায় জীবিত করা হবে। আল্লাহ সব মানুষের বিচার করবেন এবং প্রত্যেককে তাঁর কর্মফল অনুযায়ী পুরস্কার কিংবা তিরস্কার করবেন। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হাতে দেয়া হবে তার পার্থিব জীবনের আমলনামা, "পূণ্যবানদের আমলনামা থাকবে ডান হাতে। আর বদকারদের আমলনামা বাম হাতে এবং এর ভিত্তিতেই আল্লাহ বিচারকার্য পরিচালনা করবেন"।[১৬]

পরকালে নেককারদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ আর বদকারদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম ও তার শাস্তি। পবিত্র কুর'আনে জান্নাতকে বর্ণনা করা হয়েছে -"পাহাড়, নদী, ছায়াময় ও প্রীতিদায়ক জলবায়ু পরিবৃত একটি নয়াভিরাম উদ্যান হিসেবে।"[১৭] আর জাহান্নামকে চিত্রিত করা হয়েছে একটি উত্তপ্ত

১৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ খ্রি., ১৪শ খ, পৃ. ১৬৬-১৬৭

১৬. আল-কুর'আন, ১৭:১৪ ও ৬৯:১৯-২৫

১৭. আল-কুর'আন, ১৩:৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বিভীষিকাময় স্থান বলে। নেককারগণ পাবেন জান্নাতের চির শান্তি আর বদকারগণ ভোগ করবে দোযখের অসহ্য যন্ত্রনা।

জান্নাতের অভিবাসীগণ থাকবেন অত্যন্ত প্রীতিকর মনোরম পরিবেশে। তাদের মুখে ভেসে উঠবে পরিতৃপ্তির হাসি।[১৮]তারা কোন অলস আলাপচারিতা শুনবে না। কোন মিথ্যাচার প্রত্যক্ষ করবেন না।[১৯]নিষ্ফল কোন কিছুতেই তারা জড়িত হবে না বরং তারা পাবে শান্তি আর শান্তি।[২০] তাদের স্বাগত জানানো হবে শান্তির বার্তা দিয়ে।[২১]

ফেরেস্তাগণ তাঁদেরকে এই বলে স্বাগত জানাবেন যে, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনারা এসেছেন এক আনন্দময় পরিবেশে সুতরাং প্রবেশ করুন এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করুন।[২২] তাঁরা গরম বা ঠাণ্ডার কোন ক্লান্তিকর অনুভূতি বোধ করবে না।[২৩] আল্লাহ তাঁদের বিশুদ্ধ পানীয় প্রদান করবেন।[২৪] তাঁরা বাগান ও ঝর্ণা পরিবৃত অবস্থায় বসবাস করবেন।[২৫]কোন প্রকার দুশ্চিন্তা বা অবসাদ তাঁদের থাকবেনা। তাঁরা পরিপূর্ণ আয়েশ ও আনন্দের সুরভী উপভোগ করবেন।[২৬] তাঁরা অভিভূত থাকবেন পরম উল্লাস বা আনন্দঘন অনুভূতিতে।[২৭] তাদের মুখমলণ্ডলে অভিব্যক্তি ঘটবে প্রশান্তির এবং তাদের পরিবেশন করা হবে কস্তুরীর মোড়কে আঁটা বিশুদ্ধ পানীয়।[২৮]

তখন তারা অবস্থান করবেন এক পরম প্রশান্তি ও আনন্দের রাজ্যে এবং তখন তাঁরা বলবেন সব প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। এবং আমাদের বসবাসের জন্য প্রদান করেছেন এ পরম আনন্দের বাগান।[২৯]

অপরদিকে জাহান্নামের শাস্তি কেমন কঠোর হবে এ ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অপরাধীগণ যখন যন্ত্রণা ভোগ করবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, শাস্তি বিধানে তিনি কঠোর।[৩০] তাদের ফুটন্ত পানি পরিবেশন করা হবে। সেই পানিতে তারা চুমুক দিবে বটে কিন্তু সহজেই তা গিলতে পারবে না।[৩১]

শুধু ফুটন্ত গরম পানি ছাড়া ঠাণ্ডা কোন কিছুই তারা পাবে না। তাদের দেয়া হবে এক ধরণের শুকনো তেঁতো ও কণ্টকময় তৃণজাতীয় খাদ্য।[৩২]এখানে যেমন থাকবে না কোন পুষ্টি তেমন তাতে ক্ষুধাও নিবৃত হবে না।

---

১৮. আল-কুর'আন, ৮৮:৯-১০
১৯. আল-কুর'আন, ৭৮:৩৬
২০. আল-কুর'আন, ১৯:৬৩
২১. আল-কুর'আন, ২৫:৭৬
২২. আল-কুর'আন, ৩৯-৭৪
২৩. আল-কুর'আন, ৭৬: ১৪
২৪. আল-কুর'আন, ৭৬:২২
২৫. আল-কুর'আন, ১৫:৪৬
২৬. আল-কুর'আন, ৭৬:১২
২৭. আল-কুর'আন, ৭৬:১২
২৮. আল-কুর'আন, ৮৩:২৫-২৭
২৯. আল-কুর'আন, ৩৯:৭৫
৩০. আল-কুর'আন, ০২:১৬৬
৩১. আল-কুর'আন, ১৪:১৭-১৮
৩২. আল-কুর'আন, ৮৮:৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

পাপীদের এক সঙ্গে শৃঙ্খলিত অবস্থায় যখন বন্দী করে রাখা হবে, তখন তারা ছটফট করতে থাকবে অসহ্য যন্ত্রনায় এবং কামনা করতে থাকবে মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছে আসবেনা।[৩৩]

ইসলামে জান্নাত-জাহান্নামের যে ধারণা প্রদান করা হয়েছে তা যদি কোন সমাজে চর্চা করা হয় তবে উক্ত সমাজে আদর্শ সমাজের যাবতীয় গুণাবলী বিরাজমান থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ঈমান ও আমলকেন্দ্রীক সমাজ

প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য ঈমানের পরিপূর্ণতা অত্যন্ত জরুরি। আর তা হল মহান আল্লাহ এবং তাঁর আদেশ নিষেধের বিষয়ে অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও কার্যে পরিণত করা।যখন কারো মাঝে এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটবে সে হবে প্রকৃত মুমিন ও মুসলমান। অনুরুপ একটা সমাজ বা দেশের সকলের মাঝে যদি এই জরুরি বিষয় সন্নিবেশিত হয় তবে উক্ত সমাজ বা দেশ হবে প্রকৃত আদর্শ সমাজ বা কল্যাণ রাষ্ট্র। ঈমান বলতে সাধারণত আমরা জানি ৭ টি বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন:-

(১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(২) আল্লাহর সকল ফিরিস্তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(৩) আল্লাহর সকল কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন।
(৪) আল্লাহর সকল নবী রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(৫) কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।
(৬) তাকদীরের ভাল-মন্দ যা কিছু হয় সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বিষয়টির বিশ্বাস স্থাপন।
(৭) আর মৃত্যুর পর পুন:জীবনে বিশ্বাস।

আমল আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে কাজ বা কর্ম। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের জীবনে আল্লাহর বিধি বিধানের যতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তাই হচ্ছে আমল। একজন মুসলমান হিসেবে ঈমান আনার পরে যে সমস্ত মৌলিক আমল বা ইবাদাত আমাদের উপর বর্তায় তা হচ্ছে সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ।

একজন মুসলমানকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হয়, সূর্য উঠার আগে ফজর, দুপুরে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পর যোহর, পড়ন্ত বিকেলে আসর, সূর্যাস্তের পর মাগরিব এবং গৌধুলীর শেষ ও উষাকাল শুরুর মধ্যবর্তী সময়ে এশা। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে একজন মুসলমান সারাদিন তার প্রভুর সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে। এর দ্বারা বান্দাদেরকে এটাই বুঝানো হচ্ছে যে সে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ন্যায় সারা জীবনই সে তার রব তথা সৃষ্টিকর্তার সাথে সর্বক্ষণই সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না।[৩৪]

---

৩৩. আল-কুর'আন, ২৫:১৪
৩৪. আল-কুর'আন, ০৭:২০৫

Dhaka University Institutional Repository

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।[৩৫]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস হল:

قال جرير ابن عبد الله بايعت النبى صلى الله عليه وسلم على اقام الصلوة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

হযরত জাবীর ইব্ন 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-এর নিকট সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার উপর বায়'আত করি।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরোও বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, বলত যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যেকদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? তাঁরা বললেন, তার দেহে কোনরূপ ময়লা থাকবেনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।[৩৭]

নামাজের সাথে সাথে একজন মুসলমানের উপর যে আমলটি বর্তায় তা হলো সাওম। বছরে একবার রমজান মাসে প্রত্যেক সুস্থ সবল বালেগ মুসলমানকে পূর্ণ এক মাস সিয়াম সাধনা পালন করতে হয়। সূবহে সাদিকের পূর্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সাওম পালন করতে হয়। শারিরীক ভাবে রোযা পালনের পাশাপাশি আত্মিক পরিশুদ্ধতাও সিয়ামের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে ।

সিয়াম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিদের দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্য়া একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে।[৩৮]

সিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

عن عائشة رض ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء افطر.

---

৩৫. আল-কুর'আন, ২০:১৩০

৩৬. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৮ম সংস্করণ, ২০১০ খ্রি., ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩১৯, পৃ. ৬-৭

৩৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫০৩, পৃ. ৭

৩৮. আল-কুর'আন, ০২:১৮৩-১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জাহেলী যুগে কুরায়শগণ 'আশূরার দিন সাওম পালন করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও পরে এ সাওম পালনের নির্দেশ দেন। অবশেষে রমযানের সিয়াম ফরয হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যার ইচ্ছা 'আশুরার সাওম পালন করবে এবং যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করবে না।[৩৯]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن ابى هريرة رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।[৪০]

সিয়াম পালনের পাশাপাশি বান্দা যদি ধনী হয় তবে তাকে যাকাত প্রদান করতে হয় । যাকাতের পূর্ণ শর্তই হলো একথা স্বীকার করা যে, তার মালিকানায় যে সম্পদ আছে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহ্। সুতারাং আল্লাহ্র বিধান মতই তা ব্যবহার করতে হবে। তাই যখন একজন বান্দা নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক হবে তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ বছরে একবার যাকাত প্রদান করতে হবে। পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন, অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।[৪১]

অন্য আয়েতে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৪২]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আরোও বলেন,

قال جرير ابن عبد الله بايعت النبى صلى الله عليه وسلم على اقام الصلوة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

হযরত জাবীর ইব্ন 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-এর নিকট সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার উপর বায়'আত করি।[৪৩]

عن عدى بن حاتم رض قال سمعت رسول الله صلى الله يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة.

'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর, এক টুকরা সদকা করে হলেও।[৪৪]

---

৩৯. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৭৭২, পৃ. ২৩৮
৪০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৭৭৭, পৃ. ২৪১
৪১. আল-কুর'আন, ০৯:১১
৪২. আল-কুর'আন, ০২:২৭৬-২৭৭
৪৩. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৮ম সংস্করণ, ২০১০ খ্রি., ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩১৯, পৃ. ৬-৭
৪৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩৩৪, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের পাশাপাশি একজন সচ্ছল মুসলমানের উপর যে আমলটি বর্তায় তা হলো হজ্জ। হজ্জ অর্থ নিয়ত করা অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় নির্দিষ্ট সময়ে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা এবং কতিপয় বিষয়াদী পালন করার মাধমে হজ্জ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা। হজ্জ হচ্ছে সমগ্র মানব জাতি ও মুসলিম জাতির ঐক্যের প্রতীক।

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বা ঘরের হজ্জ কিংবা 'উমরা সম্পন্ন করে এই দুটির মধ্যে সা'ঈ করলো তার কোন পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।[৪৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, তা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পূর্ণ নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৪৬]

অন্য আয়েতে আরো বলেন, নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।

হজ্জ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن ابى هريرة رض قال سئل النبى صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد فى سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور.

হযরত আবূ হযরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেল প্রতি ঈমান আনা। পুণরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল তারপর কোনটি? তিনি বললেন, হজ্জ মাবরূর (মাকবূল হজ্জ)।[৪৭]

عن ابى هريرة رض قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه.

অপর হাদীসে হযরত আবূ হযরায়রা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা এবং গুনাহ থেকে বিরত

৪৫. আল-কুর'আন, ০২:১৫৮

৪৬. আল-কুর'আন, ০২:১৮৯

৪৭. সম্পাদনা পরিষদ, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ১৪২৯, পৃ.৬৯

Dhaka University Institutional Repository

রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তার মা এই মুহূর্তে প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে।[৪৮]

উপরিউক্ত চারটি বিষয়-মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল প্রকার আচার আচরণের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এগুলো অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গকৃত জীবন যাপন করে একজন মানুষ পরিণত হয় খাঁটি মুসলিম রূপে, তার জীবনবোধ হবে অনুরূপ চেতনায় অভিষিক্ত।

সুন্দর চরিত্রভিত্তিক সমাজ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অখলাক বা চরিত্র। "আখলাক" অর্থ চারিত্রিক গুণ, বৈশিষ্ট্য শিষ্টাচার ও সদাচরণ ইত্যাদি। ব্যক্তিগত এই আচরণ ও চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় আখলাক। আর সামাজিক ক্ষেত্র পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটলে তাকে বলা হয় মুয়ামালাত। যার অর্থ পারস্পরিক কার্যাবলী বা আচরণ। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক আচরণ ও কার্যাবলী অত্যাবশ্যক। যেহেতু সকল মানুষের মৌলিক অধিকার সমান, তাই পারস্পরিক জীবনে মুয়ামালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ জীবনে মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী-বাকুরী, কৃষি এবং গৃহকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্র মুয়ামালাতের আওতাভূক্ত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, দরিদ্র ও ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠাই মুয়ামালাতের উদ্দেশ্য।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।[৪৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।[৫০]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

عن انس رض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقًا.

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ছিলেন মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রে অধিকারী।[৫১]

عن النواس بن سمعان رض قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال: البر حسن الخلق والاثم ما حاك فى نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس.

হযরত নওয়াস ইব্ন সাম'আন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নেকী ও গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করেছিলাম। তিনি বললেন, নেকী হচ্ছে উত্তম চরিত্র। আর গুনাহ হচ্ছে, যা তোমার অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং অন্যে জেনে ফেলুক তা তোমার কাছে খারাপ লাগে।[৫২]

---

৪৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৪৩১, পৃ. ৭০
৪৯. আল-কুর'আন, ৬৮:০৪
৫০. আল-কুর'আন, ০৩:১৩৪
৫১. ইমাম নবুবী, *রিয়াযুস সালেহীন*, অনুবাদক, মওলানা এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: ইসলামিয়া কুর'আন মহল, ২০০১, পৃ. ১১৪
৫২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪২৪, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজনীনতা

আদর্শ সমাজের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বজনীনতা অর্থাৎ গোটা বিশ্বের সকল মুসলমান হবে একই সমাজভূক্ত আর তা হল ইসলামী সমাজ। এই সমাজের ভিত্তি হল ইসলামী আকিদা বিশ্বাস। আর্থাৎ ইসলামী আকিদা গ্রহণকারীই হবে এ সমাজের বাসিন্দা। ভাষা, বর্ণ, বংশ ও ভূ-খণ্ডের দিক থেকে অভিন্ন হলেও তারা সমাজ বদ্ধতার দিক থেকে হবে ভিন্ন। পক্ষান্তরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীদের আদর্শ যদি অভিন্ন হয় তবে তারাও হবে একই সমাজভূক্ত। সুতরাং এ মতের ভিত্তিতে ইসলাম বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত বংশ ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গঠিত সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীতে অভিনব সমাজ গঠন করে, যার চিন্তাধারা, বিশ্বাস, মত, চরিত্র ও জীবনাদর্শ সম্পূর্ন আলাদা। এ সমাজে মানুষ ও মানুষের মিলনের ভিত্তি শুধু জন্মগত নয় বরং তা হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা বিশ্বাস এবং জীবনের একটা আদর্শ। যে ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালাকে নিজের মালিক ও প্রভু বলে স্বীকার করবে এবং নবীর প্রচারিত বিধানকে নিজ জীবনের একমাত্র জীবন বিধান বলে গ্রহণ করবে সেই ব্যক্তিই হবে এই সমাজের অধিবাসী। হোক সে আফ্রিকার অধিবাসী কিংবা আমেরিকার। হোক আর্য বা অনার্য, কালো কিংবা গোরা, হিন্দু ভাষাবাসী কিংবা আরবী ভাষাবাসী। এই সমাজের প্রত্যেক নাগরিকই হবে সমান। তাদের সকলের অধিকার ও সামাজিক মযার্দাও সম্পূর্ন সমান হবে। তাদের মধ্যে বংশীয়, জাতীয় অথবা শ্রেণীগত বৈষম্যের কোন স্থান থাকবেনা। সেখানে উঁচু নীচু বলে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। নিজ বংশ বা পেশার বিবেচনায় কেউ ছোট বলে পরিগণিত হবে না। পরিবারের ভিত্তিতে কোন বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারবেনা। শুধু বংশ কিংবা ধন-দৌলতের কারণে কারো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি লাভ করবে না। কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতেই সম্মান বিবেচিত হবে। যেমন কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে, "আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই বেশি সম্মানিত যে তাঁর নিকট বেশি মুত্তাকী।"[৫৩]

মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি

ইসলাম মানব কল্যাণের ধর্ম। তাই মানব সেবাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামের মতে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সত্যিকার অর্থে মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে, অতপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদিগের হীনতমে পরিণত করি। কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ন। তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।[৫৪]

পবিত্র কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে যে, স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি, তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংসা স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।[৫৫]

---

৫৩. আল-কুর'আন, ৪৯:১৩
৫৪. আল-কুর'আন, ৯৫:৪-৬
৫৫. আল-কুর'আন, ০২: ৩০

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা সম্পর্কিত ধারণাই মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। পৃথিবীতে মানুষকে তার প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু মানুষই সৃষ্টির সেরা জীব। তাই আল্লাহ তাঁর ফেরেস্তাদেরকে আদেশ করলেন আদমকে কুর্নিশ করার মাধ্যমে মানুষের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে। স্রষ্টা স্বয়ং মানব জীবনের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে মানুষকে সর্বোতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে অর্পণ করা হয়েছে যাতে তারা আল্লাহর খলিফা হিসেবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে।সমানুষকে কেন্দ্র করেই এ বিশ্বালোকের সৃষ্টি। এখানে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য। মানুষ শুধু তার ইচ্ছানুযায়ী এগুলোর ব্যবহার করবে। তাইতো পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, "একমাত্র তিনিই পৃথিবীর সকল বস্ত তোমাদের (মানবজাতির) জন্য সৃষ্টি করেছেন"।[৫৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী।আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এবং তার মাধ্যমে বের করেছেন ফল ফসলসমূহ তোমাদের রিযিকরূপে। তিনি নৌকা-জাহাজ তোমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন, যেন তা নদী সমুদ্রে চলতে পারে তাঁর বিধান মত। তিনি খাল-ঝর্ণাসমূহকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আবর্তনশীল চন্দ্র ও সূর্যকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্র ও দিনকে এবং এভাবে তোমরা যা চাও, যা প্রয়োজন মনে কর তা সবই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। যদি আল্লাহর দেয়া এসব কল্যাণকর দ্রব্য উপকরণ গনণা করতে চেষ্টা কর,তাহলে তা কখনই পারবেনা।[৫৭]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তুমি কি দেখতে পাওনা যে, আল্লাহ আকাশ মণ্ডলীর ও যমীনের সব কিছু তোমার অধীনে করে দিয়েছেন। তিনি ব্যাপকভাবে দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়ভাবেই তার উদারতাকে তোমাদের নিকট প্রবাহিত করেছেন।"[৫৮]

সুতরাং ইসলামের পরিকল্পনায় মানুষই হল সৃষ্টির প্রানকেন্দ্র। তার জন্য সমগ্র বিশ্ব জগতের সৃষ্টি এবং তার জন্য এত আয়োজন। এভাবেই ইসলাম সৃষ্টিলোকে মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং ধর্ম, বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদ না করে সমগ্র জাতিকে সম্মানের আসনে বসায়।

সামাজিক সুবিচার

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে মানুষ ও এই বিশ্ব জগতের সাথে জীবন ও জগতের সাথে ব্যক্তি তার নিজের সাথে সম্পর্কের ধরন কি হবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট ধারণা বিদ্যমান। ব্যক্তির সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য রয়েছে।আর ইসলামের এই সবগুলো সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে, সেই শাশ্বত ও সর্বাত্নক ধারণা যাকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছে

৫৬. আল-কুর'আন, ০২:৩৯
৫৭. আল-কুর'আন, ১৪: ৩২-৩৪
৫৮. আল-কুর'আন, ৩১:২০

Dhaka University Institutional Repository

যাবতীয় বিধি-বিধান। ইসলাম এমন একটি বাস্তবভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা যেখানে ধ্যান ধারণা ও শরীয়াহ উভয়েরই বাস্তব আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে।

একটি কারণে ইসলামে সামাজিক সুবিচারের আদর্শ একটি সর্বাঙ্গীন মানবিক সুবিচার, যা মানব জীবনের জন্য একটি মৌলিক উপাদান। এটা সীমিত অর্থে নিছক অর্থনৈতিক সুবিচারের কথা বলে না। জীবনের সমুদয় তৎপরতা ও দিক নিয়ে এর পরিসীমা। এই সুবিচার শুধু অর্থনৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে তৎপর নয়, এ হচ্ছে নৈতিক, আধ্যাত্মিকতা সকল মূল্যবোধের পূর্ণ সংমিশ্রন।

ইসলামে সামাজিক সুবিচারের ধারণার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি হল নিরংকুশ ন্যায়ভিত্তিক ও সমন্বিত ঐক্য এবং দ্বিতীয়টি হল সাধারণভাবে ব্যাক্তি ও সমাজে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ।

ইসলাম তার আইন, বিধান ও উপদেশ ইত্যাদির বেলায় মানুষের স্বভাবগত আত্মকেন্দ্রিকতা সম্পর্কে বিস্মৃত হয় না। ইসলাম মানুষকে তার সাধ্যাতীত বিষয়ের ব্যাপারে দায়ী করেনা। একই সাথে ইসলাম সময়ের প্রয়োজন ও কল্যাণকে যেমনি উপেক্ষা করেনা,তেমনি যুগে যুগে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উন্নত আদর্শ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করেনা। জীবন সম্পর্কে ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা এবং সাথে সাথে নিছক অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ছাড়াও মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য মূল্যবোধের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি বিষয় সমগ্র মানব সমাজে ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আকিদাকে অধিকতর শক্তি প্রদান করেছে। এর ফলে কমিউনিজমের মত সুবিচারের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান থেকে ইসলাম অব্যাহতি পেয়েছে। কমিউনিষ্ট মতাদর্শ অনুযায়ী সুবিচারের অর্থ হল অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরনার্থে মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে কমিউনিজম দেখলো এ ধরনের যান্ত্রিক খামখেয়ালী পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছেনা। অপরদিকে ইসলামী সুবিচার মানব জীবনের পরিপূর্ণ মানবিক সাম্য যেখানে অর্থনৈতিক মূল্যবোধও শামিল রয়েছে আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে হলে ইসলামে সুবিচারের অর্থ হল সুযোগ বা সুবিধাসমূহের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, গুণ বিকাশের স্বাধীনতা, যা আবার নির্দিষ্ট সীমার মধ্য থেকে কাজ করবে এবং যা উন্নত জীবনার্দশের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করবেনা।

ইসলাম অবশ্যই সুযোগ সুবিধার মধ্যে সাম্য এবং সকলের জন্য সুবিচারের নীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দুয়ার উন্মুক্ত রেখেছে। ইসলাম মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক মূল্যেবোধের উর্ধ্বে আরেক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে। পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত আছে, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাপূর্ণ যে অধিক মুত্তাকী।"[৫৯] অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে-"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও জ্ঞাণী আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন।"[৬০]

৫৯. আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

৬০. আল-কুর'আন, ৫৮:১১

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা কিন্তু সৎকর্ম যার ফল স্থায়ী এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞান লাভের ব্যাপারে উৎকৃষ্ট।[৬১]

এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নিছক অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ছাড়াও অন্য মূল্যবোধ রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে এবং তাদেরকে প্রকৃত মূল্যবোধের মর্যাদা দেয়। এই মূল্যবোধগুলো দ্বারাই ইসলাম মানুষের প্রচেষ্টা ও গুণাবলীর মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণে পার্থক্য সৃষ্টি করে সম্পদের বৈষম্য দূর করে সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু যে মত ও পথকে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোকে পুণরায় গ্রহণ করার মাধ্যমে কথিত ভারসাম্য ইসলাম চায় না।

ইসলাম নিছক শাব্দিক অর্থে সম্পদের সুষম বন্টনের কথা বলেনা। কারণ সম্পদ আহরণের যোগ্যতার উপর সম্পদের মালিকানা নির্ভরশীল, যা কখনো সবার সমান হয় না। অতএব নির্ভেজাল ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হল মানুষের আয় ও পুরস্কারের মধ্যে পার্থক্য থাকবে এবং কিছু লোকের কাছে অন্যদের চাইতে বেশী থাকবে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকালে অন্যান্য মূল্যবোধকেও যথার্থভাবে গণ্য করতে হবে এবং মানুষের মনকে নিছক অর্থনৈতিক মূল্যবোধের যাঁতাকল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের প্রকৃত ও যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। এ ভাবেই ইসলাম সম্মান, ভারসাম্য ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করেছে।[৬২]

ভ্রাতৃত্ববোধ

আদর্শ সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মানব জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা। ইসলামে বিঘোষিত নীতিতে সকল মানুষই সমান। জন্ম বা বংশের কারণে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নেই। ইসলামের ভ্রাতৃত্বে জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নর-নারী সমান মর্যাদার অধিকারী। ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও দেশ ভিন্ন হলেও সমগ্র মানুষ একই পরিবারভূক্ত, সকলের উৎস এক। মহান আল্লাহর ইরশাদ- "হে মানুষ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাপূর্ণ যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর সমস্ত খবর রাখেন।[৬৩]

ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে আরবীতে ওখুওয়াত বলা হয়। স্থানভেদে একে মুখাওয়াতও বলা হয়। এটি 'আখুন' শব্দ মূল থেকে উদ্ভূত। আখুন শব্দের অর্থ ভাই। এই ভাই থেকেই ভ্রাতৃত্বের উৎপত্তি। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় নবী-রাসূলগণ সমগ্র মানব জাতিকে বুনিয়াদী এক আদর্শের দিকে আহ্বাণ করেছেন, যারা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তাদেরকে এক নতুন ইসলামী ঐক্য সূত্রে গেঁথে দিয়ে তাদের মাধ্যে যে অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রতীম সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন তাকেই 'উখুওয়াত' বলে।

---

৬১. আল-কুর'আন, ১৮:৪৬

৬২. খুরশিদ আহমদ, অনুবাদ: মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার, *ইসলামের অহ্বান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন -১৯৯৫ খ্রি. পৃ.১১৩-১২৮

৬৩. আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি, বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সকল খবর রাখেন।[৬৪]

ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن ابى عمر رض عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخد المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة.

হযরত ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার উপর যুলুম করতে পারে, আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন অসুবিধা (বা বিপদ) দূর করে দেয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে কিয়াতমের দিন তার কষ্ট ও বিপদের অংশ বিশেষ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামদের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।[৬৫]

عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে।[৬৬]

ان كل مسلم اخو المسلم وان المسلمين اخوة.

প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।[৬৭]

সামাজিক সাম্য ও সামাজিক গণতন্ত্র

ইসলামের মৌল সামাজিক মূল্যবোধসমূহের অন্যতম হল সাম্য ও গণতন্ত্র। ইসলামের অপরাপর মূল্যবোধসমূহ এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাম্যের মূল উৎস হল মানব প্রেম। একমাত্র ইসলামই মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ, ও সবরকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তাকে প্রেম-ভালবাসা, উদারতা, সহযোগিতা ও সাম্যের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন প্রকার বংশীয়, শ্রেণীগত বা জাতিগত আভিজাত্যের স্থান নেই। ইসলামের বিচারে মানুষের মর্যাদা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়। বরং তা তার চারিত্রিক গুণাবলী ও সমাজের উপকারার্থে অবদানের উপর নির্ভরশীল। পবিত্র কুর'আনের ঘোষণা-

৬৪. আল-কুর'আন, ৪৯: ১০ ও ১৩
৬৫. আলণ্ঢামা ইমাম নববী (র.), প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩
৬৬. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১২, পৃ. ১৯
৬৭. হাকিম আবূ 'আব্দিলণ্ঢাহ নিশাপুরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

"হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালকের ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং দু'জন থেকে বহু সংখ্যক নারী ও পুরুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন।[৬৮]

সুতরাং সমগ্র মানব জাতির উৎস একটাই। সেই অভিন্ন উৎস থেকেই মানুষ বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, গোত্র ও দেশে বিভক্ত হয়েছে। সুতরাং জাতি ও গোত্রের এই প্রকারভেদের উদ্দেশ্য শুধু এটাই হওয়া উচিৎ যে, এটি তার পারস্পরিক পরিচিতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে হবে। এজন্যই আল কুরআনে বলা হয়েছে - "হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন মাত্র নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার"।[৬৯] আইনের চোখে সবাই একই রকম সবার উপর আইনের কতৃত্ব সমভাবে কার্যকর। তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে শুধু ন্যায়ের তথা আমলের ভিত্তিতে, সুতরাং যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও ন্যায় কাজ করবে সে তা দেখবে আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণ অন্যায় কাজ করবে সে তাও দেখবে।[৭০] সমাজ কাঠামোতে সকলের অবস্থান সমান। যে শক্তিশালী সে দূর্বলকে সাহায্য করবে। এভাবে গোটা সমাজ একে অপরের সেবায় নিবেদিত হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ,হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা) প্রমুখ জগৎবরেণ্য মহাপুরুষগণ যারা ইসলামের গণতন্ত্র গঠন করেছিলেন সকলেই সামান্য দীনহীন কুলি ও মজুরদের সঙ্গে উঠাবসা ও পানাহার করতেন। তাঁরা সামান্য দিন মজুরের কাজ করেছেন। নিজের যাবতীয় কাজ নিজেই করেছেন। রাজার আসনে বসেও সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। আযাদকৃত গোলাম সাহাবীদের অধীনে মক্কায় বড় বড় সাহাবী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

বিশাল ভূ-খণ্ডের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.)-এর পরিধানে ছিল অসংখ্য তালিযুক্ত কাপড়, সামান্য খেজুর ও পানীয় ছিল তার খাদ্য। এই প্রভাবশালী শাসক জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন উষ্ট্রের রশি ধরে আর উষ্ট্রচালক পৃষ্ঠে বসে ছিল। মনিব-দাসের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিলনা। ভ্রাতৃত্বের এই মনোরম দৃশ্য, সাম্যও গণতন্ত্রের এই অনবদ্য ছবি ইতিহাসে বিরল।

যদি তোমরা স্রষ্টাকে ভালবাসতে চাও তবে মানব জাতিকে ভালবাস। এই মহৎ আদর্শের বাণী কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কুর'আন মানুষকে মর্যাদা দান করে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে, এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করল সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের কাছে তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিলেন, কিন্তু এরপরও তাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল।[৭১]

---

৬৮. আল-কুর'আন-০৪:০১
৬৯. আল-কুর'আন-৪৯:১৩
৭০. আল-কুর'আন-৯৯:৭-৮
৭১. আল-কুর'আন-০৫:৩২

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ সমাজে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টন

ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা সুষম বণ্টনের লক্ষেই আবর্তিত হয়েছে। যাকাত আদায়ের পর ও ধন-সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল কুর'আনে বলা হয়েছে, "তারা জিজ্ঞাসা করবে তারা কী খরচ করবে বলে দিন যে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় কর।"[৭২] অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন "পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[৭৩] এখানে তোমাদের শব্দটি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা গোত্রকে সম্বোধন করে বলা হয়নি বরং সমগ্র মানবতাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। সম্পদ ভোগে ইসলাম সংকীর্ন ব্যক্তি স্বার্থকে এবং কারো বিশেষ অধিকারকে শুধু যে অস্বীকার করছে তা নয়, কোন অঞ্চলের সম্পদ যে শুধু সে অঞ্চলের ইসলাম এ স্বীকৃতিও দেয়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে, সম্পদ শুধু দুটি কাজেই ব্যবহার হবে। এর একটি জীবনের সুন্দরতম বস্তু লাভের জন্য খরচ করা এবং অপরটি শিল্প কিংবা ব্যবসায় ব্যয় করা। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসার পূর্বেই আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় কর।"[৭৪]

দারিদ্র বা অনটনের অজুহাতে কারও সামাজিক দায়িত্ব এড়াবার অধিকার নেই। প্রত্যেককেই সমাজের জন্য কম বেশি ব্যয় করতেই হবে। আল্লাহ এই প্রসঙ্গে বলেন-"যাদের প্রাচুর্য এবং স্বাছন্দ্য আছে তারা তা হতে সমাজকল্যাণে ব্যয় করুক, যারা অস্বাছন্দ্য এবং অনটনের মধ্যে আছে তারা আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করুক। আল্লাহ কাউকেও তিনি যা দিয়েছেন তার বাইরে তার বহনের অতিরিক্ত ভার তার উপর অর্পণ করেন না। অস্বাচ্ছন্দ্যের পর আল্লাহ পুণ: তাদেরকে সম্পদ দান করবেন।[৭৫]

আল কুর'আনে সম্পদ জমাকারীদের সম্পর্কে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। এবং তাদের অণিবার্য পরিণতি সম্পর্কেও হুশিয়ার করা হয়েছে। তারা অভিশপ্ত যারা ধন সম্পদ মজুদ করে আর গুণে গুণে রাখে, ভাবে তাদের ধনসম্পদ তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে। নিশ্চয় নয় এই সম্পদ তাদের এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাবে যা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলবে।[৭৬] সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে ধন সম্পদের অপচয় করোনা, যারা এভাবে ধন সম্পদের অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই।[৭৭]

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় ইসলাম মানুষকে সম্পদ ভোগ করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সম্পদের প্রতি আসক্ত হতে নিষেধ করেছে। এভাবে ইসলামে সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুষম বণ্টনের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

---

৭২. আল-কুর'আন-০২:২১৯
৭৩. আল-কুর'আন-০২:২৯
৭৪. আল-কুর'আন-৬০:১০
৭৫. আল-কুর'আন-৬৫:০৭
৭৬. আল-কুর'আন-১০৪:২-৪
৭৭. আল-কুর'আন-১৭:২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

নিতান্ত সাধারণভাবে কুর'আন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে এ কথা প্রমাণ হয় যে, ইসলামী চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থা সমাজবদ্ধ জীবনে কর্তৃত্বশূন্য নয়। বরং সেখানে তার গুরুত্ব ও দাবীসমূহের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যদি বিষয়টি নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবা হয় তবে দেখা যাবে যে, সমাজ বদ্ধ জীবন এমন স্বাভাবিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। যার সম্ভবত কোন নযীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সম্ভাব্য সকল দিক দিয়েই এ গুরুত্বের ব্যাখ্যা ও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক কার্যপদ্ধতি কার্যকরী করার জন্য যতটুকু সুযোগ থাকতে পারে তার সবটুকুতেই ইসলাম জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সমাজ জীবনের সুস্পষ্ট রূপরেখা বিদ্যমান। ইসলামী বিধি-বিধান ও নির্দেশনাবলীর একটি বিশাল অংশ মানুষের সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। আর এগুলোর আনুগত্যকেও সে অন্যগুলোর ন্যায় অপরিহার্য গণ্য করেছে। তাই ইসলাম কেবল ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং সামাজিক তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, নাগরিক, জাতীয় আন্তর্জাতিক তথা মানব জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই যে সম্পর্কে তার কোন বিধান নেই। বস্তুত ইসলামে সামাজিকতার ধারণা এতই স্পষ্ট যে, মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ বিভাগে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। তাই এ পথের প্রকৃত নির্ধারন করতে গিয়ে কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে।

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো না। তোমরা সকলে আল্লাহর রুজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয় না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর: তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি মোতাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের কাছে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদিগকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎ পথ পেতে পার।[৭৮]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য বর্জন করল এবং তদবস্থায় মারা গেল সে অন্ধকার যুগের মৃত্যু বরণ করল।[৭৯]

সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে রাসূল (সা.) বলেন, হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার শাসকের মাঝে এমন কোন বিষয় দেখে যা তার অপছন্দনীয়, তবে সে যেন ধৈর্যাবলম্বন করে। কেননা, যে ব্যক্তি জামাত হতে সামান্য পরিমাণও সরে যায় এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে যেন বর্বর যুগের মৃত্যুবরণ করল।[৮০]

---

৭৮. আল-কুর'আন, ৩:১০২-১০৩

৭৯. ইমাম মুসলিম, বাংলা অনুবাদ, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, অনুবাদ শায়খুল হাদীস মওলানা মোহাম্মদ আজীজুল হক, ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউস, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, হাদীস নং ৪৬৩৬, পৃ. ৭২২

৮০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৬৩৮

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য বর্জন করল এবং (মুসলিম জামাত হতে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে বর্বর যুগে মৃত্যু বরণ করল।[৮১]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, ইসলাম যে সমাজ জীবনের নির্দেশ দেয় তা কোন ঢিলেঢালা সমাজ জীবন নয়। নিছক নৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তার কাঠামো তৈরি হয়নি। বরং ইসলাম সমাজ জীবনকে ঐক্য ও সংগবদ্ধতার ভিত্তিতে শ্রবণ ও আনুগত্যের লৌহখণ্ডের দ্বারা সিলগালা করে দিয়েছে। জামাতকে মজবুত করে আকড়ে ধরা এবং সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করা নিছক একটি নির্দেশ নয় বরং এমন একটি অপরিহার্য নির্দেশ যে, তার বিরুদ্ধাচরণ করলে ইমান ও ইসলাম থেকে সম্পর্কচুতি ঘটতে পারে। বস্তুত ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সামাজিক শৃঙ্খলা ও জাতীয় ঐক্য বিধানের জন্য যেসব নির্দেশ প্রদান করেছে তা সকলের জন্যই অনুসরণীয়।

সমাজের সমষ্টির সাথে নিজেকে এজন্য জড়িয়ে রাখতে হবে যে, একমাত্র এভাবেই ঈমানী জিন্দেগীর যথাযথ সংরক্ষণ সম্ভবপর। এ সামষ্টিকতার অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের নিরাপত্তা অসম্ভব। কেননা সমষ্টি থেকে পৃথক হলেই সে শয়তানের আয়ত্বাধীন চলে যায়। বিপরীত পক্ষে জাতীয় সমাজ এমন একটি লৌহ প্রাচীর নির্মিত আশ্রয়স্থল যার ভিতরে শয়তানের প্রবেশ অসম্ভব। সত্যিকার অর্থেই ইসলাম যে সমাজ চায় তা যদি অস্তিত্ব লাভ না করে তাহলে মুসলমানদের দ্বীন ঈমান কঠিন বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

ইসলামের সামাজিক আদর্শের অভাবে যে সমাজে পরিলক্ষিত হয়, সেখানে একটা পর্যায় মানুষ ইসলাম থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। ইসলাম সমাজের অনুপস্থিতিতে মুসলমানগণের পক্ষে ইসলামের মৌলিক বিধান তথা আল্লাহর হক আদায় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের মত মৌলিক ইবাদতসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। পাশাপাশি বান্দার হক আদায় করতেও তাকে হিমশিম খেতে হয়। যেমন গরীব দুঃখীদের সাহায্য করা, রোগীর সেবা ও জানাযার মত বান্দার হক আদায় করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে যায়। আর জামাতের উপরই আল্লাহর সাহায্য থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজবদ্ধ জীবনের মাধ্যমেই মুসলমান তার প্রভুর আনুগত্য ও বন্দেগীর পূর্ণ-পরিবেশ পায় এবং ইহকালীন কল্যাণ লাভের পাশাপাশি পরকালীন মুক্তিও নিশ্চিত হয়। তাই মুসলমানদের জীবনে একটি আদর্শ সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৮১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৬৩৪, পৃ.৭২১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
মসজিদ : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রথম পরিচ্ছেদ : মসজিদ পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মসজিদের উৎপত্তির ইতিহাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মসজিদের মিহরাব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মসজিদের মিম্বার

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মসজিদের ক্রমবিকাশ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইসলামী সমাজে মসজিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মসজিদ পরিচিতি

মসজিদ আল্লাহ্ তা'আলার ঘর এবং দীন প্রচারের কেন্দ্র। এ মসজিদে অনুশীলন করে ও প্রশিক্ষণ নিয়ে সাহাবীগণ (রা.) ইসলাম প্রচার করেছেন, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। দেহ ও প্রাণের যে সম্পর্ক ইসলাম ও মসজিদের সম্পর্কও ঠিক তদ্রূপ। প্রাণহীন দেহ যেরূপ অসার লাশ, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থি যে মসজিদ তাও তদ্রূপ ইমারত মাত্র।[১] মসজিদ হ'ল সিজদার স্থান। প্রয়োগিক দিক থেকে এটি এমন একটি গৃহ যাতে প্রধানত স্বর্গীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। এটি মুসলিম জাতির আধ্যাত্মিক কেন্দ্র যাতে মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নিমিত্তে জমায়েত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদকে সর্বোৎকৃষ্ট গৃহ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[২] ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) (জ. ৫৭০ খ্রি.- মৃ. ৬৩২ খ্রি.) সাহাবীগণকে নিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করতেন, সালাত শেষে তাঁদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করতেন– এ মসজিদের ভেতরেই। তাঁর এ বক্তব্য শুধু 'ইবাদতের ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়নি- বরং দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনেও এর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মদীনার মসজিদুন নববী থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তাই মসজিদ সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল এবং 'ইবাদতের গৃহ হিসেবে পরিগণিত।[৩]

মসজিদ শব্দের বিশ্লেষণ

মসজিদ শব্দের মূল শব্দ হ'ল د – ج - س।[৪] এ শব্দটির اسم বা নামবাচক বিশেষ্য হল- س-السجدة অক্ষর যের যোগে, يسجد - سجد মাসদার থেকে।[৫] এর অর্থ হয় خضع تطامن অর্থাৎ আনুগত্য করা, বশ্যতা স্বীকার করা।[৬]

শব্দটির اسم فاعل পুংলিঙ্গ হল ساجد এবং اسم فاعل স্ত্রী লিঙ্গ হ'ল ساجدة। আর اسم فاعل مبالغة –এর জন্য سجاد ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন এর বহুবচন হয় سجود। অর্থ হয় অধিক ক্রন্দনরত সিজদাকারী। যেমনিভাবে বলা হয়ে থাকে نخلة ساجدة অর্থাৎ অবনত খেজুর বৃক্ষ।[৭] ইমাম রাগিব ইসফাহানী (মৃ. ১২০৮ খ্রি.)-এর মতে, يسجد - سجد অর্থ অনুনয়-বিনয় করা। আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ ও তাঁর 'ইবাদতকে সুজূদ (سجود) বলা হয়ে থাকে। এ শব্দের ব্যবহার মানুষ, প্রাণী ও জড় পদার্থের ক্ষেত্রে

---

১. ড. মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান, *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.,), পৃ. সাত (লেখকের বক্তব্য)

২. Abdur Rahman Shad, *Muslim etiquettes*, Delhi: Taj Company. 1999, Reprinted, P.101

৩. Bos Worth and others, *The Encyclopaedia of islam*, Leiden: E-J-Brill, 1991, VoL, vi, P.646

৪. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ্* (উর্দূ বিশ্বকোষ), ২০তম খন্ড, দানেশগাহ্ পাঞ্জাব, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৫৮৮

৫. *আল্-মুনজিদ*, লেখকের নাম বিহীন, বৈরূত: আল-মাকতাবাতুশ্-শারকিয়াহ্, ২০০৩ খ্রি., ৪০ তম সংস্করণ, পৃ. ৩২১

৬. *আল-মু'জামুল ওয়াজীয*, মিসর:ওযারাতু আত্-তারবিয়াতু ওয়াত্ তা'লীম, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৩০৩

৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ, প্রাগুক্ত, ২০ তম খন্ড, পৃ. ৫৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সমভাবে প্রযোজ্য।[৮] যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর'আনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহ্কে সিজদা কর এবং তাঁর 'ইবাদত কর।"[৯] সিজদা শব্দটি সম্মানার্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১০] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, যখন আমি আদম (আ.) কে সিজদা করার জন্য ফিরিসতাগণকে বললাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল।[১১]

আবার سجد - يسجد অর্থ 'ইবাদতকারীর ললাটকে মাটিতে ঝুঁকিয়ে দেয়া। যেমনিভাবে বলা হয়ে থাকে هو ساجد অর্থাৎ সে অনুগত সিজদাকারী।[১২] আবার সিজদার অর্থ হয় সিজদায়ে কুর'আন, সিজদায়ে শোকর।[১৩]

বিশেষত ইসলামী শরী'আতে সিজদা সালাতের একটি অন্যতম রুক্ন হিসেবেই প্রসিদ্ধ। আর 'ইবাদতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হল সিজদা। তাই সালাতের মধ্যে সিজদা থাকার কারণেই সালাত আদায় করার স্থানকে মসজিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[১৪]

বিভিন্ন অভিধান বিশারদগণের মতে সিজদার কয়েকটি অর্থ

১) Hughes এর মতে, æSajdah, (سجدة) Prostration, The act of worship in which the persons forehead touches the ground in prostration,"[১৫] অর্থাৎ 'ইবাদতে কোন ব্যক্তির কপালকে মাটিতে অবনত করার নামই সিজদা।

২) John Penrice বলেন, æTo be a humble submit one's-self, down in adoration with the forehead touching the ground."[১৬]

৩) 'ফীরুযুল লুগাত' (উর্দূ) অভিধানে সিজদা অর্থ করা হয়েছে, "মাটিতে কপাল ঠেকানো, মাথানত করা। আল্লাহ্র সামনে মাথা অবনত করা। সালাতের মধ্যে মাথা, নাক, গোড়ালি, হাঁটু ও অঙ্গুলিসমূহ জমিনে রাখার নাম সিজদা।"[১৭]

৪) 'আল-কামূসুল জাদীদ' অভিধানে সিজদার অর্থ করা হয়েছে মাথানত করা, চাই সম্মানার্থেই হোক অথবা 'ইবাদতের ক্ষেত্রেই হোক।[১৮]

---

৮. 'আলণ্ঢামা রাগিব ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফি গারীবিল কুর'আন*, পাকিস্ড়ন:কাদীমী কুতুবখানা, তা. বি., পৃ. ২২৯

৯. আল কুর'আন, ৫৩: ৬২

১০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ*, প্রাগুক্ত, ২০তম খ, পৃ. ৫৮৮

১১. আল-কুর'আন,২:৩৪

১২. *আল-মুনজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

১৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ* (উর্দূ বিশ্বকোষ), প্রাগুক্ত, ২০তম খ, পৃ. ৫৮৮।

১৪. 'আলণ্ঢামা রাগিব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

১৫. Thomas Patrick Hughes, op.cit., P. 556

১৬. John Penrice, *A Dictionary and Glossary of the Koran*(সালাকুল বায়ান ফি মানাকিবিল কুর'আন), Delhi: Low Price Publications, 2002, reprinted, P. 66

১৭. মৌলভী ফীর যুদ্দীন, *ফির যুল লুগাত* (উর্দূ), মাদানী লাইব্রেরী, ঢাকা, তা. বি., পৃ. ৭৮২

১৮. মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান কাসেমী, *আল্-কামূসুল জাদীদ* (আরবী-উর্দূ), ভারত:কুতুব খানা রাশীদিয়া, তা. বি., পৃ. ৩৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৫) বাংলা একাডেমীর 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে' দুই পা, দুই হাত, দুই হাঁটু, কপাল ও নাকের অগ্রভাগ মাটিতে ঠেকিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মনিবেদনের ইসলামী রীতির নামই সিজদা।[১৯]

৬) ইব্‌ন মানযূর (জ. ১২৩২-মৃ ১৩১১খ্রি.) বলেন, سجد - يسجد - سجودًا অর্থ وضع جبهة بالارض অর্থাৎ কপালকে মাটিতে রাখা।[২০]

৭) 'আল্লামা মজদুদ্দীন ফীরুযাবাদী (জ. ১৩২৮-মৃ ১৪১৪খ্রি.)-এর মতে, মাথা অবনত করাকে সিজদা বলে।[২১]

সাধারণ অর্থে যে স্থানে সিজদা করা হয় সে-স্থানকেই মসজিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মসজিদ শব্দের বহুবচন হচ্ছে মাসাজিদ (مساجد)।[২২] আর যে মসজিদে জুমু'আর সালাত আদায় করা হয় তাকে জুমু'আ মসজিদ বলা হয়ে থাকে।[২৩] মাসজিদ শব্দটিতে জীম অক্ষরে যের এবং যবর উভয়ভাবেই পাঠ করা যায়। مَسْجِد জীম অক্ষরে যবর যোগে অর্থ হবে مصلى الجماعة - محراب البيوت।[২৪] মসজিদ শব্দটি دار বা ঘর অর্থেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কবি আসওয়াদ বিন ইয়াফুর (মৃ. ৬০০হি.)-এর কবিতা وافي كدارهم الاسجاد এখানে دار الاسجاد বলতে ইয়াহূদী, নাসারাদের প্রতিকৃতি বুঝানো হয়েছে– যে প্রতিকৃতিতে তারা সিজদা করত।[২৫] ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ্ (জ. ১২৬৩ খ্রি. -মৃ.১৩২৮ খ্রি.) বলেন, "মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্‌র ঘরকেই বুঝানো হয়। যে ঘরে প্রতিকৃতি থাকে, কিংবা যে ঘরে আল্লাহ্‌র সাথে কুফ্‌রী করা হয়, যদি সেখানে শির্‌ক, কুফ্‌রীর আড্ডাখানা থাকে, তবে সে ঘরকে কাফিরদের উপাসনালয় বলা যেতে পারে মসজিদ বলা যায় না।"[২৬]

ডিজ প্রাক-মুসলিম আরবে ব্যক্তিগত সালাত আদায় করার স্থানকে মুসাল্লা বলেছেন।[২৭] এর প্রমাণ রয়েছে মদীনার বাইরে বনূ সালীমার একটি স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাত আদায়ের মাধ্যমে। স্থানটি বানূ সালীমা গোত্রের অধীনে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল।[২৮] ডিজ প্রাক-মুসলিম আরব থেকে মুসাল্লার উৎসের সন্ধান করেন। কিন্তু ওয়েন সিঙ্ক মনে করেন, এর উৎপত্তিস্থল উত্তর সেমিটিক শস্য

---

১৯. সম্পাদক, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫ খ্রি., ৬ষ্ঠ পুনঃমুদ্রণ পৃ. ১১৭০

২০. ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, ৭ম খ, বৈরূত: দার-স-সাদির, তা. বি., পৃ. ১২৫

২১. 'আলণ্ঢামা মজদুদ্দীন ফীর-যাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, বৈর-ত: দার-ল ফিকর, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২৬০

২২. আবূ মু'আয খালিদ বিন 'আব্দুল 'আল, *ইত্তেহাফুস্-সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ*, জামি'আতু ইহ্‌ইয়াউত তুরাসুল ইসলামী, আন্দালুস, ২০০৭ খ্রি, পৃ. ১১

২৩. প্রাগুক্ত পৃ, ১২

২৪. ইব্‌ন মানযূর, প্রাগুক্ত, ৭ম খ, পৃ. ১২৬

২৫. 'আলণ্ঢামা মজদুদ্দীন ফীর-জাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

২৬. ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া, *ফাতওয়াউস সালাত*, মিসর:দার-ত তাকওয়া লিতত্বরাস, তা. বি., পৃ. ৫১

২৭. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি., ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১০৬; আধুনিক ইউরোপে মসজিদ-এর প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, Mosque যেখানে সালাত আদায় করার সময় সিজদা দেয়া হয়, ফ্রান্স ভাষায় Masquic, জার্মান ভাষায় Mascher, ইটালির ভাষায় Maschea বলা হয়ে থাকে। (Bos-Worth and Others, op.cit., Vol. VI, P-644)

২৮. ইব্‌ন কায়্যিম, *যাদুল মা'আদ*, ১ম খ, মাকতাবাতুত্ তাওফীকিয়াহ্, মিসর তা. বি., পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মাড়াইয়ের স্থান। কিন্তু প্রাক্-মুসলিম যুগের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পালিত কোন উৎস থেকে মসজিদের প্রকৃত রূপ নির্ণয় করা অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার।[২৯]

স্থাপত্য বিচার-বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদ অপেক্ষা মুসাল্লার ব্যবহার অনেক পূর্বে। মুসাল্লা কেবল মাত্র সালাত আদায়ের জন্য প্রাচীর ঘেরা একটি ক্ষুদ্র স্থান ব্যতীত কিছুই নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় অবস্থান কালে (৬১০-৬২২খ্রি.) কা'বা শরীফের নিকট কখনও বা হযরত আবূ বকর (রা.) (মৃ. ৬৩৪ খ্রি.)-এর নির্মিত বিশেষ একটি স্থানে সালাত আদায় করতেন। মক্কায় সালাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না। যেখানে তিনি সাহাবীগণ (রা.) কে নিয়ে সালাত আদায় করতেন, তাকে মুসাল্লা বলা হত।[৩০] সালাতের সময় হলেই অনেক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কার পার্বত্য উপত্যকায় চলে যেতেন। তাঁর সাথে হযরত 'আলী (রা) (মৃ. ৬৬১ খ্রি.)ও যেতেন। দু'জনে সেখানে সালাত আদায় করে অপরাহ্নে ফিরে আসতেন।[৩১]

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- جعلت لى الارض مسجدًا وطهورًا وايما رجل من امتى ادركته الصلاة فيصلى[৩২] নবী করীম (সা.) (জ. ৫৭০-মৃ. ৬৩২ খ্রি.) মক্কায় অবস্থান কালে (৬১০-৬২২খ্রি.) সাহাবীগণকে নিজ গৃহে সালাত আদায়ের অনুমতি দিতেন।[৩৩] মাক্কী জীবনে (৬১০-৬২২খ্রি.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নির্বিঘ্নে কা'বাগৃহে সালাত আদায় করতে পারতেন না। তিনি গোপনে সংকীর্ণ স্থানে সালাত আদায় করতেন।[৩৪]

عن ميمونة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى على الخمرة. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জায়নামাযেও সালাত আদায় করেছেন।[৩৫] পুরুষদের ললাটকেও অনেক সময় মসজিদ বলা হয়ে থাকে।[৩৬] মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, মসজিদসমূহ আল্লাহ্র জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান কর না।[৩৭] শহর বা কিল্লার নামও অনেক সময় মসজিদ রাখা হয়। যেমন আক মসজিদ বা সাদা মসজিদ। দু'টি বৃহৎ শহরের নাম।[৩৮] কুর'আনুল কারীমে মসজিদুল হারামকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।[৩৯]

---

২৯. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, মসজিদের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৩০. ড. মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৩১. 'আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম, *সীরাতে ইব্ন হিশাম*, ১ম খন্ড, দারুত্ তাকওয়া, মিসর, ২০০৪, পৃ. ১২৪। সর্বপ্রথম হযরত 'আলী (রা.)-ই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সালাত আদায় করেন। দ্র. ইব্ন সা'আদ, *তাবাকাতুল কুবরা*, ৩য় খন্ড, দারুস সাদির, বৈরূত, তা. বি., পৃ.২১

৩২. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খন্ড, কিতাবুস সালাত, কুতুব খানা রাশীদিয়া দিল্লী, তা. বি., পৃ. ৬২

৩৩. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত ১ম খন্ড, পৃ.৬০

৩৪. Bos-Worth and Others, op.cit., Vol-VI, P.64

৩৫. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫

৩৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দায়েরায়ে মা' আরিফে ইসলামিয়া* (উর্দূ বিশ্বকোষ), প্রাগুক্ত, ২০তম খন্ড, পৃ. ২৮৯

৩৭. *আল-কুর'আন* ৭২:১৮

৩৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খন্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৭৮

৩৯. আল-কুর'আন ০৩:৯৬

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

বিভিন্ন অভিধান বিশারদগণ মসজিদের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া হল:-

১) 'Arabic-English Lexicon' এ বলা হয়েছে, "যে স্থানে আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা হয় তাকে মসজিদ বলা হয়ে থাকে।"[৪০]

২) 'The world book Encyclopaedia' তে বলা হয়েছে, "Mosque is a building used for muslims worship".[৪১]

৩) 'আল্লামা রাগিব ইসফাহানী (মৃ. ১১০৮ খ্রি.) বলেছেন, "المسجد موضع الصلاة اعتبار السجود"[৪২]

৪) 'আল-মুনজিদ' অভিধানে বলা হয়েছে, "الموضع الذى يسجد فيه كل موضع يتعبد فيه"[৪৩]

কুর'আনুল কারীমে মসজিদ শব্দের অনেক ব্যবহার রয়েছে। কুর'আনুল কারীমের ২৮টি স্থানে সরাসরি মসজিদ শব্দটি এসেছে।[৪৪] যেমন একটি আয়াতে মসজিদ শব্দটি এসেছে,

[redacted] وَمَنْ اسْمُهٗ وَ سَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ[৪৫]

হাদীসেও মসজিদ শব্দের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل الله اليهود - اتخذوا قبورا انبيائهم مساجد.[৪৬]

কুর'আনের বহু আয়াতে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বহু হাদীসে মসজিদের আলোচনা এসেছে। যাই হোক মসজিদ আল্লাহর ঘর। যে স্থানে সালাত আদায় করা হয় এবং মুসলিম জাতি একত্রে যে ঘরে সালাত আদায় করে থাকে তা-ই মসজিদ। মসজিদসমূহ ইট বা পাথরের তৈরি হয়। আয়তাকার বিশিষ্ট মসজিদের ভেতরে সালাত আদায়ের জন্য প্রশস্ত জায়গা থাকে। ভেতরে ছাত্রদের পাঠদানের জন্যও জায়গা থাকে। কেন্দ্রীয় দেয়ালটিতে কিবলার দিক-নির্দেশক মিহ্‌রাবও থাকে। মিহ্‌রাবের ডান পার্শ্বে শুক্রবারে খুৎবা দেয়ার জন্য মিম্বারও থাকে।[৪৭] 'The World book Encyclopeadia' তে বলা

---

৪০. Edward William Lane, *Arabic English lexicon*, Pt.,-4, New Delhi: Asian educational services, 1985, P. 1307-1308. মসজিদ এমন ঘরকে বলা হয় যাতে মুসলমানগণ 'ইবাদত করে। (As. Horn by, *Oxford Advanced Learner's Dictionary,* Oxford University press, 1948, seventh ed., P.994).

৪১. The World book Encyclopaedia, Vol-13, Londona Ascott Fetzer Company, 1992, P.633

৪২. 'আলণ্ডামা রাগিব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

৪৩. *আল-মুনজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৪৪. মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আবদুল বাকী, *আল-মু'জামুল মুফাহ্‌রাসু লি আলফাযিল কুর'আনিল কারীম*, দারুল হাদীস মিসর, ২০০১ খ্রি., পৃ. ৪২৩-৪২৪

৪৫. আল-কুর'আন, ২: ১১৪

৪৬. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২

৪৭. Thomas Patrick Hughes, op.cit., P.329

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে, "Some mosques are simply assembly halls for prayer. Cathedral or Friday mosques are elaborate buildings designed to house all the adult believer in community. Mosques have also been places of religious instructions, tombs and temporary homes for travelling scholars. The inner walls closest to the holy city of mecca has a decorative nich or arch: called a Mihrab, which indicates the direction Muslims must face when praying in numerous Mosques." [৪৮]

মসজিদের প্রধান বা যিনি মুসল্লীদেরকে সালাত পরিচালনা করে থাকেন- তাঁকে ইমাম বলা হয়। মসজিদে বা মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তিনি ছাত্রদেরকে শিক্ষাও দিয়ে থাকেন। মসজিদে 'আযান দেয়ার জন্য একজন মু'আযযিন নিযুক্ত থাকে এবং খিদমাতের জন্য একজন মুতাওয়াল্লী থাকেন। মসজিদ হল মুসলিম জাতির পবিত্র ও নিরাপদ স্থান।[৪৯] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল গৃহকে উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন। সেখানে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন লোকেরা যাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে, সালাত প্রতিষ্ঠা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তাঁরা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।"[৫০]

মসজিদ মূলত ব্যবহৃত হয়ে থাকে 'ইবাদতের কেন্দ্র হিসেবে। সমাজ জীবনের কেন্দ্র হিসেবেও মসজিদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মসজিদের স্থাপত্য কৌশল বিভিন্ন হয়ে থাকে। সমাজের ও অঞ্চলের সাথে খাপ খাইয়ে মসজিদের ধরন হয়ে থাকে।[৫১] মুসলমানগণ মসজিদে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নিমিত্তেও জমায়েত হয়।[৫২]

সুতরাং আমরা বলতে পার, যেখানে মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে জমায়েত হয় তাই আল্লাহর ঘর মসজিদ। মুসলিম মিল্লাতের জন্য মসজিদ সর্বকালের একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান, এটা ইসলামের একটি অপরাজেয় দূর্গ। এ প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই মুসলিম জাতির প্রাণ শক্তি নিহিত রয়েছে।

৪৮. *The World book Encyclopaedia*, Vol-13., op.cit., P.633

৪৯. Tomas Patrick Hughes, op.cit., P.329-30

৫০. আল-কুর'আন ২৪:৩৬

৫১. Gordon, D,. New by, *A concise Encyclopedia of Islam*, One World, Oxford, 2006, P.143

৫২. *The Encyclopaedia of Religion*, Ed. in chief Mireca Eliade, Macmillan Publishing Company, Newyork, london, 1987, Vol-10, P.121

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মসজিদের উৎপত্তির ইতিহাস

মসজিদুল হারাম

ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান হচ্ছে কা'বা ঘর, যাকে 'আল্লাহর ঘর' (House of Allah) বলে আখ্যায়িত করা হয়। মসজিদটি মক্কার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সমস্ত বিশ্বের মুসলমানগণ এ ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দৈনিক তাঁদের সালাত আদায় করে থাকেন। আর এ ঘরকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান হজ্জ বা 'উমরা পালনের লক্ষ্যে মক্কাতে আগমন করেন। এ পবিত্র ঘর তাঁরা তাওয়াফ করেন হজ্জ বা 'উমরা পালনের সময়।[৫৩] কা'বা শরীফই আল্-কুর'আনের মসজিদুল হারাম। পাপে-তাপে ভরা এ দুনিয়ায় হিদায়াতের আলো বিচ্ছুরণকারী আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে স্থাপিত, এটাই তাঁর প্রথম ঘর। তাঁর সকাশে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করার, তাঁর করুণা দৃষ্টিকে বারংবার উজ্জীবিত করার এটাই মানব জাতির প্রথম 'ইবাদতখানা। পার্থিব জীবনের প্রত্যয়, আচরণ, চিন্তা ও কর্মের সঠিক নির্দেশনা লাভের এটাই একমাত্র কেন্দ্রস্থল। আম্বিয়া (আ.), আওলিয়া এবং আল্লাহ্-নিবেদিত মানবের সঞ্জীবনী শক্তিলাভের একমাত্র উৎসস্থল।[৫৪] আদিকাল হতে এ মসজিদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে। আল্লাহ্র সৃষ্টি সীমার ইহা এক মহান স্বাক্ষর। ধ্যান ও অতীন্দ্রিয় জগতের এটাই উৎপত্তি। এ বায়তুল্লাহ্ই জান্নাতে স্থাপিত 'বায়তুল মা'মূরের' একমাত্র প্রতিকৃতি। সমগ্র সৃষ্টির জন্য ইহা এক অপূর্ব সম্পদ।[৫৫] আল্লাহ ইরশাদ করেন, ''নিঃসন্দেহে কা'বা গৃহ প্রথম ঘর যা মানবের হিদায়াতের জন্য নির্ধারিত হয়েছে- এটি মক্কায় অবস্থিত এবং গোটা বিশ্বের মানবের জন্য এটি হিদায়াত স্বরূপ এবং বরকতময়।"[৫৬]

তৎকালীন আরব ও কা'বার অবস্থা

যখন শয়তানের তাণ্ডবলীলায় সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশ জঘন্যভাবে কলঙ্কিত ও কলুষিত হচ্ছিল। মিথ্যা এসে সত্যের, কুসংস্কার এসে জ্ঞানের, পুরোহিত ও যাজকের বাক্য এসে শাস্ত্রের, পাপ এসে পূণ্যের, ব্যভিচার এসে প্রেমের আসন অধিকার করে বসেছিল। ঠিক সেই সময় খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে শোচনীয় অধঃপতন হতে মানবকে রক্ষা করার নিমিত্তে, ধরাধামে প্রেম-পূণ্যের সম্রাজ্য স্থাপন করার লক্ষ্যে ধরার তিমিরপটলকে বিদূরিত করে তপ্ত-তাপিত ধারাধামে ন্যায়ের, ধর্মের, জ্ঞানের, বিশ্বাসের এবং শক্তি ও মুক্তির স্নিগ্ধ মধুর ও শান্ত-শীতল পূণ্য পীযূষধারা প্রবাহিত করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কাতে আবির্ভাব (৫৭০ খ্রি.) হয়।[৫৭]

---

৫৩. *The Encyclopaedia of Islam,* Netherland: Evan Donzel and others, Leiden, Ej. Brill, 1978. Vol.8 P.317

৫৪. অধ্যক্ষ আবদুর রাজজাক, *মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান*, ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৪

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৫৬. আল-কুর'আন ০৩:৯৬

৫৭. মুহাম্মদ আকরম খাঁ, *মুস্তফা চরিত*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

আরবের বেশির ভাগ মানুষ তখন পুতুল পূজায় লিপ্ত ছিল, অনেক দেবতা ছিল তাদের. মক্কায় ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরাও বসবাস করত। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করেন। মানবকে আল্লাহ্র পথে পরিচালিত করার নির্দেশ পান তিনি। ইসলামের পরম শান্তির বাণী প্রচার করার গুরুদায়িত্ব পান হযরত মুহাম্মদ (সা.)। প্রথম তিন বছর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও অনুসারিগণের নিকট ইসলামের অমিয় বাণী প্রচার করেন। প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার শুরু হয় ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে। এর ফলে তাঁর অনুসারিগণের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ সময় মক্কায় নেতৃস্থানীয় লোকজন তাঁকে বিপজ্জনক মনে করতে শুরু করে।[৫৮] তাঁর সংক্ষিপ্ত নশ্বর জীবনে মুহাম্মদ (সা.) সম্ভাবনাহীন উপাদান থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটান যারা আগে কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। আর তাঁদের মাধ্যমে তিনি এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেন -যা আগে শুধু একটি ভৌগলিক সীমানাকেই বুঝাত, কিন্তু তার জাতীয় চরিত্র বলতে কিছুই ছিল না। বিরাট একটি অঞ্চল জুড়ে খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্মের অবসান ঘটিয়ে বিশাল অংশ এখন এ ধর্মের অনুসরণ করে। মুহাম্মদ (সা.) এমন একটি সম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন তখনকার সভ্য পৃথিবীতে সুন্দরতম প্রদেশগুলো শীঘ্রই সে সম্রাজ্যের সুদৃঢ়, প্রসারিত সীমানার অন্তর্ভূক্ত হয়।[৫৯]

হযরত (সা.) দেখেন আরবের লোকেরা তাদের দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি ও পাথরের সামনে মাথা নত করছে। তাদের চন্দ্রদেবী ছিল যাকে আরবরা আল্-লাত বলে জানত। তারা তার পূজা করত। তাদের আরও দুটি দেব-দেবী ছিল যার নাম মানাত এবং উয্যা। হুবল নামে আরও একটি দেবতার পূজা করত। মুহাম্মদ (সা.) ভাবতেও পারেননি তারা কেন পাথর বা প্রতিমূর্তির পূজা করত।[৬০] আরবরা দেব-দেবতাদের সম্মান করত। প্রকৃত ধর্মের অনুভুতি তাদের মধ্যে মোটেই ছিল না।[৬১] আরবরা ছিল নিরেট অশিক্ষিত জাতি 'আল্লাহ্র স্বত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান, নবুয়তের স্বরূপ ও গুরুত্ব , ওহীর তাৎপর্য, আখিরাত সম্পর্কে ধারণা, 'ইবাদতের তাৎপর্য কোন বিষয়ই তারা ওয়াকিফহাল ছিল না।[৬২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুয়তের সময় (৬১০ খ্রি.) পবিত্র কা'বা গৃহে ৩৬০টি মূর্তি রক্ষিত ছিল। আরববাসিগণ দিবা-রাত্রি এ মূর্তিগুলোর পূজা করত। এ ছাড়াও আরবের লোকেরা তাদের নিজ গৃহে একাধিক খোদা মনে করে তাদের পূজা করত। পিতার খোদা ছিল পৃথক। পুত্রের খোদা ছিল পৃথক। বধুর পৃথক এবং ভ্রাতা-ভ্রাতুস্পুত্র ও ভাগিনের পৃথক। এছাড়া প্রতিটি কবীলা ও প্রতিটি বংশের প্রতিমা পৃথক পৃথক ছিল। আবার কয়েকটি কবীলা সম্মিলিত ভাবেও এক খোদাকে মানত, নযর ও নিয়াযের জন্য যা

---

৫৮. Michael H. Hart, *The 100*, Golden book center, Kualahumpar. 2000, Reprinted, P.34

৫৯. Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, London:Macmillan and edueation Ltd. 1970, tenth ed., P.121-122

৬০. S.F Mahmud, *A short History of Islam*, Newyork: oxford university press, 1988. P.7

৬১. Khuda Baksh, *Contribution to the History of Islamic Civilization,* Vol.1, India: The Calcata University Press, 1929, 2nd ed., p. 177

৬২. আবূ সলীম মুহাম্মদ 'আবদুল হাই, অনূ, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *রাসূল (সা.)-এর বিপণ্ঢবী জীবন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ.১৬

Dhaka University Institutional Repository

কিছু হত তা এর সম্মুখে রেখে সিজদাবনত হত।[৬৩] কা'বা গৃহে সর্বপ্রথম মূতি পূজার সূচনা করে 'উমর বিন লুহাই।[৬৪]

আরবরা কা'বা, শরীফের পাশাপাশি কায়েকটি মূর্তি ঘর স্থাপন করে। এগুলোকে তারা কা'বা ঘরের মতই সম্মান প্রদর্শন করত। এগুলোর থেকেও তত্ত্বাবধায়ক দল ছিল এবং কা'বা গৃহের মত এগুলোর জন্য তারা পশু প্রেরণ করত। তাওয়াফের মত এ মূর্তিগুলোকেও তারা তাওয়াফ করত এবং সেখানে বলি দিত। অবশ্য সেগুলোর উপর কা'বা ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করত। কেননা তারা মনে করত কা'বা ঘর হচ্ছে ইব্রাহীম (আ.)-এর নির্মিত ঘর এবং তাঁর মসজিদ। তারা যমযম কূপের নিকটে ইসাফ ও নায়েলা নামক দু'টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। সেখানে তারা কুরবানী করত।[৬৫] মক্কা বিজয়ের সময় (৮/৬৩০) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কা'বার ভেতরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। কারণ তাতে বহু সংখ্যক উপাস্য বা পাথরের মূর্তি আকারের দেব-দেবী ছিল। তিনি এগুলো বের করে আনার নির্দেশ প্রদান করেন। ঐগুলো বের করে ফেলা হল। সকলে ইব্রাহীম (আ.) ও ইব্রাহীমের মূর্তিও বের করে ফেললেন। তাদের হাতে ছিল শুভ-অশুভ নির্ণায়ক তীর ফলক। এগুলো সরানোর পর রাসূলুল্লাহ (সা.) কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন।[৬৬] মুহাম্মদ আলী বলেন, ''মুহাম্মদ (সা.) -এর জন্মের সময় (৫৭০খ্রি.) পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে আরবে মূর্তি পূজা অনেক বেশি ছিল। কা'বা গৃহে মূর্তিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং প্রত্যেক গৃহেই অতিরিক্ত মূর্তি ছিল।"[৬৭] তবে এটা সুস্পষ্ট যে, প্রাচীনকালেও আরবগণ কা'বা গৃহকে সম্মান করত। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে এ ঘরে তারা হজ্জও করত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে হজ্জের নিয়ম কানূন ও তৎকালীন আরবের নিয়ম কানূন ছিল কিছুটা ভিন্ন।[৬৮] তারা কা'বা ঘর তাওয়াফ করত, প্রাচীন অনৈসলামিক নিয়ম পদ্ধতিতে। তারা অনাবৃত অবস্থায় সাতবার কা'বা গৃহকে প্রদক্ষিণ করত। কুরায়শগণ হজ্জের পোষাক বিক্রির বিশেষ অধিকারী ছিল। এতে তাদের ব্যবসায়িক অর্থ কড়িও মুনাফা হত।[৬৯] কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) হজ্জের বিশেষ এক ধরনের পোষাক প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। যা দু' অংশে পরিধান করা হয়। একভাগ নাভির থেকে নিু অংশ

---

৬৩. শাইখ মুহাম্মদ ইসমা'ঈল পানিপথী, অনু মহিউদ্দীন শামী, *ইসলাম প্রচারের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ১৩

৬৪. মুহাম্মদ বিন 'আবদুল করীম শিহরিস্ড়ানী, *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, বৈরূত: দার্ল কুতুব 'ইলমিয়াহ, তা. বি., ৩য় খ্ড, পৃ. ৬৪৮

৬৫. 'আবদুল মালিক বিন হিশাম, *সীরাতুন-নবী*, দার্ত্ তাকওয়া মিসর, ২০০৪, ১ম খ্ড, পৃ. ৪৫। ইসাফ ও নায়েলা ছিল জুরহাম গোত্রের দু'জন নারী-পুর্ষ। ইসাফ কা'বা ঘরের অভ্যন্ড়রে নায়েলার সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হয়। তখন আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাদের উভয়কে পাথরে পরিণত করেন। দ্র. 'আবদুল মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খ্ড, পৃ. ৪৫

৬৬. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল মানাসিক, ১ম খ্ড, ভারত: কুতুবখানা রশীদিয়া, তা. বি., পৃ. ২১৮

৬৭. Maulana Muhammad Ali, *Living thoughts of the prophet Muhammad*, chapter 1, cassel and company limited, London, 1947, P.1, (মূল উদ্ধৃতি, "At the time of his birth Arabia was steeped deed in the worst form of idoltry that was ever prevailed in any country. The ka'aba itself was full of idols, and everyhouse held had in addition its own idols"). কা'বা ঘরে অনেক মূর্তি ছিল। তাদেরকে আলণ্ঢাহ্র কন্যা বলা হত এবং এদেরকে মধ্যস্থতাকারী মনে করা হত। দ্র. Muhammad. Pickthal, *Al-Amin*. Kitab Bhavan, New Delhi, Nodated. P.12

৬৮. Khuda Baksh. op.cit., Vol-1, P. 48

৬৯. Ibid., P.49

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত। আর অপর খণ্ডটি বুকে ও কাঁধে পরিধান করা হয়। মাথা থাকে অনাবৃত। আর আরবের প্রাচীন প্রথা ছিল তারা কা'বা ঘর তাওয়াফ করে সাফা ও মারওয়াতে যেত সেখানে তারা দুটি মূর্তি স্থাপন করেছিল।[৭০] মক্কাবাসীরা আর্থিক অভাবের কারণে যখন স্বচ্ছলতার অনুসন্ধানে কোন দেশে গমন করার ইচ্ছা পোষণ করত তখন তারা কা'বা শরীফের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সেখান থেকে একখণ্ড পাথর সঙ্গে করে নিত। আর যেখানে তারা অবতরণ করত আনিত পাথরের টুকরাটি সেখানে রেখে কা'বার তাওয়াফের মত করে সেটিকে তাওয়াফ করত। তারা কোন সুন্দর ও আকর্ষণীয় পাথর পেলেই তার পূজা শুরু করত। ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈলের ধর্মের পরিবর্তে তারা দেব-দেবীর পূজা শুরু করে দিল। বায়তুল্লাহ্‌র সম্মান, এর তাওয়াফ, হজ্জ, 'উমরা, মুয্‌দালিফায় অবস্থান, কুরবানী, হজ্জ ও 'উমরার ইহ্‌রাম প্রভৃতিতে ইব্রাহীম যুগের কিছুটা রীতি-নীতি চলে আসছিল। কিন্তু তারা এতে অনেক বিকৃতি ঘটিয়ে ছিল।[৭১]

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবের কবিগণ কা'বা গৃহের সামনে এসে কবিতা পাঠ করত। বক্তা বা লেখকগণ তাদের সাহিত্য পাঠ করত। আর এগুলো কা'বা গৃহের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হত। পরর্বতী বছর পর্যন্ত এগুলো কা'বা গৃহের দেয়ালেই থাকত।[৭২] মুহাম্মদ 'আলী বলেন, ''কুরায়শগণ কা'বাকে উচ্চ মর্যাদা দিত। তারা এ ঘরের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করত। কা'বা ছিল সমস্ত আরবের লোকদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র।"[৭৩]

কা'বা নির্মাণের ইতিহাস

কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাত থেকে ভারতের সন্দ্বীপে নিক্ষেপ করা হয়।[৭৪] আরাফাত নামক স্থানে আদম ও হাওয়া (আ.)-এর পরিচিতি সম্পন্ন হলে আদম (আ.), আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করলেন- 'ইবাদাতের নিমিত্তে বায়তুল মা'মূর[৭৫] ঘরের মত

---

৭০. Ibid., P.50.

৭১. 'আবদুল মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩; কা'বা ঘর ছিল তাদের আয়ের উৎস। কিন্তু তারা ভীত-সন্ত্রস্ড় ছিল, না জানি মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম মূর্তি পুজকদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে তাদের এটিকে বিনষ্ট করে ফেলে। (Prof. K.Ali, *Study of Islamic History*, Delhi: Idarah-1 Adabiyat-1, 1980, Re-printed, P.-32)

৭২. Imam Vehbi Ismail, *Muhammad the last prophet,* Iqram press, Iowa, united states, 1962, P.11

৭৩. Muhammad Ali, *The living thougth of the prophet Mohammad*, op.cit., chapter. I, P.1. (মূল উদ্ধৃতি, "The Quraish who were held in the highest estem, being guardians of the Secred house at mecca, The Ka`ba the spiritual centre of the whole Arabia")

৭৪. মুহাম্মদ বিন 'আবদুল করীম শিহরিস্ড়নী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৫

৭৫. **বায়তুল মা'মূরঃ**- বায়তুল মা'মূর হল আকাশে অবস্থিত মসজিদুল হারামের মত একটি ঘর। বায়তুল মা'মূরের নমুনা অনুসারে কা'বা ঘর নির্মিত হয়েছে। এটি কা'বা ঘরের ঠিক বরাবর। সপ্তম আকাশে অবস্থিত। এ ঘরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিস্ড়া তাওয়াফ করে। অতঃপর তাঁরা কা'বা ঘরও তাওয়াফ করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ করে। যে দল একবার তাওয়াফ করে কিয়ামত পর্যন্ড় তাঁরা আর তাওয়াফ করার সুযোগ পায় না। বায়তুল মা'মুর জান্নাতের ইয়াকূত পাথরের তৈরি-এর দু'টি দরজা। একটি পূর্বদিকে অপরটি পশ্চিম দিকে। একটি দরজার নাম বাবুশ শারকী এবং অপরটির নাম বাবুল গারবী। ('আলায়ুদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আলী, *তাফসীর আল-খাযিন*, ১ম খণ্ড, ওয়াহীদী কুতুবখানা, পেশওয়ার, পাকিস্ড়ান, তা. বি., পৃ. ২৭১; আবূল ওয়ালীদ আল-আযরকী, তাহকীক, সা'ঈদ আবদুল ফাত্তাহ, *তারীখে মাক্কাহ*, ১ম খণ্ড, মাকতাবাতু নায্‌যার মুস্ড়ফা আল বা'য, *আল-মামলুকাতুল 'আরাবিয়াতুস সা'উদিয়্যাহ*, ২০০৬

একটি ঘর নির্মাণের জন্য। অতঃপর আদম (আ.) আল্লাহ্‌র নির্দেশে বায়তুল মা'মূর এর সদৃশ একটি গৃহ নির্মাণ করেন।[৭৬] 'The Encyclopaedia of Religion' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ''কা'বার আদিম ইতিহাস নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে একথা নিশ্চিত যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের (৫৭০খ্রি.) কয়েক শতাব্দী পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল।"[৭৭] ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণ এর বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। ইমাম সুহায়লী বলেছেন, কা'বা ঘর পাঁচবার নির্মাণ করা হয়েছে। কেউ কেউ দশবার, আবার কেউ কেউ এগার বারের কথাও উল্লেখ করেছেন।[৭৮] পাঁচবার হ'ল (১) শীস (আ.) (২) ইবরাহীম (আ.) (৩) কুরায়শগণ (৪) 'আব্‌দুল্লাহ্‌ বিন যুবায়র (রা.) (৫) খলীফা মালিক বিন মারওয়ান। জমহূরে 'উলামা কিরামের নিকট কা'বা ঘর প্রথম নির্মাণ করেছিল ফিরিস্তাগণ অথবা আদম (আ.)। এর পর শীস (আ.) নির্মাণ করেন।[৭৯] আযরকী বলেছেন যে, পৃথিবী সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্‌ কা'বা নির্মাণ করেন এবং এর নীচ থেকে পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।[৮০] আল্লাহ্‌ ফিরিস্তাগণকে নির্দেশ দিলেন আমার জন্য বায়তুল মা'মূরের অনুরূপ গৃহ নির্মাণ কর। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টিকুলকে নির্দেশ দিলেন কা'বা ঘর তাওয়াফ করার জন্য। যেমনিভাবে আকাশে বায়তুল মা'মূর তাওয়াফ করা হয়।[৮১] ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে এ 'কা'বাঘর'[৮২] ছিল পানির উপর। আর এ থেকেই পৃথিবী সম্প্রসারিত

খ্রি., পৃ. ৪৬; 'আবূ মুহাম্মদ হুসায়ন বিন মাস'উদ, *তাফসীর আল বাগভী*, ১ম খণ্ড, পাকিস্তান: ইদারাতুল তালীফাতু আশরাফিয়া, তা. বি., পৃ. ১১৫; মুহাম্মদ বিন 'আবদুল করীম শিহরিস্তানী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৬ (প্রান্তটীকা))।

৭৬. মুহাম্মদ বিন 'আবদুল করীম শিহরিস্তানী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৬।

৭৭. *The Encyclopadia of Religion*, Vol. 8, ed., Newyork: Mircea Eliade, Macmillan publication company,. 1987. P.226. (ইংরেজি উদ্ধৃতি, "The Historical origin of the ka.ba is uncertained, but it had undoutly existed for several centuries before the birth of Muhammad 570 C.E.").

৭৮. মুহাম্মদ 'আবদুল মা'বূদ, *তারীখে মাক্কাহ মুকাররমা* (উর্দূ), ২য় খণ্ড, ফরীদ বুক ডিপো. লিমিটেড, দরিয়াগঞ্জ, নিউদিলণ্ডী, তা. বি., পৃ. ২৫

৭৯. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬। সীরাতুল মুস্তফাতেও কা'বা ঘর পাঁচবার নির্মাণের কথা উলেণ্ডখ রয়েছে। (আলণ্ডামা ইদরীস কান্দুলুভী, *সীরাতুল মুস্তফা* (উর্দূ), ১ম খণ্ড, ভারত: আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি., পৃ. ১১৩)

৮০. আবূল ওয়ালীদ আল আযরকী, তাহকীক, সা'ঈদ 'আবদুল ফাত্তাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩

৮১. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬

৮২. **কা'বা ঘর:**- পবিত্র কা'বা আলণ্ডাহ্‌ তা'আলার ঘর। এর সম্মান, মহিমার জন্য এটিকে এ নামে অভিহিত করা হয়। كعب শব্দটির বহুবচন اكعب-এর অর্থ সম্মানিত, উচ্চ। কা'বাকে এজন্যই এ নামে আখ্যায়িত করা হয়, কারণ এ ঘর বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আবার كعب অর্থ গোড়ালি। যেহেতু এটি তালুর উপরে থাকে। বায়তুলণ্ডাহকে এজন্যই কা'বা বলা হয় যেহেতু এটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে। আবার কা'বাকে এজন্যই কা'বা বলা হয়, যেহেতু প্রাচীন যুগে এ ঘরের সম্মানার্থে কেউ এ ঘর থেকে উঁচু কোন ঘর তৈরি করেনি। কা'বা ঘরের মত চতুষ্কোণ করে সর্ব প্রথম একটি ঘর তৈরি করে হামীদ বিন যুররী। তখন কুরায়শগণ এটিকে অপছন্দ করে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, "এটিকে এজন্যই কা'বা বলা হয় যেহেতু এতে নারী-পুরুষ একত্রে জমায়েত হয়।" ইব্‌ন ওয়ায়না বলেন, "এটি একটি সম্মানিত ঘর। কা'বা থেকে সম্মানিত কোন ঘর পরিদৃষ্ট হয় না।" আবার এটিকে বায়তুল 'আতীকও বলা হয়। কারণ এ ঘরকে আলণ্ডাহ্‌ প্রতাপশালী ও অহংকারীদের থেকে মুক্ত রেখেছেন। আবর চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ঘরকেও কা'বা বলা হয়। আর এ ঘর যেহেতু চতুষ্কোন আকৃতির তাই এর নাম কা'বা। কা'বা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম ঘর। পৃথিবী সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে এ ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, কা'বার অপর নাম বাক্কা। কারণ কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় সকলেই ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকে। মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বলেন, মানুষ একে সম্মান করেই তাওয়াফ করে থাকে। (মুহাম্মদ 'আবদুল মা'বূদ, *তারীখে মাক্কা মুকাররমা* (উর্দূ), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯-২০; 'আবূল ওয়ালীদ আল

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[৮৩] আবার কেউ কেউ বলেন যে, এ ঘর প্রথম আদম (আ.) নির্মাণ করেন। অতঃপর নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় তা বিলীন হয়ে যায়। অতঃপর 'ইবরাহীম (আ.) তা নির্মাণ করেন।[৮৪] ইমাম তাবারী (র.) (মৃ. ৩১০/৯২) বলেন, মসজিদুল হারাম 'ইবাদতের, হিদায়াতের ও বরকতের জন্য নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর।[৮৫] সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে কা'বা ঘরকে নির্মাণ করা হয়েছে। অতঃপর কা'বা ঘরের নীচ থেকে পৃথিবী সম্প্রসারিত করা হয়েছে।[৮৬] আদম (আ.) যখন কা'বা গৃহটি নির্মাণ করেন তখন ৫টি পাহাড়ের পাথর দ্বারা কা'বা নির্মাণ করেন। পাহাড় পাঁচটি হল জাবালে লুবনান, জাবালে তুর, জাবালে যীতা, জাবালে জুদী, জাবালে হীরা।[৮৭] হযরত আদম (আ.)-এর পর তদীয় পুত্র শীস (আ.) নির্মাণ করেন। আর এটি নূহ্ (আ.)-এর তুফান পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[৮৮] অতঃপর ইব্রাহীম (আ.) কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। লোকেরা কা'বা ঘরে 'ইবাদত করবে এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.)-কে দিয়ে কা'বা ঘর নির্মাণ করান। কিন্তু মুশরিকরা এতে 'ইবাদত করতে বাধা দিত। এভাবে তারা কা'বা ঘরের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে। তাদের দাবি ছিল ইব্রাহীম মুশরিক ও পৌত্তলিক ছিলেন। মূলত তাদের দাবি ছিল মিথ্যা। প্রকৃত পক্ষে ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন তাওহীদ পন্থি মহা-সাধক। পৃথিবীতে আল্লাহ্র দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কা'বা ঘরে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র 'ইবাদত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমা'ঈল (আ.) কে দিয়ে কা'বা ঘর নির্মাণ করান।[৮৯] তাঁদের কাছ থেকে এ ওয়াদাও নিয়েছিলেন তাঁরা যেন এ ঘর তাওয়াফকারী. ই'তেকাফকারী, রুকূ' ও সিজদাকারিগণের জন্য পবিত্র রাখে।[৯০]

আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল (আ.) কে কা'বা নির্মাণের আদেশ প্রদান করেন তখন তাঁরা কা'বা ঘরের স্থানটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা খাজুজ নামক একটি বাতাস প্রেরণ

আযরকী, তাহকীক, সা'ঈদ 'আবদুল ফাত্তাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৯৪-৯৬; 'আলণ্ঢামা রাগিব ইসফাহানী, তাহকীক, মুহাম্মদ খলীল, *আল মুফরাদাতু ফি গারীবিল কুর'আন*, কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্ড়ান, তা. বি., পৃ. ৪৩৪; 'আবূ বকর জাবির আল জাযায়িরী, *আয়সারত তাফাসীর*, মাকতাবাতু আয ওয়াউল মানার, আল মামলুকাতুল 'আরাবিয়্যাতুস সা'উদিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৩১৫; মাওলানা রেদওয়ানুল হক ইসলামীবাদী, *খানায়ে কা'বা*, ঢাকা: রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, তা. বি., পৃ.৪-৫)।

৮৩. আবূল ওয়ালীদ আল আযরকী, তাহকীক, সা'ঈদ 'আবদুল ফাত্তাহ, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.৪১

৮৪. 'আবূ মুহাম্মদ আল-হুসায়ন মাস'উদ, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১১৫-১১৬

৮৫. 'আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর, *তাফসীর তাবারী*, ৪র্থ খ, বৈরূত: দার ইহ্ইয়া উত-তুরাস, তা. বি., পৃ.১৪

৮৬. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খ, পৃ. ১৩।

৮৭. মুহাম্মদ 'আবদুল মা'বূদ, *তারীখে মাক্কা মুকাররমা*, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ৩১। পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর মসজিদুল হারাম। এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস। আর এ দু'-এর মধ্যে ব্যবধান ছিল চলিণ্ঢশ বছর। (আবূল ফযল শিহাবুদ্দীন আস-সায়্যিদ মাহমুদ আলূসী, তাহকীক, সায়্যিদ ইবরাহীম ইমরান ও ড. সায়্যিদ মুহাম্মদ আসসায়্যিদ, *তাফসীর রুল মা'আনী*, ৪র্থ খ, মিসর: দার হাদীস, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৩০৬; 'আলায়ুদ্দীন 'আলী বিন মুহাম্মদ আল খাযিন, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ২৭২; জালালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মুহালণ্ঢী, *তাফসীর জালালাইন*, ভারত:মুখতার এন্ড কোম্পানী, তা. বি., পৃ.৫৬)

৮৮. প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ৩৭

৮৯. ইসমা'ঈল ইব্ন কাসীর, *তাফসীর ইব্ন কাসীর*, ১ম খ, দার ল মুফীদ, বৈরূত, লেবানন, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ. ১৫০

৯০. আল-কুর'আন, ০২:১২৫

Dhaka University Institutional Repository

করলেন। তার ছিল দুটি পাখা ও সর্পাকৃতির মস্তক। প্রেরিত বাতাস কা'বা ঘরের স্থানটিকে আবর্জনা মুক্ত করে দেয়। তখন ইব্রাহীম ও 'ইসমাঈল (আ.) মাটি খুঁড়ে সেখানে কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেন।[৯১] কা'বা নির্মাণের লক্ষ্যে ইসমা'ঈল (আ.) পাথর এনে দিতেন, আর 'ইব্রাহীম (আ.) কা'বা ঘরের ভিত গেঁথে উঁচু করতেন।[৯২] এরপর ভিত যখন উপরে উঠে গেল, তখন ইব্রাহীম (আ.) একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে গৃহ নির্মাণ করতে লাগলেন। যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি গৃহ নির্মাণ করেছিলেন তাকে 'মাকামে ইব্রাহীম' বলে। এরপর যখন গৃহ নির্মাণ শেষ হল, আল্লাহ্ মানব জাতিকে এতে হজ্জ করতে ইব্রাহীম (আ.) কে বলার নির্দেশ দেন।[৯৩] যখন ইব্রাহীম (আ.) ইসমা'ঈল কে সঙ্গে নিয়ে এ ঘর নির্মাণ করেন তখন ইসমা'ঈলের বয়স হয়েছিল বিশ বছর।[৯৪]

ইব্রাহীম (আ.)-এর কা'বা গৃহের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি আদম (আ.)-এর ভিত্তির উপর কা'বা নির্মাণ করেন। তিনি পাথরের উপর পাথর বসিয়ে দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন। এজন্য কোন কর্দমাক্ত মাটি বা চুনা বা অন্য কিছু ব্যবহার করেননি। তাঁর তৈরি করা গৃহে ৪টি রুকন ছিল। রুকনে হাজরে আসওয়াদ, রুকনে ইরাকী, রুকনে শামী ও রুকনে ইয়ামানী। দরজা জমিন বরাবর ছিল, বেশি উঁচু ছিল না। কা'বা শরীফের ছাদ ছিল না।[৯৫] কা'বা ঘর নির্মাণকালে ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল (আ.) কে বললেন, يا بنى اطلب الحجر الأسود من الهند في অর্থাৎ হে বৎস! আমার জন্য ভারত বর্ষ থেকে হাজরে আসওয়াদ নিয়ে আস। মূলত এটা ছিল সেই শুভ্র ইয়াকূত পাথর যা দেখতে উট পাখির ন্যায়। হযরত আদম (আ.) এ পাথরসহ জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। মানুষের স্পর্শে এটা কালো হয়ে যায়। ইসমা'ঈল (আ.) পাথর নিয়ে পিতার কাছে এসে উক্ত হাজর আসওয়াদ দেখতে পেয়ে পিতাকে প্রশ্ন করেন এ পাথর কে নিয়ে এসেছে। তিনি বললেন, তোমার চেয়ে অধিক গতি সম্পন্ন এটি নিয়ে এসেছে। অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়ই নির্মাণ কাজে মনোনিবেশ করেন।[৯৬] অতঃপর তাঁরা আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন,''হে রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন- নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও বিজ্ঞ"।[৯৭] হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নির্মিত কা'বা জুরহাম গোত্র- অতঃপর আমালিকা গোত্র নির্মাণ করে।[৯৮]

কুরায়শ কর্তৃক কা'বা নির্মাণ

হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হওয়ার হাজার হাজার বছর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে (৬০৫ খ্রি.) কুরায়শ গোত্রের লোকেরা কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করেন। উক্ত

---

৯১. ইসমা'ঈল ইব্ন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১ম খণ্ড, মিসর:মাকতাবাতুস সাফা, ২০০২ খ্রি., পৃ. ১৫৫

৯২. ইসমা'ঈল ইব্ন কাসীর, *তাফসীর ইব্ন কাসীর*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪

৯৩. আবূল হাসান 'আলী বিন মুহাম্মদ আশ্ শায়বানী, তাহকীক, খায়রী সা'ঈদ, *আল-কামিল ফিত্ তারীখ*, ১ম খণ্ড, মিসর: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, তা. বি., পৃ.৮৬

৯৪. মুহাম্মদ আবদুল মা'বূদ, *তারীখে মক্কা মুকাররমা*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১

৯৫. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭

৯৬. ইসমা'ঈল বিন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫

৯৭. আল-কুর'আন ০২: ১২৭

৯৮. 'আবদুর রহমান ইব্ন খলদুন, *মুকাদ্দমা ইব্ন খলদুন*, মিসর: দার ইব্ন হায়সাম, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ কাজে রাসূল্লাহ্ (সা.) অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বয়স ছিল তখন পঁয়ত্রিশ বছর। তিনি লোকদের সাথে কাঁধে করে পাথর আনতেন।[৯৯] কা'বা ঘরের মাঝখানে একটি কুপের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর সাপ ছিল। লোকজন সর্পটিকে কুপে প্রতিদিন খাদ্য সামগ্রী দিত। সাপটি প্রতিদিন কা'বা গৃহের দেয়ালে আসত। একদিন একটি বড় বাজপাখি সাপটিকে দেয়াল থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। সাপটির অপসারণকে তারা শুভ লক্ষণ মনে করল। আবার জনৈক রোমক বণিকের একটি সামুদ্রিক নৌকার ভগ্নাংবশেষ জেদ্দায় এসে পৌছাল। এর তক্তাগুলো কা'বা ঘরের ছাদ নির্মাণের জন্য বিশেষ উপযোগী ছিল। মক্কায় তখন জনৈক অভিজ্ঞ কিবতী মিস্ত্রিও বাস করত। তাঁর গৃহ নির্মাণ-বিদ্যা কুরায়শগণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হল। উপরোক্ত আনুকুল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুরায়শগণ কা'বা ঘর পুনঃ নির্মাণ কাজে হাত দিল।[১০০] কুরায়শদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল কা'বা গৃহের ছাদ নির্মাণ করা। কারণ তা ধসে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর তাও শুধু পাথরের উপর পাথর বসিয়ে মানব দেহ থেকে সামান্য উঁচু করে তা নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে কোন গাঁথুনি ছিল না। তাঁরা কা'বা গৃহের দেয়াল আরও উঁচু ও ছাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[১০১] অতঃপর কুরায়শগণ যখন কা'বা গৃহ নির্মাণ কাজে হাত দিল, তখন এমন সময় আবূ ওয়াহ্হাব বিন্ 'আমর বিন অলীদ বিন 'উমার বিন মাখযূম কা'বা গৃহের একটি পাথর বিচ্ছিন্ন করে হাতে নিলে পাথরটি তাঁর হাত থেকে ছুটে গিয়ে সেখানেই পুনঃস্থাপিত হয়। তখন সে কুরায়শগণকে কা'বা ঘরে শুধু বৈধ উপার্জিত অর্থ ব্যয় করতে বলে।[১০২] অতঃপর কুরায়শগণ কা'বা গৃহের কাজের দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। দরজা ভাঙার দায়িত্ব পড়ল বনূ 'আব্দি মান্নাফ ও বনূ যুহরার উপর। রুকনে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী অংশের দায়িত্ব পড়ল বনূ মাখযূমের উপর এবং তাঁদের সঙ্গে কুরায়শদের আরও কয়েকটি কবীলা যুক্ত হল। কা'বা ঘরের ছাদের দায়িত্ব পড়ল বনূ জুমাহ ও বনূ সাহাফের উপর। হিজর বা হাতীম হিসেবে পরিচিত এটির দায়িত্ব পড়ল আবূ যুফার বিন কুসাই, বনূ আসাদ ইব্ন 'আব্দুল উয্যা ইব্ন কুসাই ও বনূ 'আদী ইব্ন কা'ব এর উপর।[১০৩] কা'বা ঘর নির্মাণের জন্য কুরায়শদের শাখা গোত্রগুলো পৃথক পৃথকভাবে পাথর সংগ্রহ করে তা নির্মাণ করতে

---

৯৯. ইসমা'ঈল বিন কাসীর, তাফসীর ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৫৭

১০০. প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৫৭

১০১. 'আবদুল মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৯৮

১০২. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, তাহকীক, মুস্ড়ফা আস-সায়্যিদ ও তারিক সালিম, *তারীখু আত-তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৫৩৩

১০৩. প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৫৩৩-৩৪; কা'বা গৃহ ভাঙতে গিয়ে লোকজনদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তখন ওয়ালীদ বিন মুগীরা সর্বপ্রথম কোদাল হাতে নিয়ে বলে, হে আলণ্ঢাহ্ আমরা যেন বিপদগ্রস্থ না হই। আমরা শুধু কল্যাণের জন্যই এ কাজ হাতে নিয়েছি। অতঃপর সে রুকনে ইয়ামানী ও হাজর আসওয়াদের কিছু অংশ ভেঙে ফেলল। সে তখন উদ্বিগ্ন অবস্থায় রাত্রি কাটায়-এ ভয়ে না জানি তাঁর কোন ক্ষতি হয়। সকালে সুস্থ অবস্থায় আবার সে কাজে যোগ দেয়। তাঁর সাথে অন্যান্য কুরায়শগণ কা'বা ঘর ভাঙার কাজে যোগ দেয়। এভাবে তাঁরা ইব্রাহীম (আ.)-এর ভিত পর্যন্ড় পৌঁছলে সবুজ উজ্জল এক পাথর দেখতে পায় যার একটি অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, সে সময় কাজে নিযুক্ত জনৈক ব্যক্তি পাথর দু'টির মাঝে শাবল দিয়ে আলাদা করার চেষ্টা করলে গোটা মক্কা নগরী প্রকম্পিত হয়ে উঠে। ফলে তাঁরা ভিত ভাঙার কাজ বন্ধ করে দেয়। (আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারির আত্-তাবারী, তাহকীক, মুস্ড়ফা আসসায়্যিদ ও তারিক সলিম, *তারীখু আত-তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৫৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

লাগল। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স ছিল তখন পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর (৬০৫খ্রি.)। কা'বা ঘর নির্মাণ শেষে হাজর আসওয়াদ পর্যন্ত এলে তখন এটি স্থাপন নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায় এবং পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের আহবান জানায়। 'আবদুদ দার মৃত্যুর জন্য শপথ করে বসে। অবশেষে কুরায়শগণ কা'বার পার্শ্বে জমায়েত হয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে বিবাদ মীমাংসার সিদ্ধান্ত নেয়।[১০৪]

আবূ উমাইয়া ফয়সালা করলেন, যে ব্যক্তি আগামী দিন খুব ভোরে মসজিদের দরজা দিয়ে প্রথম প্রবেশ করবে তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। এতে সকলেই সম্মত হল। পরদিন মুহাম্মদ (সা.) সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহতে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে সবাই বলতে লাগল ইনি আমাদের চিরবিশ্বস্ত 'আল্-'আমীন। আমরা তাঁর ফয়সালা মেনে নেব। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একখানা চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং চাদরে পাথরখানা রাখলেন। কুরায়শদের প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধিকে চাদরের কোণে ধরতে বললেন। তাঁরা চাদরের কোণে ধরে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে উঁচু করে চাদরটি ধরলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ হাতে পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করলেন।[১০৫] এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে কুরায়শগণ এক বিরাট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে পরিত্রাণ পেল।[১০৬] মূয়র বলেন, "The Decision raised the charactere of Muhammad for wisdom and judgement"[১০৭]

কা'বা ঘর ছাদযুক্ত নির্মাণ করা হল। কিন্তু প্রয়োজনীয় আসবার পত্রের অভাবে জমিনের এক অংশ ছেড়ে দেয়া হল এবং চারটি দেয়াল দিয়ে কা'বা ঘর নির্মাণ করা হল যাতে পরবর্তী অবস্থায় এটির অবশিষ্টাংশসহ নির্মাণ করা যায় যাকে এখন হাতীম বলা হয়।[১০৮] এ পর্যায়ে তাঁরা কা'বার দরজা বেশ উঁচু করে দিল যাতে একমাত্র তাঁদের অনুমতি প্রাপ্ত লোকই কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে পারে। দেয়ালের উচ্চতা ছিল পনের হাত- ভেতরে খুঁটি ছিল ছয়টি- উপর থেকে ছাদ ঢালাই করা হল- এটি চতুষ্কোণ আকৃতি ধারণ করল, বর্তমানে কা'বা ঘরের উচ্চতা ১৫ মিটার। হাজর আসওয়াদ মাটি থেকে দেড় ফুট উচ্চে।[১০৯]

৮ম/৬২৯ খ্রি. মক্কা বিজয়ের সময়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কা'বার কোন পরিবর্তন করেননি।[১১০] কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত 'আয়িশা (রা.)-কে বলেছিলেন- যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হত - তবে তিনি কা'বার দুটি দরজা করতেন, একটি প্রবেশ হওয়ার- অন্যটি বের হওয়ার।[১১১] তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর প্রত্যাশা

---

১০৪. 'আবদুল মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০; হাজর আসওয়াদ প্রতিস্থাপন নিয়ে কুরায়শদের মধ্যে চারদিন পর্যন্ড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বিরাজ করে। অতঃপর আবূ উমাইয়া বিন মুগীরার হস্ড়ক্ষেপে তা মীমাংসা হয়। (শায়খ মুহাম্মদ আল-খিযরী, *নূরুল ইয়াকীন*, মাকতাবাতুস সাফা, মিসর, ১৪২২/২০০২, পৃ. ১৮)

১০৫. 'আবদুর রহমান ইব্ন খালদুন, *তারীখু ইব্ন খলদুন*, ২য় খণ্ড, দারুল ফিকর, বৈরূত, লেবানন, ১৪২১/২০০০, পৃ. ৪০৯

১০৬. 'আলণ্ডামা শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন নবী* (উর্দূ), ১ম খণ্ড, দারুল হাদীস, মুলতান পাকিস্ড়ান, ২০০২, পৃ. ১০৯

১০৭. Sir William Muir, *The lifie of Mehomet*, Voice of India, New Delhi, 2002, 2nd Re-prented, P.30

১০৮. 'আলণ্ডামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯

১০৯. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম*, মিসর:দারুল ওয়াফা, ২০০৫ খ্রি., সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ. ৬৮

১১০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৭ম খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ. ৩২

১১১. মুহাম্মদ 'আবদুল মা'বূদ, *তারীখে মক্কা মুকাররমা* (উর্দূ), প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

'আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়র (র.) (মৃ. ৬৯২)-এর কা'বা নির্মাণের সময় ৬৩২ সনে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল।[১১২] তাছাড়া হযরত আবূ বকর (রা.)- এর খিলাফতকালে (৬৩২-৬৩৪) ও হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল (৬৩৪-৬৪৪) পর্যন্ত তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। কুরায়শদের নির্মাণ অবয়বই বিদ্যমান ছিল। তবে হযরত 'উমরের (রা.)- এর সময় কা'বা ঘর বন্যার কবলে পড়লে মাকামে ইবরাহীম স্থানচ্যুত হয়ে গেলে তা একটু সরিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করে দেন। আজ পর্যন্ত সেখানেই বিদ্যমান আছে। আর এটা তিনি করেছিলেন মুসল্লী ও হাজীগণের সুবিধার্থে।[১১৩]

খুলাফা রাশিদীন-এর পরবর্তী সময়ে কা'বা নির্মাণ

'আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রা.) (মৃ. ৬৯২) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর ইচ্ছানুযায়ী কা'বাকে ইব্রাহীম (আ.)-এর বুনিয়াদের উপর পরিপূর্ণভাবে তৈরি করেন। রুকনে হাজর আসওয়াদ থেকে রুকনে ইরাকী পর্যন্ত ৩২ হাত (যিরা)। রুকনে ইরাকী থেকে রুকনে শামী উত্তর দেয়াল ২২ হাত, রুকনে শামী থেকে রুকনে ইয়ামানী পশ্চিম দেয়াল ৩১ হাত। রুকনে ইয়ামানী থেকে রুকনে হাজর আস্ওয়াদের দক্ষিণ দেয়াল ২৫ হাত।[১১৪]

৬৯২ খ্রি. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, 'আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়রকে হত্যা করে তদানীন্তন খলীফা 'আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের (শাসনকাল ৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) নিকট পত্র লিখেন, যুবায়র (মৃ. ৬৯২ খ্রি.)-এর নির্মিত অংশ ভেঙে দিতে। এ নির্দেশ মতে খলীফার লোকজন কা'বার উত্তর দেয়ালে ভেঙে ফেলে। হাতীম অংশকে ভিতর থেকে বের করে দেয় এবং অন্যান্য পাথর কা'বা ঘরের ভেতরে রেখে দেয়াল উঠিয়ে দেয়। ফলে পূর্ব দিকের দরজা উঁচু হয়ে যায় এবং পশ্চিমের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে কা'বা এ অবস্থায়ই আছে।[১১৫] ৯৯হি. সনে খলীফা ওয়ালীদ বিন মালিক (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫খ্রি.) কা'বা ঘর সংস্কার করেন।[১১৬] ১৬২৯-৩০ সনে মক্কায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যার সৃষ্টি হলে কা'বা ঘরের ভেতরে অনেক পানি প্রবেশ করে। তখন সুলতান মুরাদ 'উসমানী ১৬৩০ সনে কা'বা ঘর পুনরায় সংস্কার করেন।[১১৭] ৯৩০ সনে কারামাতি সম্প্রদায় কা'বা ঘর আক্রমণ করে হাজর আস্ওয়াদ ছিনিয়ে নেয়।[১১৮] অবশ্য ২০ বছর পর উহা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করা হয়।[১১৯] ১৯৫০ সনে কা'বা ঘরের চতুর্পাশ নতুন করে

১১২. মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১১৩. শায়খ তোয়া-হাল ওয়ালী, *আল মাসাজিদু ফিল ইসলাম*, বৈরূত:দার্ল 'ইলম লিল মালইন, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৩৯২

১১৪. মাওলানা মুহাম্মদ যুবাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১১৫. ইসমাঈল বিন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৫৫-৫৬

১১৬. শায়খ তোয়া-হাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩

১১৭. মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; ১০৩৯ হি. সনের শা'বান মাসে তিন দিন বন্যার পানি স্থায়ী থাকে। (মাওলানা 'আবদুল মাকিন, *হারামায়ন শরীফায়ন কি বাহারি* (উর্দূ), পাকিস্ড়ন: মাকতাবাতু দার্ল কলম, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৩৬)

১১৮. Ludwig Wig. Adamec, op.cit., P.154

১১৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৭ম খ, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রসারিত করা হয় যাতে ২ মিলিয়ন লোক হজ্জ সম্পাদন করতে পারে।[১২০] সর্বশেষ সম্প্রসারণ করেন সৌদি বাদ্‌শাহ্ ফাহ্‌দ বিন 'আব্দুল 'আযীম ১৯৮৮ সনে।[১২১]

আব্‌রাহার আক্রমণ থেকে কা'বা মুক্ত

আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা গৃহকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিপদ থেকে মুক্ত রাখেন। আর একথা স্পষ্ট যে, ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বেও আরবরা কা'বা গৃহকে যথেষ্ট সম্মান করত। এজন্য আবরাহার বাদশাহ্ হস্তী বাহিনীসহ যখন কা'বা ঘর ধ্বংস করতে চেয়েছিল (৫৭০/৫৭১খ্রি.) তখন তারা এটাকে বিপদ মনে করল। কা'বা ঘরকে রক্ষার জন্য আব্‌রাহার বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা জরুরি মনে করল। যূ-নফর নামে একজন ইয়ামেনের প্রভাবশালী লোক আরবের লোকদেরকে কা'বা ঘর ধ্বংস করা থেকে প্রতিহত করার জন্য জিহাদের আহবান জানান। কিছু লোক তাঁর আহবানে সাড়া দেয়। যূ-নফর ও তাঁর সঙ্গীরা আবরাহার বিরূদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত ও গ্রেফতার হয়।[১২২] অবশেষে আব্‌রাহা হুনাতা হিমইয়ারীকে আরবের সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান লোকের নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করে। সে 'আবদুল মুত্তালিবের কাছে উপস্থিত হয়।[১২৩] সে 'আবদুল মুত্তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ না করার কথা বলে। আরও বলে যে, তারা যদি বাধা না দেয় তবে তারা কা'বা ঘর ধ্বংস করে ফিরে যাবে।[১২৪] 'আবদুল মুত্তালিব পরিস্কারভাবে যুদ্ধ না করার কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে, এটা আল্লাহ্‌র ঘর। এটা ইব্‌রাহীমের ঘর। আল্লাহ্ যদি বাধা দেন তখন তাঁদের কিছু করার নেই। এটা আল্লাহ্‌র নিজের ঘর ও তাঁর সম্ভ্রমের বিষয়। তিনি যদি ছেড়ে দেন তাহলেও তাঁদের কিছু করার নেই।[১২৫] অবশেষে কা'বা ঘরকে আল্লাহ্ নিজেই রক্ষা করেন, আব্‌রাহার বাহিনীর হাত থেকে কুরায়শদের রক্ষা করে আল্লাহ্ তাঁদের উপর করুণা করেছেন এবং কুরায়শদের নিজস্ব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বহাল রাখতে সাহায্য করেছেন।[১২৬] আল্লাহ্ বলেন, "(হে নবী) (সা.) তুমি কি দেখেছ তোমার রব হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? তিনি তাদের শুধু ব্যর্থ করে দেননি। তিনি তাদের বিরূদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন। যারা তাদের উপর পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করে। তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণের মত করে দিয়েছেলেন।"[১২৭] সে সময়কার বিশ্বে পারস্য ও রোম যেহেতু উন্নত ও সভ্য দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল- এ কারণে বিশ্ব মানবের দৃষ্টি কা'বার ঘরের দিকে নিবদ্ধ হল। কা'বা ঘরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা বুঝতে পারেন এ ঘরকে আল্লাহ্ পাক-পবিত্র হিসেবে মনোনীত করেছেন। কাজেই

---

১২০. Ludwig Wig. Adamec, op.cit., P.154

১২১. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা:আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৬৭

১২২. আবূ জা'ফর মুহামমদ বিন জারীর, *তারীখুত তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮

১২৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮

১২৪. ড. 'আলী মুহাম্মদ সালণ্ডাবী, *আস্-সীরাতুন নবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, মিসর: মুয়াসসা-সাতি ইকরা, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৩৭

১২৫. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর, *তারীখুত তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮

১২৬. মুহাম্মদ 'আবদুল মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০

১২৭. আল-কুর'আন ১০৫:১-৫

Dhaka University Institutional Repository

মক্কার জনপদ থেকে নবুয়তের দাবিসহ কারও উত্থান অবশ্য সমীচীন হত। বাস্তবে হয়েছিলও তাই- রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমন হয়েছিল এখানেই।[১২৮]

কুবা মসজিদ

বর্ণ-গোত্র ও জাতিভেদের বহুরূপী স্বার্থ-সংঘাত ও ভৌগোলিক সীমার বেড়াজালকে মিসমার করে নিখিল বিশ্বের সকল মানব সন্তানের জন্য তাদের সর্বাধিক প্রয়োজন ও অভাবকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে শতধা বিচ্ছিন্ন ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত মনুষ্য সমাজকে এক অখণ্ড ও সুসামঞ্জস্য মহাজাতিতে পরিণত করার নিমিত্তে বিশ্ব প্রকৃতি এক বিশ্বনবী (সা.)-এর আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ও উদ্‌গ্রীব ছিল। সৃষ্টির পূর্ণতা লাভের তীব্র ব্যকুলতাকে চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা.) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন।[১২৯] বিভিন্ন নবীগণ যে আদর্শ ও শিক্ষার প্রচার প্রতিষ্ঠাকল্পে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন মূলনীতির দিক দিয়ে তা এক ও অভিন্ন। কিন্তু জ্ঞানের পরিপক্কতা ও প্রগতিবাদের ক্রম- বিকাশের বিভিন্ন স্তরে দা'ওয়াত ও প্রচারণার সূর যেমন বিভিন্ন কণ্ঠে ঝংকৃত হয়েছিল, নুবুয়াত ও রিসালাতের আকৃতি এবং প্রকৃতি সেরূপ যুগ ধর্ম অনুসারে অনিবার্যভাবে বৈচিত্রময় হয়ে পড়েছিল।[১৩০] হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নুবুয়াত ও রিসালত দেশ, জাতি ও গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। ভূভাগের প্রতিটি প্রান্ত- তাঁর বিশ্বজনীন নবুয়াতের সম্রাজ্যসীমার অন্তর্ভূক্ত।[১৩১] আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, "হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যই সেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল, যাঁর অধীনে আকাশসমূহ ও গোটা পৃথিবী।"[১৩২] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "আমি তোমাকে বিশ্বচরাচরের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।[১৩৩]

পূর্ণ মানবতার ব্যবহারোপযোগী সঠিক পরিমাপের মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ হস্তে নিয়ে যুগ যুগান্তর হতে মহাকাল এক নিস্কলুষ, পূর্ণাঙ্গ, পরিণত-বুদ্ধি, আদর্শ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ও উদ্বেলিত চিত্তে দিন গণনা করতেছিল। কালের প্রতীক্ষাকে স্বার্থক এবং মানব ধর্মের বিকাশ প্রাপ্তির আকুলতাকে ধন্য করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) গতানুগতিকতা ও বৈজ্ঞানিকতার যুগ সন্ধিক্ষণে বিশ্বচরাচরের রহমত রূপে পৃথিবীর নাভিকুণ্ডে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১৩৪] মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত দূত ও রাসূল। যখন জাতির প্রতি তাঁর দাওয়াত ছিল যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁকে ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।

---

১২৮. 'আলণ্ঢামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১২৯. 'আলণ্ঢামা আবদুলণ্ঢাহিল কাফী আল্-কুরাইশী (র.), *নবুয়তে মুহাম্মদী*, ঢাকা: আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৩

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৩২. আল-কুর'আন ০৭:১৫৮

১৩৩. আল-কুর'আন ২১:১০৭

১৩৪. 'আলণ্ঢামা আবদুলণ্ঢাহিল কাফী আল-কুরাইশী, *নবুয়তে মুহাম্মদী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র নবী এটা অবশ্যই মানতে হবে। যে এ মহাসত্যটিকে অস্বীকার করবে সে নাস্তিক, যে এ সত্যটি পরিহার করবে সে-ই কাফির।[১৩৫]

বস্তুতান্ত্রিক জগতে যে কার্য প্রাকৃতিক বিধানসমূহের অবগতি ও আবিস্কার দ্বারা সাধিত হয়েছে, নীতি-নৈতিকতার জগতে সেই কার্য মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক নবুয়তের চরমত্ব সাধন দ্বারা সুসম্পন্ন হয়েছে। স্বাদেশিকতার প্রাচীরগুলো মিসমার করে মুহাম্মদ (সা.) যে রূপ মানবগোষ্ঠীর প্রত্যেককে পরস্পরের একান্ত নিকটবর্তী করেছেন, সেরূপ নবুওয়তের চরমত্ব প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদান করে তিনি অতীত ও বর্তমানের ভেদ রেখাকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন।[১৩৬] যেহেতু মুহাম্মদ (সা.) কোন ব্যক্তি বা গোত্রকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে যাননি। পক্ষান্তরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত গৌরবমণ্ডিত মুকুটের অধিকার তিনি সমুদয় উম্মতকে দান করে গেছেন।[১৩৭] মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ববাসীর অনুসরণের জন্য যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন ব্যবস্থা বহন করে এনেছিলেন এবং তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শ এবং মদীনায় স্থাপিত ইসলামী নবরাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে তা রূপায়িত করেছিলেন।[১৩৮]

মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কায় অবস্থান ও ইসলামের দা'ওয়াত

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির পর **১৩** বৎসর মক্কাতে অবস্থান করে মক্কাবাসী ও অন্যান্য মানুষদেরকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানালেন। আরবের সকল অংশ থেকেই তখন হজ্জের মৌসুমে লোকজন মক্কার পবিত্র কা'বা গৃহে হজ্জ সম্পাদন করার জন্য আগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সে সময়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করতেন।[১৩৯] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্প্রদায়ের চরম বিরোধিতা ও ইসলামের শত্রুতা যখন চরমে উঠল, তখন সামান্য কিছু লোকই ছিল এর ব্যতিক্রম, যাঁরা তাঁর প্রতি 'ঈমান আনয়ন করেছিলেন। তিনি হজ্জ মৌসুমে আরব গোত্রসমূহের সম্মুখে নিজেকে পেশ করে তাঁদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে লাগলেন। আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করতে লাগলেন এবং তাঁদেরকে জানাতে লাগলেন, তিনি প্রেরিত নবী। তিনি তাদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বললেন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁকে সমর্থন করতে অনুরোধ জানালেন। যাতে তিনি আল্লাহ্র বিধান বর্ণনা করতে পারেন তাঁদের সামনে। কারণ এজন্যই তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে– এসব ব্যাপার তাঁদেরকে অবগত করতে লাগলেন।[১৪০]

সেই সুযোগে নবুয়তের দশম সনে (৬২০ খ্রি.) হজ্জ মৌসুমে ইয়াসরিবের ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাঁরা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, নিজেদের কাওমের কাছে

১৩৫. Reynold A. Nicholson, *The Mystics of Islam,* New Delhi: Indigo Books, Ansari Road, Daryagonj, 2002, P.79.

১৩৬. 'আলণ্ঢামা 'আবদুলণ্ঢাহিল কাফী, আল-কুরাইশী, *নবুয়তে মুহাম্মদী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

১৩৯. Dr. F.M. Maniruzzaman, op.cit. P.78

১৪০. 'আবদুলণ্ঢাহ্ মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে তাঁরা মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালতের ব্যাপারে তাবলীগ করবেন।[১৪১] 'Foundation of Islam' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "They thought he might be of help in the problems-social, commercial and especially tribal-they were facing in their own city. If he had a religious lesson to impart, so much the better"[১৪২]

পরবর্তী বছর (৬২১ খ্রি.) হজ্জ মৌসুমে ১২ জন লোক মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আগমন করে। এদের মধ্যে জাবির বিন 'আবদুল্লাহ্ (মৃ.৭৮হি.) ছাড়া বাকি অন্য পাঁচজন ছিলেন তাঁরা যাঁরা গত বছর (৬২০ খ্রি.) হজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।[১৪৩] এ দলটি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা পর্যালোচনা করল এবং তাঁদের সম্প্রদায়কে ইসলামের দা'ওয়াত দিল। এভাবে মক্কার বাহিরে ও মদীনাতে ইসলামের প্রসার ও প্রচার ঘটে। ফলে মদীনায় আনসারগণের মধ্যে একটি বাড়িও অবশিষ্ট থাকল না যেখানে মুহাম্মদ (সা.)-এর আলোচনা হত না।[১৪৪] তাই রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে Micheal H. Heart বলেন, æOf humble origins, Muhammad founded and promulgated one of the world's great relegions, and became an immensely effective political leader. To-day, their ten centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive"[১৪৫] অর্থাৎ বিশ্বের মহান ধর্ম ইসলামের প্রর্বতক ও প্রচারক মুহাম্মদ (সা.) সবচেয়ে বেশি সফল রাজনৈতিক নেতা। তাঁর মৃত্যুর তের শতাব্দী পরও তাঁর সে প্রভাব আজও আগের মতই মজবুত ও বিস্তৃত রয়েছে।

যা হোক এসমস্ত লোকজন হজ্জ মৌসুমে 'আকাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এটাই ছিল 'প্রথম 'আকাবা। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের এ বায়'আত ছিল নারিগণের বায়'আত অনুষ্ঠানের মত। এ বায়'আত ছিল কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরয হওয়ার আগে।[১৪৬] মুস্তফা চরিতে মাওলানা আকরাম খাঁ উল্লেখ করেছেন, "নবুয়তের দশম বৎসরে (৬২০খ্রি.) হজ্জ মৌসুমে মক্কা হইতে একটু দূরে 'আকাবা নামক স্থানে ছয়জন বিদেশি বসে কথাবার্তা কহিতেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে, তাহারা মাদীনাবাসী খাজরায বংশীয় লোক। হযরত তাহাদিগকে একটু স্থির হইয়া তাঁর কথা শ্রবন করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদেশিগণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি খুব সরল ও প্রাঞ্জল

১৪১. সাফিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

১৪২. Benjamin Walker, op.cit. P.114-115

১৪৩. সফিউর রহমান, প্রাগুক্ত ,পৃ. ১৩৯

১৪৪. মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ৪৪; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী, তাহকীক, মুস্ড়ফা সায়্যিদ ও তারিক সালিম, *তারীখু আত-তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৫৭৬

১৪৫. Micheal H. Heart, op.cit., P.33

১৪৬. 'আবদুল মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ.৪৪; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জরীর আত্তাবারী, তাহকীক, মুস্ড়ফা সায়্যিদ ও তারিক সালিম, তারীখু আত-তাবারী, ১ম খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও সভ্যতার কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে তিনি কুর'আনের কতকগুলি আয়াত পাঠ করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করিলেন।"[১৪৭]

এরই ফলশ্রুতিতে নবুয়তের দ্বাদশ সনে (৬২১ খ্রি.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট ইয়াসরিবের বার জন লোক মক্কায় আগমন করে তাঁরা সকলেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দীন প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ঈমানের মূল্যবান সম্পদ লাভ করেন। তাঁরা যে সব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন–সেগুলো ছিল নিম্নরূপ,

১) আমরা চুরি ও ব্যভিচার করব না।

২) আমরা আমাদের সন্তানদের হত্য করব না।

৩) আমরা কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিব না এবং কারও সাথে চোগলখোরী করব না।

৪) আমরা প্রতিটি ভাল কাজে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য করব।[১৪৮]

এরা সকলেই মিনায় 'আকাবার কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিকট কয়েকটি বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮)-এর পর এবং মক্কা বিজয়ের (৬৩০) সময় এসব কথার উপরেই মহিলাদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিল।[১৪৯] এ ব্যাপারে বুখারীতে হযরত 'উবাদা বিন সামিত (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং 'আকাবা বায়'আতের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। একবার একদল সাহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর আশে পাশে বসে আছেন এমন সময় তিনি বললেন, "তোমরা আমার নিকট এ বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ কর যে, তোমরা কোন কিছুকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সঙ্গে শরীক করবে না। চুরি করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না। কাউকে মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোন ন্যায় কাজে আমার আদেশ অমান্য করবে না। তোমাদের যে কেউ এ আদেশ পালন করবে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট পুরস্কার পাবে। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয়ের কোন কিছু অমান্য করবে যদি তাকে সে অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দেয়া হয় তবে তার শাস্তি তার পাপের কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। যা হোক, তার কাজের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। তখন আমরা ঐ শর্তে তার নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম।[১৫০] এ বায়'আতই ছিল আনসারগণের প্রথম বায়'আত। তবে কেউ কেউ তিনটি বায়'আতের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম ছয় জনের বায়'আত

১৪৭. মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

১৪৮. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫০; কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মনসূরপুরী, *রাহমাতুল্‌ লিল 'আলামীন* (উর্দূ), ১ম খণ্ড, মাকতাবায়ে ইসলামীয়া, উর্দূ বাজার, লাহোর, পাকিস্তান, ২০০৬, পৃ. ১১৬

১৪৯. সফিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

১৫০. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম, পরবর্তী ছয় জনের বায়'আত দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ বায়'আত তৃতীয় বায়'আত হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ পার্থক্য বর্ণনা পদ্ধতির ঘটনার নহে।[১৫১]

মদীনায় মুবাল্লিগ প্রেরণ

বায়'আত গ্রহণকারিগণ যখন মদীনায় ফিরে এসেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের সাথে 'আমর ইব্ন উম্মে মাখতুম (মৃ. ২৩হি.) এবং হযরত মুস'আব বিন 'উমায়র (রা.) কে (মৃ. ৩হি.) শিক্ষক ও মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করেন। যাতে তাঁরা ইসলাম গ্রহণকারীদের কুর'আন শিক্ষা দিতে এবং মদীনাতে ইসলামের দা'ওয়াত জোড়দার করতে পারেন। তাঁরা উভয়েই আবূ উমামা আসওয়াদ বিন যুরারা (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করছিলেন। হযরত মুসা'আব (রা.) ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। একদিন হযরত মুস'আব (রা.) চল্লিশ জনকে জুমু'আর নামায পড়ান। তাঁদের মধ্যে উসায়দ বিন হুযায়র (রা.) (মৃ. ২০হি.) ও সা'দ বিন মু'আয (রা.) (মৃ. ৫হি.) ছিলেন।[১৫২] মুস'আব (রা.) এজন্যই আনসারদের ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন কারণ আওস ও খাযরাজের লোকেরা এটা পছন্দ করত না যে তাঁদের এক গোত্র অন্য গোত্রের ইমাম হোক।[১৫৩] 'The spirit of Islam' গ্রন্থে বলা হয়েছে, æAfter the pledge, they returned home with a disciple of mohammad to teach them the fundamental doctrines of the new religion, Which rapidly spread among in habitats of yathrib."[১৫৪] অর্থাৎ বায়'আত গ্রহণের পর নতুন ধর্মের মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবী (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা ইয়াসরিব প্রত্যাবর্তন করেন। এ নতুন ধর্ম অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ইয়াসরিবের অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করল। Muir যর্থাথই বলেছেন, "মদীনাতে ইসলাম দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করতে লাগল এবং এর মূল দৃঢ় করতে লাগল। পরবর্তী হজ্জের সময় শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য মানুষ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল অধিকতর শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য।"[১৫৫]

এ বছরই আসওয়াদ বিন যুরারা (রা.) মদীনাতে জুমু'আর সালাত আদায় করেন। তিনি যখন দেখেন যে, ইয়াহূদী ও নাসারাদের সম্মিলনের জন্য সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট আছে। ইয়াহূদীরা শনিবার ও নাসারাগণ রবিবার দিন একস্থানে সমবেত হয়। তখন তাঁদের মনেও এ ধারণা জন্ম নিল যে, মুসলমানদের জন্যও একটি দিন নির্দিষ্ট হওয়া উচিত যে দিনটিতে তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার গুণ-গান ও সালাত আদায় করতে পারে। আসওয়াদ বিন যুরারা (রা.) এজন্য জুমু'আর দিন নির্ধারিত করলেন এবং ঐ দিন সকলকে নামায পড়ালেন।[১৫৬] আসলে সাহাবীগণ তাঁদের অভিমত অনুসারে জুমু'আর সালাত কায়েম করেন এবং

১৫১. সীরাত বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন ২০০৩, পৃ. ১৯৮

১৫২. মূল ইব্ন কাসীর, অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী, *সীরাত ইব্ন কাসীর*, লন্ডন: আল্-কুরআন একাডেমী, ২০০৬ খ্রি. পৃ. ৩০-৩১

১৫৩. 'আবদুল মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৪৫

১৫৪. Ameer Ali, op.cit., P.43

১৫৫. William Muir, *The life of Mehomet*. op.cit. P.120

১৫৬. সীরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

জুমু'আর দিনকে 'জুমু'আ' নামে আখ্যায়িত করেন। জুমু'আর দিনকে পূর্বে 'ইয়াওমে 'আরূবা' (يوم عروبة) বলা হত। আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবীদের দু'টি ইজতিহাদকেই অনুমোদন করেন।[১৫৭] আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেন। يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ[১৫৮] এ আয়াত দ্বারা জুমু'আর সালাত ফরয হওয়ার বিষয়টিও অবগত হওয়া গেল এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট يوم الجمعة বা জুমু'আর দিন পছন্দনীয় তাও অবগত হওয়া গেল। জাহিলিয়া যুগে প্রচলিত (يوم عروبه) 'ইয়াওমি আরূবা' নামটি সম্পূর্ণ রূপে আয়াতে পরিহার করা হয়েছে। এভাবেই আনসারদের ইজতিহাদের অনুমোদন প্রকাশ করা হয়েছে। এর কিছুদিন পরই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ হতে মুসা'আব (রা.) (মৃ. ৩হি.)-এর নিকট একটি নির্দেশ নামা পৌঁছে, যাতে জুমু'আর দিনে দ্বিপ্রহরের পর সকলে সমবেত হয়ে দু' রাকা'আত সালাত দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার নির্দেশ দান করা হয়।[১৫৯]

'আকাবার শপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইসলামের বিজয় অভিযান 'আকাবা থেকেই শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নব দীক্ষিতদের কাছে অহেতুক কিছু দাবি না করে শুধুমাত্র সৎকাজে তাঁকে সমর্থন করতে বললেন। প্রবল আত্মপ্রত্যয় পেয়েছিলেন। আল্লাহ্র একত্ববাদ, কলুষমুক্ত সমাজ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শুরু করেছিলেন– তা কৃতকার্যতা লাভ করে সর্বপ্রথম মদীনায় এবং মদীনাকে কেন্দ্র করেই তা সমগ্র আরবে এবং পরে পৃথিবীর চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১৬০] মুস'আব (রা.) আসওয়াদ বিন যুরারা (রা)-এর বাড়িতে এগার মাস অবস্থান করেন। এসময়ের মধ্যে মদীনার বহুলোক তাঁর হাতে দীক্ষিত হয়। পরবর্তী হজ্জের মৌসুমে তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- কে আওস ও খাযরাজের মধ্যে তাঁর কাজের বিবরণ প্রদান করেন।[১৬১] যা হোক মুস'আব প্রমুখ দ্বিগুণ উৎসাহের সাথে মদীনায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করছিলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই মদীনার প্রচার প্রত্যেক গোত্রেই ইসলাম নিজের স্থান প্রস্তুত করে নিল।[১৬২]

'আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত

নবূয়তের তেরতম বর্ষে (৬২২খ্রি.) হযরত মুসা'আব ইব্ন 'উমায়র (রা.) (মৃ. ৩হি.) মুসলমানদের একটি দল নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে মক্কায় গমন করেন। এ দলে সংখ্যায় আওস ও খাযরাজের লোকই ছিল বেশি। প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী তাঁরা ছিল সংখ্যায় পঁচাত্তর জন। তিহাত্তর জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা, মোট পঁচাত্তর জন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ঐ স্থানে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন– যেস্থানে

১৫৭. 'আলণ্ঢামা ইদরীস কান্দুলুভী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৩৩৬

১৫৮. আল-কুর'আন ৬২:০৯

১৫৯. 'আলণ্ঢামা ইদরীস কান্দুলুভী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৩৩৬

১৬০. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *রাসূলুলণ্ঢাহ্র জীবন ও আদর্শ*, ঢাকা: আশরাফিয়া বই ঘর, বাংলা বাজার, আগষ্ট, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ১৩০

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

১৬২. মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমবার বায়'আত করেছিলেন। তাই এ বায়'আতকে 'আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত বলে।[১৬৩] তাঁরা যখন মক্কায় সমবেত হন তখন ছিল আইয়ামি তাশরীকের মাঝামাঝি সময়। অর্থাৎ ১২ই জিলহজ্জ তারিখ। তাঁদের হজ্জ সম্পাদন করার পর।[১৬৪] মুসলমানরা ১২ই যিলহজ্জ রাতে পৌত্তলিকদের ঘুমে রেখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে অতি গোপনে 'আকাবায় গিয়ে সমবেত হন। তারা ভরা আকাশ আর জোছনা-স্নাত রজনীতে নিঝুম নিস্তব্দতায় অধীর আগ্রহে রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতীক্ষা করতে থাকেন। গভীর রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর পিতৃব্য 'আব্বাস (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে 'আকাবায় যান। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর 'আব্বাসই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রবল সাহায্যকারী।[১৬৫] আলোচনা শুরু হলে 'আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা যাঁরা এসেছ মনে হয় আমি তোমাদের চিনি। মনে হয় তোমরা মদীনার 'অধিবাসী।[১৬৬] হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে তাঁদের আলোচনা শুরু ও কথাবার্তা হল, 'আকাবা নামক স্থানে। তাদেরকে মহিমান্বিত করার জন্য, নবী করীম (সা.) কে সাহায্য করার জন্য, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের জন্য এসময়টিকে নির্বাচন করেছিলেন।[১৬৭] তাঁদের সঙ্গে ছিলেন 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমর বিন জাবির। তিনি ছিলেন মুশরিক। তাঁদের উপদেশে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে 'আকাবায় উপস্থিত হন।[১৬৮] সীরাত ইব্ন কাসীরে উল্লেখ রয়েছে, নবুয়তের ১৩তম বছরে হজ্জের মৌসুমে (জুন ৬২২খ্রি.) ৭৩ জন নারী-পুরুষ গোপনে মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁরা নিজ গোত্র ও মক্কাবাসী উভয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে মক্কায় এসে পৌঁছেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল মক্কাবাসীরা হয়ত ইসলাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যেমনিভাবে তারা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয়। সেখানে সর্বপ্রথম হযরত বারা ইব্ন মারূর বায়'আত গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা 'আব্বাস (রা.) এ বায়'আত শক্তিশালী করার জন্য নিজে মজলিসে উপস্থিত হন। তখনও তিনি মুসলমান হননি।[১৬৯] কিন্তু ভাতিজাকে কুরায়শদের সকল অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সকলেই যখন উপবেশন করলেন। তখন 'আব্বাস (রা.) আলোচনার সূত্রপাত করলেন।[১৭০]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করে শুনালেন। তা শ্রবণ করে তাঁদের অন্তর ঈমানের জ্যোতিতে ভরে গেল। তখন তাঁরা আবেদন করলেন–রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেন তাঁদের শহরে চলে যান–যাতে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে তাঁর করুণা লাভ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "তোমরা কি দীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আমাকে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে? যখন আমি তোমাদের শহরে গিয়ে বসতি স্থাপন করব তখন কি তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের মতই

১৬৩. সীরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৫ম খ, পৃ. ২০৪

১৬৪. মুহাম্মদ বিন 'আবদুল ওয়াহাব, তাহকীক, মুহাম্মদ 'আবদুল হামীদ ফিকহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১৬৫. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

১৬৬. মুহাম্মদ বিন 'আবদুল ওয়াহাব, তাহকীক, মুহাম্মদ 'আবুদল হামীদ ফিকহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১৬৭. ইসমা'ঈল বিন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ. ১২৮

১৬৮. মুহাম্মদ বিন 'আবদুল ওয়াহ্হাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১৬৯. ইব্ন কাসীর, অনু, খাদিয়া আখতার রেজায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১৭০. মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

আমার সন্তানদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। তখন ঈমানদারগণ বললেন, আমরা এরূপ করলে বিনিময়ে কি পাব? নবী করীম (সা.) বললেন, তখন তোমরা জান্নাত পাবে- যা নাজাত ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির স্থান। তখন তাঁরা বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনি আমাদের সান্তনা দিন যে, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না তো? মুহাম্মদ (সা.) বললেন, "কখনও না"। আমার জীবিত থাকা ও মৃত্যুবরণ করা তোমাদের মাঝেই হবে। এ শেষ বাক্যটি শ্রবণ করা মাত্রই সত্যের প্রেমিকগণ খুশি ও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করার দীক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলেন। বারা ইব্‌ন মা'রূফ (মৃ. ৬২২খ্রি.) তিনি ঐ রাত্রে সর্বপ্রথম দীক্ষা গ্রহণ করলেন।[১৭১] 'আকাবার দ্বিতীয় বায়'আতে (৬২২খ্রি.) পর যে সব মুসলিম তখন পর্যন্ত মক্কার বাইরে যাননি কিন্তু তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদেরকে ইয়াসরিবে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। ঐসব ঈমানদারগণ তাঁদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, মাতা-পিতা, ভ্রাতা এবং স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের ত্যাগ করে যাওয়াতে মোটেই কষ্ট ছিল না। বরং এটাই খুশির বিষয় ছিল যে, তাঁরা এক আল্লাহ্‌র 'ইবাদত ইয়াসরিবে গিয়ে খোলা মনে করতে পারেন।[১৭২]

যা হোক, 'আকাবার দ্বিতীয় বায়'আতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের কাছ থেকে কিছু অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন। أخذت وأعطيت অর্থাৎ "আমি কিছু অঙ্গীকার আদায় করছি এবং কিছু অঙ্গীকার দিয়েছি"।[১৭৩] বায়'আত সুসম্পন্ন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রস্তাব করলেন যে, বার (১২) জন নেতা মনোনীত করা হোক। তাঁরা হবে তাঁদের কওমের নকীব। তাঁরা বায়'আতের শর্তগুলো নিজ কওমের লোকদের নিকট পূরণ করার দায়িত্ব পালন করবে। প্রিয়নবী (সা.) উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকেই বার (১২) জনের নাম জানাতে বললেন। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই বার (১২) জন নকীব মনোনীত করা হল। নয়জন (৯) খাজরাজ গোত্রের এবং তিনজন (৩) আওস গোত্রের।[১৭৪] খাজরায গোত্রের নয়জন হল: (১) আস'আদ বিন যুরারা (রা.) (২) সা'আদ বিন রবী বিন 'আমর (৩) 'আবদুল্লাহ্ বিন রাওহা বিন সা'লাবা, (৪) রাফি' বিন মালিক বিন উজলাম (৫) আল-বারা বিন মা'রূফ বিন সায়র (৬) 'আবদুল্লাহ্ বিন 'আমর বিন হারাম (৭) 'উবাদা বিন সামিত বিন কায়স, (৮) সা'আদ বিন 'উবাদা (৯) আল-মুনযির বিন 'আমর।[১৭৫] আওস গোত্রের নকীবগণ হলেন, (১) উসায়দ বিন হুযায়র বিন সিমাক (রা.) (২) সা'আদ বিন খায়সামা বিন হারিসা (রা.) (৩) রিফা'আ বিন 'আবদিল মুনযির বিন যুবায়র (রা.)।[১৭৬]

---

১৭১. কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মানসূরপুরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০

১৭২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২

১৭৩. ইসমা'ঈল বিন কাসীর, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩০

১৭৪. 'আলণ্ঢামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, তাহকীক, মুস্ত্ফা আস্-সায়্যিদ ও তারিক সালিম, *তারীখু আত-তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৮

১৭৫. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫; মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১; 'আলণ্ঢামা ইদরীস কান্দুলভী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪

১৭৬. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫; মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০; 'আলণ্ঢামা ইদরীস কান্দুলুভী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪

Dhaka University Institutional Repository

বারজন নকীব নির্বাচিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নামা নিলেন। কেননা তাঁরা ছিলেন অধিক দায়িত্বশীল। তিনি বললেন, "তোমরা স্বজাতীয়দের সকল বিষয়ের জন্য দায়িত্ববান ও যিম্মাদার। হাওয়ারীগণ (১২ জন) হযরত 'ঈসা (আ:)-এর পক্ষ থেকে যেমন দায়িত্বশীল ও যিম্মাদার ছিলেন। ঠিক তেমনই তোমাদেরও আমি মুসলমানদের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল ও যিম্মাদার নিযুক্ত করলাম। তখন সবাই সমস্বরে বললেন হাঁ।[১৭৭]

আর এটাই ছিল দ্বিতীয় 'আকাবার শপথ। একে 'বায়'আতুল কুবরা'ও বলা হয়। এটি এমন পরিবেশে সংঘটিত হয়েছিল যে, ঈমানদারদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, বিশ্বাস, ও সাহসিকতার প্রেরণা এখানে জাগরুক ছিল। মদীনার 'ঈমানদারদের অন্তর মক্কার দূর্বল ভাইদের প্রতি ছিল ভালবাসায় পরিপূর্ণ। সাহায্য করার উদ্দীপনায় মনে ছিল দূর্বার সংকল্প। অত্যাচারী বিধর্মীদের জন্য অন্তরে ছিল তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা। না দেখেও যাঁদের আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভাই হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁরা ছিল প্রকৃত ভাই। এ ধরনের প্রেরণা বাহ্যিক কোন আকর্ষণের কারণে ছিল না। সময়ের স্রোতধারায় এ ভালবাসার প্রেরণা মুছে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বরং ভালবাসার মূলে ছিল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও আল্লাহ্র কুর'আনের প্রতি ঈমান। এ ঈমান কোন যুল্ম-অত্যাচার ও নির্যাতনের সামনে কখনও বিনষ্ট হয় না। এ ঈমানের বলে বলিয়ান হয়েই মুসলমানগণ পৃথিবীতে বিস্ময়কর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিল। সেই কৃতিত্বের উদাহরণ অতীতেও পৃথিবীতে পাওয়া যায়নি–ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে না।[১৭৮] ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "The interval which elepsed between the first and second pledge is remarkable as one of the Most critical periods of Mohammad's Mission. The sublime trust of Muhmmed in God, and the grandeur of his character, never standforth mere promminently than at this period."[১৭৯]

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত

দ্বিতীয় বায়'আতে 'আকাবা (৬২২খ্রি.) সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম কুফ্রী ও মূর্খতার মধ্যে নিজের জন্য একটি আবাস ভূমির বুনিয়াদ রচনা করতে সক্ষম হয়। দা'ওয়াতের শুরু থেকে এটা ছিল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। প্রিয় নবী (সা.) মুসলমানদের অনুমতি দিলেন। তাঁরা যেন নিজেদের নতুন দেশে হিজরত করে চলে যায়।[১৮০] সেমতে মুসলমানগণ হিজরত করা শুরু করেন। এদিকে পৌত্তলিকরা মুসলমানদের যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। কারণ পৌত্তলিকরা বুঝতে পারল যে, হিজরতের পর ভবিষ্যতে তাদের জন্য-ভীতি ও বিপদ দেখা দিতে পারে। সাহাবা (রা.) যে সময় পরিবার-পরিজন, ধন-

১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী, *তারীখু তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৫৭৮

১৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

১৭৯. Ameer Ali, op.cit, P.43

১৮০. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ সব ছেড়ে আওস ও খাযরাজদের এলাকায় পৌঁছতে শুরু করল- তখন মক্কার পৌত্তলিকরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। ক্রোধে তারা ফেটে পড়তে লাগল। ইতোপূর্বে তারা কখনও এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। এ পরিস্থিতি ছিল তাদের মূর্তিপূজা ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর মারাত্মক আঘাত ও হুমকি স্বরূপ। দ্বিতীয় 'আকাবার প্রায় আড়াই মাস পর ১২ সেপ্টেম্বর ৬২২খ্রি. শুক্রবার সকালে তারা দারুন-নদওয়ার এক সভা আহ্বান করে– যা ছিল মক্কার পার্লামেন্ট দারুন-নদওয়া। ইতিহাসে যা ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে ইসলামী দা'ওয়াতের পতাকাবাহী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া এবং ইসলামের আলোকে চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দেয়া। দারুন নদওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে হত্যার ঘৃণ্যতম ও জঘন্য প্রস্তাব পেশ হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে প্রিয় নবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি নবী করীম (সা.) কে কুরায়শদের ষড়যন্ত্র সম্পর্ক অবহিত করেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার হিজরত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হিজরত করার সময়-ক্ষণ জানিয়ে দিয়ে জিব্রাঈল (আ.) নবী (সা.) কে বললেন, আপনি আজ রাত আপনার বাস ভবনের বিছানায় শয়ন করবেন না।[১৮১]

দারুন নদওয়ার অধিবেশন বসেছিল কুসাই বিন কিলাবের গৃহে। এখানে শয়তান নজদের অধিবাসীর বেশে তাদের সভায় যোগদান করে তাদেরকে বিভিন্ন শলা-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিল।[১৮২] কুরায়শদের নেতৃস্থানীয় লোকজন দারুন-নদওয়ার পার্লামেন্ট সর্বসম্মত গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী- সারা দিন ব্যাপি প্রস্তুতি গ্রহণ করল। রাতের আঁধার ঘন হয়ে এলে দুর্বৃত্ত এগার জন নবী করীম (সা.)-এর বাসভবনের চারদিক থেকে ঘেরাও করল। এরা অপেক্ষায় ছিল যে, তিনি শুয়ে পড়লে একযোগে হামলা করবে।[১৮৩] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আপনি স্বরণ করুন, সেই সময়ের কথা যখন কাফিরগণ আপনার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল– যাতে করে তারা আপনাকে বন্দি করতে পারে বা হত্যা করতে পারে অথবা দেশান্তর করতে পারে। তারা তাদের গোপন ষড়যন্ত্র করেছিল। আর আল্লাহ্ তাদের ষড়যন্ত্র গোপনে কৌশল করেছিলেন। আর গোপন কৌশল আটার ব্যাপারে আল্লাহ্ই সর্বোৎকৃষ্ট।"[১৮৪] আল্লাহ্ অন্যত্র আরও বলেন, "তারা কি বলতে চায় যে, তিনি একজন কবি। আমরা তাঁর মৃত্যু আগমনের প্রতীক্ষায় আছি। হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তুমিও বল, প্রতীক্ষায় থাক। আমিও তোমাদের জন্য প্রতীক্ষায় আছি।"[১৮৫]

হযরত আবূ বকর (রা.) ছিলেন তখন ধনী ব্যক্তি। তিনি যখন হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন– তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, لا تجعل لعل الله يجعل لك صاحبا অর্থাৎ তড়িঘড়ি কর না– নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা একজন সাথি জুটিয়ে দেবেন। হযরত আবূ বকর (রা.) প্রত্যাশা করেছিলেন সেই সাথি হবেন

১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

১৮২. আবূল হাসান 'আলী বিন মুহাম্মদ আশ্-শায়বানী, তাহকীক, খায়রী সা'ঈদ, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ৩

১৮৩. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

১৮৪. আল-কুর'আন ০৮:৩০

১৮৫. আল-কুর'আন ৫২:৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)।[১৮৬] তাই তিনি দু'টি সাওয়ারীর উট কিনে তাঁর বাড়িতে বেঁধে রাখেন এবং হিজরতের প্রস্তুতি স্বরূপ এগুলোকে ঘাস-পানি দিতে থাকেন।[১৮৭] রাতের আঁধার হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত 'আলী (রা.) কে বললেন, 'আলী তুমি আমার বিছানায় আমার সবুজ হাজরামী চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়। কেননা তাতে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন শয়ন করতেন তখন এ চাদরটি গায়ে দিয়ে শয়ন করতেন।[১৮৮] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতীক্ষারত যুবকদের সম্মুখ দিয়ে বের হলেন। তিনি হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে তাদের মাথায় ছুঁড়ে মারলেন। ফলে তারা আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সূরা ইয়াসীনের আয়াত পাঠ করে বেরিয়ে গেলেন।[১৮৯] সূরা ইয়াসীনের আয়াত হল, "আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি। অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি। ফলে তারা দেখে না।"[১৯০] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন রওয়ানা হলেন, তখন হযরত 'আলী (রা.) কে মক্কায় অবস্থান করতে এবং তাঁর কাছে লোকদের গচ্ছিত দ্রব্য-সামগ্রী তাদের কাছে বুঝিয়ে দিতে 'আলী (রা.) কে নির্দেশ দিলেন।[১৯১]

মদীনার কুবা পল্লিতে অবস্থান

যখন তাঁদের দু'জনকে নিয়ে 'আবদুল্লাহ্ বিন আরকত বের হন তখন তাঁদেরকে মক্কার নিম্নাঞ্চল দিয়ে সমুদ্র উপকূলে নিয়ে যান। তারপর সমুদ্র উপকূল বেয়ে উসফাহানের নীচ দিয়ে এগিয়ে চলেন- তারপর আমাজের নীচ দিয়ে কুদায়দ অতিক্রম করে খায়বার এবং সানিয়াতুল মুররা হয়ে লাকিসফার পথে তাঁদেরকে নিয়ে যান।[১৯২] মদীনার মুসলমানগণ মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পূর্বেই জেনে ছিল। এজন্য মদীনার বাইরে হাররার নামক স্থানে প্রতিদিন এসে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য অপেক্ষা করতেন। দুপুরের রোদের উত্তাপ বৃদ্ধি পেলে আবার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করতেন। একদিন এমনি করে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সবাই যখন ঘরে ফিরে গেলেন এমন সময় একজন ইয়াহূদী ব্যক্তিগত কাজে টিলার উপর আরোহণ করছিলেন। হঠাৎ সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে দেখে বলে উঠলেন, " يا معشر العرب هذا جدكم اي حظكم الذي تنتظرون." অর্থ হে 'আরব সম্প্রদায় তোমরা শোন, তোমরা যাঁর জন্য অধীর প্রতীক্ষায় ছিলে তিনি আসছেন"- অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বেরিয়ে পড়লেন।[১৯৩]

---

১৮৬. মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৯

১৮৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১

১৮৮. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০

১৮৯. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০ -৭১; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৯

১৯০. সূরা ইয়াসীন, আয়াত নং ৯

১৯১. মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২

১৯২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫

১৯৩. শায়খ মুহাম্মদ আল-খিযরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

নুবুয়তের চর্তুদশ বছরে ৮ রবিউল আউয়াল অর্থাৎ পহেলা হিজরী মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২খ্রি. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুবায় অবতরণ করেন।[১৯৪] মদীনা হতে তিন মাইল দূরে কুবা পল্লিতে আনসারদের কয়েকটি গোত্র বাস করত। তন্মধ্যে 'আমর ইব্ন 'আওফের গোত্র ছিল প্রসিদ্ধ। তাঁদের সরদার ছিলেন কুলসূম বিন হিদাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর বাড়িতে অবস্থান করলেন। একটি দুর্বল বর্ণনায় সা'দ বিন খায়সাম (রা.)-এর গৃহে অবস্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ উভয় রিওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে যেয়ে বলেন যে, প্রকৃত পক্ষে তিনি কুলসূম বিন হিদামের গৃহেই অবস্থান করেছিলেন। তবে তিনি যখন সেখান হতে বাইরে আসতেন– তখন জনগণের সাথে সাক্ষাতের জন্য সা'দ বিন খায়সাম (রা.)-এর গৃহে বসতেন। এজন্য বলা হয়েছে যে, তিনি সা'দ বিন খায়সামের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন।[১৯৫] ইয়াহূদীগণের চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে নগরময় মহোৎসব জাগিয়ে তুললেন। মুসলমানগণ অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একত্রিত হতে লাগলেন। মুসলিমগণ মহানন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আকাশ-বাতাস মুখরিত করে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে নগরী প্রকম্পিত হয়ে গেল।[১৯৬] তখন ওহী অবতীর্ণ হয় যা নিম্নরূপ, তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে পৃষ্ঠপোষকতা কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফিরিস্তাগণও তাঁর সাহায্যকারী।[১৯৭] 'Islam A Mosaic not a Monolith' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, "In 622 having challenged the polytheist practices in Mecca, Mohammad (SM.) fled for safety to yatrib, subsequently named medina, the city of the prophet. This event, called the Hijra, Marks the start of the Islamic era and of the Islamic calender."[১৯৮]

আনসারদের মধ্যে যাঁরা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে দেখেননি, তাঁরা হযরত আবূ বকর (রা.) কে সালাম করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর ঢলে পড়া সূর্যের কিরণ এসে পড়লে হযরত আবূ বকর (রা.) একখানা চাদর দিয়ে তাঁকে ছায়া করে দাঁড়ালেন। এতে সবাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে চিনতে পারলেন।[১৯৯] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অভ্যর্থনার জন্য মদীনায় জনতার ঢল নামল। এটা ছিল মদীনার ঐতিহাসিক দিন। মদীনার মাটি এ ধরনের দৃশ্য অতীতে কখনও আর দেখেনি। ইয়াহূদীরাও প্রতিশ্রুত নবীর আগমন প্রত্যক্ষ করলেন। 'বাইবেলে' উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা দক্ষিণ দিক থেকে তাঁর আগমন ঘটাবেন এবং যিনি পবিত্র তিনি ফারান পর্বত থেকে আগমন করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

---

১৯৪. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০। 'নূর-ল ইয়াকীন' গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, রাসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) ২০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে কুবায় পৌঁছেন। দ্র. শায়খ মুহাম্মদ আল-খিযরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

১৯৫. সীরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৫ম খ-, পৃ. ২৫২

১৯৬. ইব্ন কায়্যিম আল্-জাওযিয়াহ, তাহকীক ওয়াইল আহমদ 'আবদুর রহমান, *যাদুল মা'আদ*, ৩য় খ-, আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ্, মিসর, তা. বি., পৃ. ৯০

১৯৭. আল-কুর'আন ৬৬:০৪

১৯৮. Vartan Gregorian, *Islam: Amosaic, not a monolith*, Surjeet Publications. Delhi, 2005, Re-printed, P.11

১৯৯. মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খ-, ৭৭; সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

কুলসূম বিন হাদামের ঘরে মতান্তরে সা'আদ ইব্ন খায়সামের ঘরে অবস্থান করেন। প্রথম কথা অধিক নির্ভরযোগ্য। হযরত 'আলী (রা.) মক্কায় তিন দিন অবস্থান করে মানুষের আমানতসমূহ বুঝিয়ে দিয়ে মদীনায় আসলেন।[২০০] মাইকেল এইচ. হার্ট বলেন, "The Hijra was the turning point of the prophet's life. In mecca He had a few followers, In Medina, He had Many more."[২০১]

কুবা পল্লিতে মসজিদ নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুবা পল্লিতে ১৪ দিবস অবস্থান করেন।[২০২] 'দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামীয়া' নামক বিশ্বকোষে উল্লেখ রয়েছে; হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে মদীনার কুবা পল্লিতে 'আমর বিন 'আওফের কবীলায় ১৪দিন অবস্থান করেন। তখন সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[২০৩] 'মু'জামুল বুলদান' নামক গ্রন্থে রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কুবা পল্লিতে ৪দিন 'আমর ইব্ন 'আওফের গৃহে অবস্থান করেন। দিনগুলো হল- সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার। অতঃপর সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[২০৪] মুসলিম শরীফে কুবা পল্লিতে বনূ 'আমর ইব্ন 'আওফের গোত্রে ১৪দিন অবস্থানের কথা উল্লেখ রযেছে।[২০৫] মুস্তফা চরিতে বুখারীর বরাত দিয়ে ১৪ দিন অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২০৬] ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুবায় 'আমর বিন 'আওফের গৃহে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি এ চার দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। এরপর জুমু'আর দিন সেখান থেকে বের হন। কেউ কেউ বলেন, এর চেয়ে বেশি দিন তিনি সেখানে অবস্থান করেন।[২০৭] 'রাহমাতুল লিল 'আলামীন' গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কুবায় অবস্থান করেন। এ তিন দিনের মধ্যেই তিনি যে কাজটি সর্বপ্রথম করেন তাহল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদতের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ।[২০৮] এভাবে বিভিন্ন বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কুবায় অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

ইয়াসরিবের জনগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে ইতিহাসের অনুপম অভ্যর্থনায় গ্রহণ করেছিলেন। ১৪ দিন অবস্থানের পর তিনি মদীনায় যাত্রা করেছিলেন। কুবায় এ সময়ের মধ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। আর এটাই ছিল ইসলামের প্রথম মসজিদ যা আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আত্- তওবাতে উল্লেখ

২০০. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১। আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর, আত-তাবারী, তারীখু আত-তাবারী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৮৮; ইবন কায়্যিম জাওযিয়াহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৯০

২০১. Michael H. Hert. op.cit. P.34

২০২. ইব্ন সা'আদ, *আত্-তাবাকাতুল কুবরা*, ১ম খন্ড, বৈরূত: দারুস সাদির, তা. বি., পৃ. ২৩৫

২০৩. দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়া (উর্দূ বিশ্বকোষ), ২০তম খন্ড, লাহোর, দানেশগাহ বাজার, ১৪০৪, পৃ. ৫৯৪

২০৪. শিহাবুদ্দিন আবূ 'আবদুলণ্ডাহ্, ইয়াকূত ইবন 'আবদুলণ্ডাহ্, আল বুগদাদী; *মু'জামুল বুলদান*, বৈরূত: দারুল কিতাবুল 'আরাবী, তা. বি., ৫ম খন্ড, পৃ. ১২৪

২০৫. মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, ১ম খন্ড, ভারত: আশরাফিয়া বুক ডিপো, তা. বি., পৃ. ২০০

২০৬. মাওলানা আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

২০৭. ইসমা'ঈল বিন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৬৯

২০৮. কাযী সুলায়মান মনসূরপুরী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন।[২০৯] আর সে মসজিদটি ছিল 'আমর ইব্ন 'আওফের গোত্রে যা তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছিল।[২১০] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকেই; সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্যস্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, তাঁরা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র লোকদের ভালবাসেন।"[২১১]

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ. جَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا

أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى দ্বারা মসজিদে কুবাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পবিত্রতার প্রশংসার করেছেন।[২১২]

হযরত কুলসূম বিন হিদামের একখণ্ড পতিত জমি ছিল যা খেজুর শুকানোর চত্বর। সেখানেই কুবা মসজিদ নির্মিত হয়।[২১৩] কুলসূম বিন হিদামের খেজুর শুকানোর চত্বরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বহস্তে পাথর এনে কিবলার দিক মুখ করে রাখলেন। তারপর আবূ বকর (রা.) ও হযরত 'উমর (রা.) পাথর এনে রাখলেন। এরপর অন্যান্য সাহাবীগণও পাথর এনে রাখা শুরু করলেন। এভাবে মসজিদের কাজ আরম্ভ হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সকলের সাথে নিজেও বড় বড় পাথর এনে নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ ও দিক নির্দেশনা দিতে লাগলেন।[২১৪] হযরত 'আবদুল্লাহ্ বিন রাওহা (রা.) কবি ছিলেন। তিনিও অন্যান্য সাহাবীগণের সাথে মসজিদ নির্মাণে মজুরের কাজে অংশ নিলেন, তিনি কাজ করার সময় কবিতা পাঠ করতেছিলেন। নিম্নরূপ,

افلح من معاليج المسجدًا * ويقرأ القرآن قائما وقاعدًا

অর্থ সেই সফলকাম যে মসজিদ নির্মাণ করে। দাঁড়িয়ে ও বসে কুর'আন পাঠ করে। আর রাতে সজাগ থাকে।" হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ তাঁর কবিতার সাথে ছন্দ মিলাতেন।[২১৫] 'The foundation of Islam' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "It was the simple structure, Part of which Muhammad helped to put up, and it became the first public place of worship for the new religion."[২১৬]

কুবা পল্লিতে মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ হলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্যান্য মুসলমানগণের সঙ্গে সমানভাবে মজুরের মত কাজ করতে লাগলেন। ভারি ওজনের প্রস্তর উত্তোলনের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শরীর

---

২০৯. Professor Abdul Qaiyum Natiq, *Sirat-E-Mustaqeem*, Delhi:Translated by Muhammad Reza Karmi, Alamin Publications, 1992, P.207

২১০. আহমদ বিন 'আলী ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, ৭ম খণ্ড, মিসর: মাকতাবাতুস-সাফা, কায়রো, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ২৯৭

২১১. আল-কুর'আন ০৯:১০৮

২১২. জালালুদ্দীন 'আবদুর রহমান সুয়ূতী, *আল ইতকান*, ২য় খণ্ড, কায়রো, মিসর, প্রকাশকের নাম বিহীন, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫১ খ্রি., পৃ. ১৯৫

২১৩. 'আলণ্ঢামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১

২১৪. *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩; শিহাবুদ্দীন আবূ 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইয়াকূত ইব্ন 'আবদুলণ্ঢাহ্, আল-বুগদাদী, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৪; শায়খ তোয়া-হাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

২১৫. 'আলণ্ঢামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১

২১৬. Benjamin Walker, op.cit., P.116

Dhaka University Institutional Repository

নুয়ে পড়ছিল। কোন ভক্তের দৃষ্টিতে পড়লে তিনি দৌড়ে এসে বললেন, "হযরত আপনি ক্ষান্ত হোন। আমাদের পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। আমরাই তা বহন করে নিয়ে যাব। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহাস্য বদনে তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ করতেন। কিন্তু সাথে সাথে আরেকখানা পাথর মাথায় নিয়ে মসজিদের ভিত্তিমূলে উপস্থিত থাকতেন।[২১৭] মাওলানা আকরম খাঁ বলেন, "এইভাবে ইহ-পরকালের প্রভূ নিজের মাথায় পাথর বহিয়া কোবা মসজিদের না, না–ইসলামের অতুলনীয় সাম্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"[২১৮] তিনি আরও বলেন, "জগতের কোন দর্শনে, কোন বিজ্ঞানে তুমি এ পুণ্য দেখতে পাইবে না– ইসলামের তকদীর নাস্তিকের জড়বাদে নহে। কর্ম বিমুখ কাপুরুষের অদৃষ্টবাদও নহে, উহা বিশ্বাস ও কর্মের এবং নির্ভর ও সাধনার অতি সরল, অতি স্বাভাবিক এবং অতি দার্শনিক সমষ্টি। মুসলিম জাতীয় জীবনের একমাত্র উন্মেষ।"[২১৯] ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী বলেন, "এ মসজিদের স্থাপত্যগত বিবরণ দুস্প্রাপ্য। তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এ কথা বলা যেতে পারে, প্রথম যুগের নির্মিত আরবদের ঘর-বাড়ির ন্যায় এটির নির্মাণ কাদা মাটি, বেলেমাটি, খেজুরপত্র ও খেজুরগাছের কাণ্ড ব্যবহৃত হয়েছিল। এর পরিমাপ সঠিকভাবে নির্ণয় করা না গেলেও অনুমান করা যায় এটি একটি বর্গাকৃতির মসজিদ।"[২২০] 'মুখতাসারু সীরাতির রাসূল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, فاقام في بنى عمر بن عوف اربع عشرة ليلة واسس مسجد قباء واول مسجد اسس بعد النبوة.[২২১] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বনু 'আমর বিন 'আওফের এখানে ১৪ রজনী আবস্থান করেন এবং কুবাতে মসজিদ নির্মাণ করেন। এটাই ছিল নবুয়তের পর প্রথম মসজিদ। Dogan Kuban এর মতে, মসজিদটি ছিল আয়তাকার বিশিষ্ট ৫৪×৩০ কিউবিক অথবা ৮৫×১০০ ফুট। মাটির তৈরি এবং খেজুর গাছের ছাউনি ছিল এতে।[২২২]

সর্ব প্রথম হযরত 'উসমান (রা.) মসজিদটির সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। বিভিন্ন শাসকদের আমলে মসজিদটি সংস্কার ও সম্প্রসারিত করা হয়। সর্বশেষ সম্প্রসারণ করেন সৌদি বাদশাহ ফাহাদ বিন 'আবদুল 'আযীয। বর্তমানে মসজিদের আয়তন হচ্ছে তের হাজার পাঁচশত বর্গমিটার। এতে মহিলাদেরও সালাত আদায়ের সু-ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে আঙ্গিনাসহ মসজিদে বিশ হাজার লোক নামায পড়তে পারে। মসজিদটির সাথেই রয়েছে একটি পাঠাগার।[২২৩]

মসজিদুন নববী

---

২১৭. 'আলণ্ঢামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১

২১৮. মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

২১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

২২০. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২২১. মুহাম্মদ বিন 'আবদুল ওয়াহাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

২২২. Dogan Kuban, *The central Arab lands*, ed. Martin Frishman and Hasan uddin Khan, *The Mosque History, Architectural development and regional diversity,* London:Thomas and Hudson, Ltd. 1994, P.78

২২৩. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদুন নববী মুসলমানদের দ্বিতীয় সম্মানিত স্থান। আর মদীনা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হিজরত ও আশ্রয়ের অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মক্কার পরে মদীনায় হিজরতের (৬২২খ্রি.) পর মদীনায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তখন মদীনা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দা'ওয়াহ্ কেন্দ্রে পরিণত হয়। কেননা মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে যে মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করে, ঠিক সেই মুহূর্তে মদীনাবাসী তাঁকে স্বাগত জানায়। তাই মক্কার চেয়েও মদীনা আরও শক্তিশালী ও সুদৃঢ় দা'ওয়াহ কেন্দ্রের রূপ ধারণ করে। শুধু তাই নহে সাথে সাথে তা ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহণ করে এবং আল্লাহ্র জমিনে সর্বপ্রথম ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, বাণিজ্য যুদ্ধ ও সামাজিক আইন-কানূন প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২৪] মদীনা একাধারে দা'ওয়াহ, জিহাদ এবং ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা-কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, পরবর্তীতে খুলাফা রাশিদীনসহ (রা.) বিভিন্ন মুসলিম খলীফাগণের আমলেও সেখানে জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। সকল যুগেই জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ মদীনায় গিয়ে নিজেদের লেখা পড়ার পূর্ণতা সাধন করেন। অতীতের সকল মুহাদ্দিস, ফিকহ্বিদ ও 'উলামা কিরাম প্রায় সকলেই মদীনায় গিয়ে নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করেন। মসজিদুন নববী হচ্ছে মদীনার প্রাণশক্তি।[২২৫]

মসজিদুন নববী ছিল অত্যন্ত আড়ম্বরহীন। এ মসজিদে ছিল না কোন কারুকার্য, গগণচুম্বী কোন মিনারও ছিলনা এতে। এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল ঈমানদারদের পক্ষ হতে।[২২৬] পৃথিবীর এ শ্রেষ্ঠতম মসজিদ নির্মাণের জন্য দেশ-দেশান্তর হতে কোন বড় মিস্ত্রিও আনয়ন করা হয়নি। জন-মজুরের অপেক্ষা করা হয়নি। চারুশিল্পে শোভিত বিশাল মিহরাব, কারুকার্য খচিত সমুচ্চ প্রাচীর, দিগন্তচুম্বী মিনার ও গগনচুম্বী গম্বুজ-রাজির দ্বারা এ মসজিদের শোভা বর্ধনের চেষ্টাও করা হয়নি। নব নির্মিত এ মহামসজিদের মিহরাব ছিল না। শ্বেত-প্রস্তরের মিম্বারও ছিল না, গম্বুজও ছিল না। কাঁচা ইটের প্রাচীর, খেজুরের আড়া ও খেজুর পাতার ছাউনি ইসলামের সেই বিরাট বিশাল ও মহাশক্তি কেন্দ্র এ সকল উপকরণ দিয়েই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরের সম্পূর্ণ অভাব থাকলেও এ মহিমাময় মুস্তফার শিক্ষা মহাত্ম্য ও চরিত্র প্রভাবে এ মসজিদের গুরুত্ব ও মহিমা এতদূর বর্ধিত হয়ে গিয়েছিল যে, রোম ও পারস্যাদি দেশের বিশ্বজয়ী বীর সেনাপতি ও রাজদূতগণও সেখানে প্রবেশ করতে বুক কেঁপে উঠত।[২২৭] এ মসজিদটিতে তিনি সাধারণভাবে দাঁড়িয়ে জুমু'আর খুৎবা দিতেন। মসজিদের পার্শ্বে একটি ছোট কুটিরে তাঁর স্ত্রীগণকে নিয়ে তিনি অতি সাধারণভাবে বসবাস করতেন। এ মসজিদটিই ছিল মুসলিম জাতির সভা-সমিতির কেন্দ্র।[২২৮] মদীনার মসজিদ ঘরটি ছিল তাওহীদ প্রচারের মূল কেন্দ্র। এ মসজিদটি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে সময় লেগেছিল হিজরতের পর সাত মাস। নির্মাণ কার্য শেষ হয় এপ্রিল মাসে ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে।[২২৯] Karan

২২৪. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *মদীনা শরীফের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২২৬. 'আলণ্ঢামা 'আবদুস সালাম রাহমানী, *তুযায়্যেনে মাসাজিদ কি শর'ঈ হায়সিয়ত*, ভারত: আদ-দারুল ইলমিয়াহ, ১৯৯০ খ্রি., পৃ.১০

২২৭. মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫

২২৮. Karan Armstrang, *Muhammad Prophet for our time*, London: Harper Press, 2006, P-115

২২৯. Ibid, P-116

Dhaka University Institutional Repository

Armstrong বলেন, æThe first muslims building was not imposing but it became the model of all future mosques,"[২৩০]

উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রথম জুমু'আ

হিজরী প্রথম সনের ১২ রবিউল আউয়াল জুমু'আর দিন ছিল। নবী করীম (সা.) কুবা হতে সওয়ার হয়ে বনূ সালিমের ঘরগুলো পর্যন্ত পৌঁছে যান। এমন সময় জুমু'আর সময় হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একশ জন লোকের সাথে জুমু'আর সালাত আদায় করেন। এটিই ছিল ইসলামের প্রথম জুমু'আ।[২৩১] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্র নির্দেশেই রওয়ানা হয়েছিলেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি বনু নাজ্জারকে খবর পাঠিয়ে ছিলেন। ফলে তাঁরাও তালোয়ার সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়। তিনি তাঁদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। তিনি বনূ সালিম ইব্ন আওফের জনপদে জুমু'আর নামায আদায় করেছিলেন। এখনও সেখানে মসজিদ রয়েছে।[২৩২] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে খুৎবা প্রদান করেছিলেন তা ছিল অলঙ্কার শাস্ত্রে পরিপূর্ণ। রুগ্ণ আত্মার খোরাক। তাঁর প্রতিটি বাক্য ছিল আকর্ষণীয়।[২৩৩] বনূ সালিম মহল্লায় আদায়কৃত প্রথম জুমু'আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খুৎবা উহার সারগর্ভ, বিষয় বস্তু, সমকালীন পরিবেশ-পরিচিতি এবং দীন ইসলামের মূল লক্ষ্য মানুষকে আল্লাহ্মুখী ও আখিরাতমুখী করে দেয়ার ভাবগম্ভীরভাষা ও ভাষ্যের কারণে ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মুসলিম জীবনধারার অমূল্য-সম্পদ। নিয়মানুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দু'টি খুৎবা প্রদান করেছিলেন।[২৩৪] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ খুৎবাটিও ছিল ইসলামের প্রথম খুৎবা।[২৩৫] Martin Lings বলেন, æThis was the first Friday prayer that he prayed in the country that from now on was to be his name"[২৩৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মদীনায় আগমন

জুমু'আর সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনার দিকে চললেন, তাঁদের সাথিগণ উটের রশ্মি ধরে চললেন। মদীনায় পৌঁছার পর সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে নিজ নিজ বাড়িতে নেয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, সওয়ারী ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সে চলছে। যেখানে গিয়ে সে থেমে পড়বে–সেখানেই আল্লাহ্র অনুমোদন রয়েছে। বস্তুত আজ যেখানে মসজিদুন নববী রয়েছে সেখানেই উটটি থেমে যায়। এ ভূখণ্ড ছিল বনূ নাজ্জারের সাহল ও সুহায়ল নামক দু'টি বালকের।[২৩৭] মদীনার অধিবাসিগণ এ দিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর আশাতীত সৌভাগ্যকে প্রত্যক্ষ করে

---

২৩০. Ibid, P-115

২৩১. 'আলণ্ঢামা কাযী সুলায়মান মনসূরপুরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬

২৩২. 'আলণ্ঢামা সফিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

২৩৩. মাওলানা ইদরীস কান্দুলভী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১

২৩৪. সিরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮১

২৩৫. 'আলণ্ঢামা শিবলী, নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৬২

২৩৬. Martin Lings, *Muhammad his life based on the earliest sources*, New Delhi: Millat book certres, No Dated. P-123

২৩৭. ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দে উদ্বেলিত ও মতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। বস্তুত মদীনার ইতিহাসে এ আনন্দ ও সৌভাগ্যের দিন আর কখনও দেখেনি।[২৩৮] Haykal বলেন, "No one among them apparently grasped the new direction which history was taking at that auspicious Moment, nor the great destiny at work to make their city immortal."[২৩৯]

মদীনায় পৌঁছলে মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, তাঁকে সম্ভাষণের জন্য আনন্দে মতোয়ারা হয়ে উঠল। সশস্ত্র মুসলমানগণ তাঁর ডানে-বামে, অগ্রে-পশ্চাতে গমন করছিলেন।[২৪০] সকলের মনেই ছিল নব কৌতুহল, মুখে ছিল আনন্দ-উচ্ছ্বাস, চোখে ছিল বেহেস্তী রঙিন স্বপ্ন।[২৪১] নগরীর ছাদ ও বারান্দাগুলো আগ্রহী ও উৎসুক নর-নারী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। যে সকল লোক পথে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনার সুযোগ পাননি তাঁরা ও স্ত্রীলোকেরা গৃহের ছাদে উঠে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অভ্যর্থনা জানালেন। অল্প বয়স্ক বালক বালিকারা মদীনার অলিতে-গলিতে 'ইয়া মুহাম্মদ', ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলে চিৎকার করছিল।[২৪২] তাঁরা সমস্বরে বলতে লাগলো, "جاء نبى الله، جاء نبى الله"[২৪৩] অর্থাৎ আল্লাহর নবী এসেছে, আল্লাহ্র নবী এসেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ছিলেন সওয়ারির উপর। আর আবূ বকর (রা.) ছিলেন তাঁর পেছনে। বনূ নাজ্জারের সন্তানগণ ছিলেন তাঁর আশে পাশে।[২৪৪] যখন সকলেই নিজ নিজ গৃহে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে অবস্থানের আবেদন-নিবেদন জানান, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "কার ঘর সবচেয়ে নিকটবর্তী?" হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বললেন, আমার ঘর, 'আর এ আমার দরজা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "আমার মধ্যাহ্ন বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। আবূ আইয়ূব আনসারী বললেন, আপনারা উভয়েই আসুন। আল্লাহ্ আপনাদের বরকত দেবেন।"[২৪৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেদিন মদীনায় পৌঁছেন সেদিন ছিল ঐতিহাসিক দিন। চারদিকেই আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন শোনা যাচ্ছিল।[২৪৬] তখন আনসার শিশুরা আনন্দ উদ্বেলিত চিত্তে গান গেয়েছিল,

"طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع

২৩৮. আবূল বারাকাত 'আবদুর রউফ দানাপুরী, *আসাহুস সিয়ার* (উর্দূ), ভারত: কুতুবখানা না'ঈমিয়াহ্, তা. বি., পৃ.৬৫

২৩৯. Haykal, *The Life of Muhammad*, Delhi:New crescent Publisuing Co., 2006, reprinted, P.171

২৪০. মাওলানা ইদরীস কান্দুলুভী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫

২৪১. গোলাম মুস্তফা, *বিশ্বনবী*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, জিন্দাবাহার, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ১৪৪

২৪২. মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯

২৪৩. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬

২৪৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬০; আবূল হাসান 'আলী বিন মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত্-তাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮

২৪৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬, 'আলণ্ঢামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

২৪৬. 'আলণ্ঢামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

ايها المبعوث فينا * ما جئت بالامر المطاع"

"সিনইয়াতিল ওদাই-বা দক্ষিণের সেই-পাহাড় থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কাছে আগমন করলেন। তাঁর শান-শওকতের কারণে আকাশ ঢেকে গেছে এবং পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য যে, একজন আহ্বানকারী আমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করছে। হে আমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আপনি এসেছেন আদেশ নিয়ে যার কর্তব্য মান্য করা হবে।"[২৪৭] যাঁদের মেয়েরা গীত পরিবেশন করেছেন– তাঁরা ঐ সমস্ত আনসার যাঁরা নবুয়তের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সনে মক্কায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। কিংবা তাঁরা মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা.) অথবা ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.)-এর তা'লীমের মাধ্যমে মদীনায় মুসলমান হলেন।[২৪৮] মহামতি আনসারগণ খুব বড় ধনী বা প্রাচুর্যের অধিকারী এবং জায়গিরের মালিক ছিলেন না। কিন্তু মনের দিক দিয়ে ছিলেন খুব ধনী। ইসলামের জন্য এমন উৎসর্গ প্রাণ ও মুসলিম ভাইদের জন্য এরূপ উৎসর্গকারী ছিলেন যে, যখন কোন মুহাজির নাঙা তলোয়ার ও কচকচকারী কামান হতে জীবন বাঁচিয়ে ক্ষুদার্থ ও তৃষ্ণার্থ অবস্থায় মদীনায় গমন করতেন, তখন প্রত্যেক আনসার চাইতেন যে, ঐ মুহাজির যেন তাঁর কাছেই অবস্থান করে। শেষ পর্যন্ত লটারি করা হত এবং যাঁর নাম লটারিতে উঠত তিনি ঐ মুহাজির ভাইকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতেন। ঘর, আসবাব পত্র, টাকা-পয়সা, জমি-জমা, গবাদি-পশু মোটকথা যা কিছু তাঁর অধিকারে থাকত তাঁর অর্ধাংশ ঐ দিন তাঁকে বন্টন করে দিতেন। তার পর রাত-দিন তাঁর খেদমতের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। নিজের সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। আল্লাহ্ তা'আলার দীনের এক ভাইকে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিলেন।[২৪৯] শুধু তাই নয় 'আবদুল মুত্তালিব গোত্রের মাতুল বংশ নাজ্জার গোত্রের বালিকাগণ দফ বাজিয়ে গান গেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে এই বলে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিল যে,

نحن جوار من بنى نجار * يا حيذا محمد من جار.[২৫০]

আমরা বনূ নাজ্জার বংশের কন্যা আমাদের কত সৌভাগ্য মুহাম্মদ (সা.) আমাদের প্রতিবেশী হচ্ছেন। মদীনার ছেলে-মেয়েরা আনন্দের আতিশয্যে রাস্তার মধ্যে লাফিয়ে উঠেছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই রাস্তায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে ছিল।[২৫১]

---

২৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২; 'আলণ্ঢামা কাযী সুলায়মান মনসুরপুরী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৪১; মাওলানা ইদরীস কান্দুলভী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৪০৬; 'আলণ্ঢামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৬২; আশ-শায়খ মুহাম্মদ খিযরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪; ইসমা'ঈল বিন কাসীর, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ. ১৬০

২৪৮. 'আলণ্ঢামা কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মনসূরপুরী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৪১

২৪৯. প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ.১৪২

২৫০. 'আলণ্ঢামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৪১; মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬; ইসমা'ঈল বিন কাসীর, *আল-*
বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ.১৬২; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ৭ম খ, পৃ. ২১৫; মাওলানা ইদরীস কান্দুলুভী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদুন নববী নির্মাণ

মসজিদুন নববী নির্মাণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেখানেই নামাযের সময় হত সেখানেই আদায় করে নিতেন। তিনি বকরি রাখার স্থানেও সালাত আদায় করেছেন। এরপর তিনি মসজিদুন নববী তৈরির নির্দেশ প্রদান করেন। বনূ নাজ্জারের নিকট পয়গাম প্রেরণ করলে তাঁরা সেখানে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "হে বনূ নাজ্জার তোমরা আমাকে এ বাগানের মূল্য নির্ণয় করে দাও। তাঁরা বললেন না। আল্লাহর কসম, আমরা আল্লাহ্র নিকট ছাড়া কারও কাছ থেকে এ বাগানের মূল্য গ্রহণ করব না। সে স্থানগুলোতে ছিল মুশরিকদের কবর। সেখানে ছিল ধ্বংসাবশেষ ও খেজুর বাগান। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশে কবরগুলো নিশ্চিহ্ন করা হল। ধ্বংসাবশেষকে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হল। খেজুর বৃক্ষগুলোকে কেটে ফেলা হল। খেজুর বৃক্ষগুলোকে সারিবদ্ধভাবে কিবলার দিক করে রাখা হল।[২৫২] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ দেন। মসজিদ ও তাঁর বাসস্থান নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। এ নির্মাণ কাজে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে অংশ গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদিগকে সে কাজে অংশ গ্রহণের উৎসাহ প্রদান করেন। ফলে আনসার ও মুহাজির সকলেই নির্মাণ কাজে যোগদান করেন।[২৫৩]

মসজিদ নির্মাণ কাজে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ (সা.) ইট, পাথর বহন করে আনতেন।[২৫৪] তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে এক লোক বলে উঠল-

لئن تعدنا والنبى يعمل * لذالك منا العمل المضلل

"যদি আমরা বসে থাকি, আর নবী করীম (সা.) কাজ করেন, তাহলে আমরা পথ ভ্রষ্টতার কাজ করার জন্য দায়ী হব।"[২৫৫]

Maulana Muhammad Ali যর্থাথই বলেন, "The first thing done was the construction of a mosque, the prophet and his companion to working at it with their own hands"[২৫৬] ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "No emperor with his tiaras was obeyed as this man in a cloak of his own clouting. He had the gift of influencing men, and he had the nobility only to influence them for good."[২৫৭] অর্থাৎ কোন মুকুটধারী সম্রাটই এই ছিন্নবস্ত্র আলখেল্লা পরিহিত মানুষটির মত এত বেশি আনুগত্য পায়নি।

---

২৫১. Abdul Latif Gauba, *The Prophet of the desert,* New Delhi: Adam Publishers and distributors, 1981, P.85

২৫২. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬০

২৫৩. মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮

২৫৪. 'আলণ্ঢামা কাযী সুলায়মান মনসূরপুরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০

২৫৫. মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ ৭৯; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০০; 'আলণ্ঢামা সুলায়মান মনসুরপুরী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; ইব্ন কায়্যিম জাওযিয়াহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২

২৫৬. Maulana Muhammad Ali, *Mohammad the Prophet*, Pakistan:Ahmadiyya Anjuman, 1972, 4rth ed.,P.101

২৫৭. Ameer Ali, op.cit., P.52

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে প্রভাবিত করার মত যথেষ্ট গুণ ছিল তাঁর। একমাত্র কল্যাণের পথেই প্রভাবিত করার মহত্ব ছিল তাঁর।

মসজিদুন নববী যখন নির্মাণ করেন তখন মুসলমানগণ সমবেতভাবে কবিতা আবৃতি করেন যে,

لا عيش الا عيش الاخرة + الهم ارحم الانصار والمهاجرة

অর্থাৎ আখিরাতের সুখই প্রকৃত সুখ, হে আল্লাহ! রহম কর তুমি আনসার ও মুহাজিরগণকে।[২৫৮]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও বললেন,

اللهم لا خير الا خير الآخرة + فاغفر الانصار والمهاجرة

কল্যাণ যত সবই আখিরাতের, হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা কর আনসার ও মুহাজিরগণকে।[২৫৯] মাথায় করে পাথর বহনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একথাও বলেন,

هذا الحمال لا حمال خيبر + هذا أبر ربنا واطهر

এ বোঝা খয়বরের বোঝার মত নহে। হে আমাদের রব, এটা অত্যন্ত পুত-পবিত্র।[২৬০]

খোদা বকশ বলেন, "He soon settled the rules of worship, and built a mosque in which was performed a short prayer five timses a day."[২৬১] অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) 'ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি নির্ধারণ করে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু করেন তখন সাহাবীগণ তাঁকে সহযোগিতা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাঁদের সাথে ইট পাথর বহন করছিলেন, তাঁকে তাঁর চেহারা মুবারক ধূলায় মলিন হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বললেন, ابنه عريشا كعريش موسى তোমরা এটাকে মূসা (আ.)-এর ছাপরার মত করে বানাও।[২৬২]

মসজিদুন নববীর দরজার দু'টি বাহু ছিল পাথরের। আর দেয়ালসমূহ কাঁচা ইট এবং কাদা মাটি দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। ছাদের উপর খেজুর শাখা এবং পাতা বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। মসজিদে তিনটি দরজা

---

২৫৮. ইব্ন কায়্যিম জাওযিয়াহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ. ৯২; মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ৭৯; ইব্ন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ. ১৭৫

২৫৯. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৬১; 'আলণ্ঢামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৬৪; সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪; শায়খ মুহাম্মদ খিযরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬; কোন কোন গ্রন্থে فاغفر এর পরিবর্তে فارحم শব্দটি উলেণ্ঢখ রয়েছে

২৬০. প্রাগুক্ত, ১ ম খ, পৃ. ৫৫৫; ইব্ন কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিয়াহা*, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ. ১৭৪; ইব্ন কায়্যিম জাওযিয়াহ, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ. ৯২; সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

২৬১. Khuda Baksh, *The History of Islamic Peoples*, Isaratt-I-Adabiyat,-I-, Delhi, 1983 reprinted, P.9

২৬২. ইব্ন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

লাগানো হল। কেবলার সামনের দরজা থেকে পেছনের দরজা পর্যন্ত একশত হাত দৈর্ঘ্য ছিল। প্রস্থ ছিল এর চাইতে কম। বুনিয়াদ ছিল প্রায় তিন হাত গভীর।[২৬৩] এর খুঁটিগুলো ছিল খেজুর কাঠের। হযরত আবূ বকর (রা.) কোন সংযোজন করেননি। হযরত 'উমর (রা.) এতে সংযোজন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগের ইট ও খেজুর কাঠের ভিতের উপর সংযোজন করেন। আর এতে তিনি কাঠের খুঁটি ব্যবহার করেন। হযরত 'উসমান (রা.)-এতে পরিবর্তন করে অনেক সংযোজন করেন। তিনি নকশা করা পাথর দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করে এতে চুনকাম করান এবং ছাদ নির্মাণ করান সেগুন কাঠ দিয়ে।[২৬৪]

মসজিদুন নববী নির্মাণকালে সকলেই যখন একটি ইট বহন করছিলেন কিন্তু তখন 'আম্মার (রা.) ইব্ন ইয়াসার দু'টি ইট বহন করেছিলেন। তখন নবী কারীম (সা.)- তাঁর শরীর থেকে ধুলা-বালি ঝেড়ে দিয়ে বললেন, হায়! একটি বিদ্রোহী দল 'আম্মার (রা.) কে হত্যা করবে। অথচ সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করতে থাকবে। আর তারা তাঁকে ডাকতে থাকবে দোযখের দিকে। 'আম্মার (রা.) বলতেন হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে ফেত্না থেকে রক্ষা কর।[২৬৫] ইব্ন হিশাম বলেন, "ইসলামে সর্বপ্রথম মসজিদ যিনি নির্মাণ করেন তিনি হলেন 'আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা.)।[২৬৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মসজিদুন নববী নির্মাণ করেন তখন এর কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে। যখন কিবলা পরিবর্তন করে কা'বার দিকে করা হল তখন (شمال) উত্তরের দিকে এক নতুন দরজা তৈরি করা হল। এর ছাদ এমনি ছিল যে, বৃষ্টি হলে পানি পড়ত মাটিতে। মেঝ কর্দমাক্ত হয়ে যেত। মুমিনগণ এর মধ্যেই সিজদা করতেন।[২৬৭] মসজিদুন নববীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে এর অদূরে কায়েকটি কাঁচা ঘর নির্মাণ করা হল। এসব ঘরের দেয়ালও খেজুর পাতার তৈরি ছিল। এসব ঘর ছিল প্রিয় নবী (সা.)-এর সহধর্মিনীগণের বাসগৃহ। এসব ঘর তৈরি করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর ঘর থেকে এখানে এসে উঠলেন।[২৬৮]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) আসেন এবং একটি পাথর বসান। এরপর হযরত 'উমর (রা.) আসেন এবং তিনিও একটি পাথর বসান। এরপর হযরত 'উসমান (রা.) আসেন তিনিও একটি ইট বসান। তারপর তিনি বললেন আমার পর এভাবেই খিদমত চলবে।[২৬৯]

মসজিদুন নববীর মিম্বার

---

২৬৩. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

২৬৪. ইব্ন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ. ১৭৪; মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৬৪

২৬৫. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৬৪

২৬৬. মালিক বিন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ৭৯

২৬৭. 'আলণ্ঢামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

২৬৮. সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

২৬৯. ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৩য় খ, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মসজিদুন নববী নির্মাণ করেন তখন এতে খুৎবা দেয়ার জন্য কোন মিম্বার ছিল না। তিনি একটি খুঁটির উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করতেন। পরে মিম্বার তৈরি হলে তিনি সে দিকে অগ্রসর হলে খুঁটিটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত অঝোর ক্রন্দন করা শুরু করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) খুঁটিটির নিকটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে শান্তনা দেন। তখন খুঁটিটি চুপ হয়ে যায়।[২৭০]

একবার সাহল বিন সা'আদের নিকট কিছু সংখ্যক লোক আগমন করে। তাঁরা তখন মিম্বারটি কোন কাঠের তৈরি তা নিয়ে বির্তক করছিল। তখন তাঁরা এ সম্পর্কে সাহল বিন সা'আদের নিকট প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ মসজিদুন নববীর মিম্বারটি কোন কাঠের তৈরি তা আমি অবশ্যই জানি। প্রথম যখন মিম্বারটি সংস্থাপিত হয় এবং প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মিম্বারটিতে বসেন তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আনসারদের এক মহিলার নিকট লোক প্রেরণ করে বলেছিলেন, তোমার কাঠ মিস্ত্রি গোলামকে আমার জন্য কিছু কাঠ দিয়ে এমন জিনিষ তৈরি করার নির্দেশ দাও– যার উপর আমি লোকদের সাথে কথা বলার সময় বসতে পারি। অতঃপর সেই মহিলা তাকে আদেশ করলেন, মিম্বার তৈরি করে দিতে। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট তা পাঠিয়ে দেন। আর তখন তা মসজিদুন নববীতে সংস্থাপিত হয়।[২৭১] মসজিদুন নববীর মিম্বারে ৩টি ধাপ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মিম্বারের সর্বোচ্চ ধাপে আরোহণ করতেন এবং মাঝের ধাপে পা রাখতেন। পরে আবূ বকর (রা.) যখন খলীফা হলেন, তিনি মাঝের ধাপে বসতেন এবং শেষের ধাপে পা রাখতেন। আবূ 'উমর (রা.) খলীফা হওয়ার পর তিনি শেষ ধাপে বসতেন এবং মাটিতে পা রাখতেন। হযরত 'উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে তাই করতেন-এরপর তিনি সর্বোচ্চ ধাপে বসতেন।[২৭২] হযরত মু'আবিয়া খলীফা হলে তিনি মিম্বারটি সিরিয়া নিয়ে যেতে আদেশ দেন মদীনার শাসক মারওয়ানকে। তখন মদীনায় অসন্তোষ দেখা দিলে তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। আর তিন ধাপ বিশিষ্ট মিম্বারকে বাড়িয়ে আরও ছয় ধাপ বৃদ্ধি করেন। ফলে এটি আগের তিন ধাপসহ নয় ধাপ বিশিষ্ট মিম্বার হল। আর এ কাজটি তিনি করেছিলেন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কারণে।[২৭৩] আব্বাসীয় খলীফা আল-মাহদী ইব্ন মনসূর ২৬১ হি. সনে যখন হজ্জ করতে আসেন, তখন তিনি মিম্বারটি পূর্বাবস্থায় রাখতে মনস্থ করেন। কিন্তু ইমাম মালিক (র.) বিশৃঙ্খলা হতে পারে ভেবে খলীফাকে উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। খলীফা ইমাম মালিক (র.)-এর পরামর্শে এ কাজ হতে বিরত থাকেন।[২৭৪] আব্বাসীয় খলীফাগণের অনেকেই এ মিম্বার নতুন করে তৈরি করেন এবং বরকতের জন্য নবী করীম (সা.)-এর মিম্বরের বিদ্যমান অংশের সঙ্গে তা সংযোজিত করেন।[২৭৫]

---

২৭০. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭

২৭১. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫

২৭২. সীরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২

২৭৩. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯১

২৭৪. সীরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২

২৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

১২৫৬ খ্রি. মসজিদুন নববীতে আগুন লাগে। তখন মিম্বারটি ভস্মীভুত হয়ে যায়। ইয়ামনের বাদশাহ্ মুযাফফর ১২৫৮ খ্রি. নতুন করে মিম্বারটি নির্মাণ করে মদীনাতে প্রেরণ করেন। এটি নবী কারীম (সা.)-এর মিম্বারের স্থানে স্থাপন করা হয়। দশ বছর পর ১২৬৮ খ্রি. পর্যন্ত এ মিম্বারটি বহাল থাকে।[২৭৬] ১২৬৮ খ্রি. বাদশাহ্ রুকনুদ্দীন নতুন একটি মিম্বার প্রেরণ করেন। এ মিম্বারে ১৩২ বছর পর্যন্ত খুৎবা চলতে থাকে। অতঃপর এ মিম্বারের কাষ্ঠ পুরাতন হয়ে নষ্ট হয়ে গেলে ১২৯৫ খ্রি. সনে মিসরের বাদশাহ্ জাবির বরকুনে নতুন মিম্বার তৈরি করে মসজিদুন নববীতে প্রেরণ করেন–যা ৩৩ বছর পর্যন্ত মসজিদুন নববীতে ছিল। ১৪১৮ খ্রি. বাদশাহ্ মুয়াইয়েদ নতুন মিম্বার তৈরি করে পাঠান। ৮৮৬ হিজরীর রমযান মাসে মসজিদুন নববীতে আবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে–এতে পুরা মিম্বারটি ভস্মীভূত হয়। তখন পাকা মিম্বার তৈরি করা হয়। ১৪৮৩ খ্রি. বাদশাহ্ আশরাফ কায়েতবারী এক নতুন মিম্বার মসজিদুন নববীতে সংস্থাপন করেন। ১৫৮৯ খ্রি. 'উসমানী বাদশাহ্ সুলতান মুরাদ খান অতীব সুন্দর এক মিম্বার তৈরি করে পাঠান।[২৭৭] মুরাদখানের নির্মিত মিম্বার ১৯৮৭ খ্রি. পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তারপরও তা নষ্ট হয়নি। অত্যন্ত মজবুত ও অটুটভাবে তা বিদ্যমান আছে।[২৭৮]

মসজিদুন নববীর সংস্কার

খুলাফা রাশিদীন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.)-এর পর মারওয়ান ইবনুল হাকাম স্বীয় সালতানাতের আমলে (৬৮৩-৭০৫ খ্রি.) একটি সংক্ষিপ্ত মিহরাব তৈরি করেন মসজিদুন নববীতে। যেটাকে তিনি মসজিদের অন্তর্ভূক্ত করেন। ওয়ালীদ ইবনু 'আবদিল মালিক (৪০৫-৭১৫ খ্রি.) এবং 'উমর বিন 'আবদুল 'আযীয (শাসনকাল-৯৯-১০১ হি.) নিজ নিজ খিলাফতের আমলে নতুনভাবে মসজিদুন নববীকে নির্মাণ করেন। সিরিয়া, মিসর, রোম এবং কিবতের আশি জন ইঞ্জিনিয়ার নির্বাচন করে নির্মাণ কাজের তদারকির জন্য পাঠিয়ে দেন। মাহদী আব্বাসী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) স্বীয় শাসনামলে কিছুটা বৃদ্ধি করেন। পিছন দিক হতে আরও একশ গজ সীমানা বৃদ্ধি করেন। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর মসজিদের দৈর্ঘ্য ৩০০ গজ এবং প্রস্থ ২০০ গজ হয়েছিল। এ নির্মার্ণ কাজ ১৭২ হি. সনে সমাপ্ত হয়। খলীফা মুতাওয়াক্কিল ২৪৭ হিজরীতে এ ইমারত মেরামত করেন।[২৭৯] জাফর বিন সুলায়মান মক্কা ও মদীনার মসজিদ ১৬২ হি. সনে সম্প্রসারণ করেন। খলীফা মাহদী ১৬০ হি. সনে হজ্জের পূর্বে মদীনায় আগমন করেন। তিনি ইতোপূর্বে নির্মিত মাকসূরা ভেঙে মসজিদের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। বলা হয় খলীফা মামূনও (শাসনকাল ১৯৮-২১৮হি.) মসজিদুন নববীর নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন।[২৮০]

খলীফা আল-মামূন (শাসনকাল ১৯৮-২১৮ হি.)-এর পর কিছু কিছু সম্প্রসারণ ছাড়া আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হয়নি। ৭৫৪ হি. সনের রমযান মাসের ২৩ তারিখে রাতের প্রথম প্রহরে মসজিদুন

২৭৬. ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১
২৭৭. মুহাম্মদ 'আবদুল মা'বূদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬
২৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭
২৭৯. 'আল্লামা কাযী সুলায়মান মনসূরপুরী, প্রাগুক্ত, (প্রান্তটীকা) ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০
২৮০. সীরাত বিশ্বকোষ ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

Dhaka University Institutional Repository

নববীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ সময় আবূ বকর আওহাদ আল-ফাররাশ মসজিদে প্রবেশ করে পশ্চিম কোণে মসজিদ আলোকিত করার জন্য বাতি বের করেন। সে বাতির আগুন বাতিদানের চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন মসজিদের বিছানা ও আসবাব পত্রে লেগে গিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আগুন নেভাতে অপারগ হন। মদীনার আমীরসহ জনসাধারণও আগুন নেভাতে ব্যর্থ হন। ফলে নবী কারীম (সা.)-এর মিম্বার সংশ্লিষ্ট স্থান, দরজাসমূহ, ধনভাণ্ডার, মাকসূরা ইত্যাদি সব কিছুই পুড়ে যায়।[২৮১] মসজিদু নববীর ছাদ দূর্বল হয়ে যাওয়ায় ১৪৬৭ খ্রি. সুলতান আশরাফ বরসাবাই ছাদকে নতুন করে নির্মাণ করেন। ১৪৪৯ খ্রি. যাহের জাফমক, ১৪৭৪ খ্রি. সুলতান মওসুফ মসজিদের সংস্কার করেন। এমনিভাবে ১৪৭৬ খ্রি. খাজা শাসসুদ্দীন বিন যামান সংস্কার ও মেরামতের কাজ করেন।[২৮২]

৮৮৬ হিজরীতে ১৩ রমযান মাসে দ্বিতীয়বারের মত অগ্নিকাণ্ডের পর মদীনাবাসিগণ মিসরের বাদশাহ্ আশরাফ কায়েতবারের চিঠি লেখার পর তিনি প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাজমিস্ত্রি ও প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠান। ১৪৮৬ খ্রি. মসজিদের কাজ পুনঃনির্মার্ণ করা হয় এবং ১৪৮৮ খ্রি. কাজ সমাপ্ত হয়।[২৮৩] 'উসমানী শাসনামলেও মসজিদের নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। ১৫৬৬ খ্রি. সুলতান সুলায়মান মসজিদুন নববীর দরজা নতুন করে নির্মাণ করেন। সুলতান মওসুফ ১৫৩১ খ্রি. মসজিদের মাঝখানে এক মিহরাব নির্মাণ করেন, যাকে মিহরাবে সুলায়মানী বলা হয়। ১৫৮২ খ্রি. সুলতান সেলিম দ্বিতীয়বার মসজিদের মেরামত ও সংস্কার করেন। কিন্তু সুলতান আশরাফ কায়েত বারের নির্মিত মসজিদই শান-শওকতের সঙ্গে বিদ্যমান ছিল।[২৮৪]

সুলতান কায়েতবারের নির্মিত মসজিদ ৪৮০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে দেয়াল ও ছাদ দুর্বল হয়ে গেলে শায়খ দাঊদ পাশা ১৮৪৭ খ্রি. ইস্তাম্বুলের তুর্কী সুলতান 'আব্দুল মজীদ খানের কাছে তা লিখে জানান। সুলতান বিষয়টি অতীব গুরুত্ব সহকারে তা অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন। সঠিক তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর তিনি কারিগর, বিশেষজ্ঞ, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি ও প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী প্রেরণ করেন। এ নির্মাণ কাজে তিনি যূল-হুলায়ফার নিকটবর্তী জামাওয়ারের পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ পাহাড় থেকে লাল পাথর ব্যবহার করেন। এ নির্মাণ কাজে এযাবৎ কালের সর্ববৃহৎ, মজবুত ও উৎকৃষ্ট নির্মাণ কাজ হিসেবে বিবেচিত।[২৮৫] নির্মাণ কাজটি ১৮৪৮ খ্রি. থেকে শুরু হয়ে ১৮৫৮ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ সময় সমাপ্ত হয়। আজ পর্যন্ত সুলতান মজীদখানের এ সুদৃঢ় বিনির্মাণ কাজটি অক্ষুন্ন রয়েছে।[২৮৬]

সুলতান মজীদ খানের এ সংস্কারের সময় গম্বুজের কাঠ পরিবর্তন করে লোহা ব্যবহার করা হয় এবং গম্বুজের ভেতর প্রাকৃতিক দৃশের আকর্ষণীয় কারুকার্য দ্বারা খচিত করা হয়। মসজিদের সামনের দেয়ালে

---

২৮১. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৫৭-৫৮

২৮২. মুহাম্মদ 'আবদুল মা'বূদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

২৮৩. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *মদীনা শরীফের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২৮৪. মুহাম্মদ 'আবদুল মা'বূদ, প্রগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

২৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

২৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

Dhaka University Institutional Repository

সোনালি অক্ষরে কুর'আনের বিভিন্ন সূরা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নাম ইত্যাদি অঙ্কন করা হয়। বর্তমানে সামনের অংশে যে সকল দরজা বিদ্যমান আছে, তা হচ্ছে বাবে জিব্‌রাইল, বাবুস সালাম ও বাবুর রাহমাহ। উত্তর দিকে বাবুল মজিদী ও বাবুল যায়ত ভেঙে ফেলা হয়েছে।[২৮৭] তুর্কী সুলতান 'আব্দুল মজীদের সংস্কারের পর মসজিদ ক্রমবর্ধমান মুসল্লীর কারণে এবং হজ্জ মৌসুমে বেশি সংখ্যক লোকের সমাগমের কারণে মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই এ কাজের জন্য প্রখ্যাত সৌদী ঠিকাদার বিন লাদেন কোম্পানিকে নিয়োগ করা হয়। ১৯৫১ খ্রি. কাজ শুরু করে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর তা সমাপ্ত হয়।[২৮৮] সুলতান 'আব্দুল 'আযীয বিন সা'উদ ১৯৪৯ খ্রি. মুসলিম বিশ্বকে এ ব্যাপারে অবগত করেছিলেন। আর এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'আখবারে আল-মদীনা' নামক পত্রিকাতে।[২৮৯]

মসজিদুন্ নববীতে কিবলা দরজার হেফাযত ও এর ভিতকে পানি থেকে রক্ষার জন্য বাহিরের দিক দিয়ে কংক্রিটের দেয়াল দেয়া হয়েছে, যার উচ্চতা চার মিটার। মসজিদের মুসল্লীদের আসার সুবিধার্থে চারদিক প্রশস্ত করে রাখা হয়েছে।[২৯০] আর ক্রমবর্ধমান মুসল্লীদের সংকুলানের জন্য সৌদী বাদশাহ্ ফয়সাল বিন 'আবদুল 'আযীয ১৯৬৩ খ্রি. মূল মসজিদ ভবন সংলগ্ন পশ্চিমে প্রথম পর্যায়ে ৩৫ হাজার বর্গ মিটার। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচ হাজার ৫৫০ বর্গ মিটার এলাকায় শেড নির্মাণ করেন এবং ভিত পাকা করে সালাত আদায় করার ব্যবস্থা করেন। এতে বৈদ্যুতিক তার ও মাইকের ব্যবস্থা করেন। তবে তিনি মূল ভবনের কোন সংস্কার করেননি।[২৯১] সৌদী বাদশাহ্ খালিদ বিন 'আবদুল 'আযীযও বেশি মুসল্লী সংকুলানের জন্য ৪৩ হাজার বর্গ মিটার শেড নির্মাণ করেন। ফলে বাদশাহ্ ফয়সালের সম্প্রসারণের সাথে এ সম্প্রসারণ সংযুক্ত হওয়ায় বিরাট শেড যুক্ত ময়দান তৈরি হয় এবং মুসল্লীদের সালাত আদায়ের সুবিধা বৃদ্ধি পায়।[২৯২]

বাদশাহ্ ফাহাদের সম্প্রসারণ মসজিদের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণ। তিনি নিজে ১৯৮৪ খ্রি. মসজিদের কাজের উদ্বোধন করেন। বর্তমান মসজিদকে অক্ষুন্ন রেখে এর ডিজাইন ও কারুকার্যের সাথে মিল রেখে মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমে ৫ গুণ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এখন এতে ১ লাখ ৬৭ হাজার মুসল্লীর সংকুলান হয়েছে। ছাদের ৬৭ হাজার বর্গ মিটার এলাকা সালাত আদায়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তাতে আরও ৯০ হাজার মুসল্লী সংকুলান হয়েছে। মসজিদের চারপাশের আঙ্গিনার আয়তন হচ্ছে ১ লাখ ৩৫ হাজার। মসজিদ ও আঙ্গিনা সব মিলিয়ে ৬ লাখ ৫০ হাজার লোক সালাত আদায় করতে পারে। মসজিদের নীচ তলার আয়তন হচ্ছে ১ লাখ ৬৫ হাজার বর্গ মিটার। এর উপর দোতলাও তৈরি করা যাবে। বেইজম্যান্টের আয়তন হচ্ছে ৮৭ হাজার বর্গমিটার। নতুন সম্প্রসারিত অংশের নীচের

২৮৭. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *মদীনা শরীফের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

২৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

২৮৯. মুহাম্মদ 'আবদুল মা'বূদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

২৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

২৯১. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *মদীনা শরীফের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

২৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

সমান এলাকা সবটুকুই বেইজম্যান্ট। ছাদ তাপ নিয়ন্ত্রণকারী মার্বেল পাথর লাগানো হয়েছে। যাতে প্রচণ্ড গরমের সময় তা ঠাণ্ডা থাকে এবং সালাত আদায় করতে মুসল্লীদের কষ্ট না হয়। মসজিদের চার পাশের বৃহদাকার আঙ্গিনায়ও অনুরূপ তাপ নিয়ন্ত্রিত মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে।[২৯৩]

বেইজম্যান্টের কংক্রিট দ্বারা তৈরি স্তম্ভের সংখ্যা হচ্ছে ১,৭৯৪ টি। মসজিদে গম্বুজের সংখ্যা ২৭ টি। মসজিদে ৬টি মিনার তৈরি করা হয়েছে। ফলে পূর্বে ৭২ মিটার উঁচূ ৪টিসহ মিনার সংখ্যা দশটি। ছাদে উঠার ১৮টি সাধারণ সিঁড়ি এবং ৫টি চলন্ত সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। মসজিদে ২৭টি প্রবেশ পথ নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি হচ্ছে প্রধান প্রবেশ পথ। মোট আভ্যন্তরীন দরজার সংখ্যা হচ্ছে ৮২টি। মসজিদ থেকে বৃষ্টি ও পানি সরানোর জন্য সুয়ারেজ লাইন রয়েছে। তাতে ৯ হাজার ৫ শ মিটার পাইপ বসানো হয়েছে। মসজিদে প্রয়োজনীয় ঠাণ্ডা পানি সরবরাহরে জন্য ও আওয়াজ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২৫ কিলোমিটার দূরে ৭০ হাজার বর্গমিটার এলাকার উপর ১৭ টন হিমায়িত শক্তি বিশিষ্ট এয়ারকণ্ডিশন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।[২৯৪] মুসল্লীদের অযূর জন্য ৬৮০০ টি কল বসানো হয়েছে। ৪৮২টি টয়লেট নির্মাণ হয়েছে। গাড়ি পার্কের জন্য মসজিদের পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণের খোলা আঙ্গিনা ও মাটির নীচে ২ লাখ ৯০ হাজার বর্গমিটার বিশিষ্ট এলাকা রয়েছে যাতে ৪ হাজার ৯৬টি গাড়ি রাখা যায়। মসজিদুন নববীতে একটি নিরাপত্তা কক্ষ স্থাপিত হয়েছে। মসজিদুন নববীতে ৬টি নিরাপত্তায় বিভক্ত করে টেলিভিশন সার্কিট সেট স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকাকে পর্যবেক্ষণের আওতায় আনার লক্ষ্যে মোট ৫৩৪টি টেলিভিশন ক্যামেরা বসানো হয়েছে।[২৯৫]

বায়তুল মুকাদ্দাস

নবীগণ (আ.)-এর মহান স্মৃতি ও মুসলমানদের প্রথম কিবলা ফিলিস্তিনস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাস নগরীর মুকুটমণি, পৃথিবীর তৃতীয় পবিত্রতম স্থান মসজিদুল আকসা।[২৯৬] বহু নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত ও চির বিশ্রামস্থল হিসেবে জেরুজালেম সব সময়ই ইসলামের দৃষ্টিতে সম্মানিত স্থান। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় অবস্থাকালে (৬১০-৬২২ খ্রি.) এবং মদীনায় হিজরত করার (৬২২ খ্রি.) পরও ১৬/১৭ মাস যাবৎ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছিলেন।[২৯৭] কা'বাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করার পর (৬২৪ খ্রি.) মসজিদুল আকসার গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পেলেও পবিত্র স্থান হিসেবে এর গুরুত্ব মোটেই কমেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সওয়াবের আশায় যে তিনটি মসজিদ

২৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

২৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

২৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩

২৯৬. অধ্যক্ষ 'আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭

২৯৭. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ২য় খ, কিতাবুত তাফসীর, পৃ. ৬৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রমণ করার অনুমতি প্রদান করেছেন, বায়তুল মুকাদ্দাস এর মধ্যে একটি।[২৯৮] মসজিদটি হারাম শরীফ থেকে দক্ষিণে এবং 'Dome of the Rock' বা কুব্বাতুস সাখরা এর দক্ষিণে অবস্থিত।[২৯৯]

মসজিদুল আকসার নির্মাণ ইতিহাস

মসজিদুল আকসার ৭টি নাম রয়েছে। যথা: (১) মসজিদুল আকসা, (২) বায়তুল মুকাদ্দাস, (৩) আল-কুদ্‌স, (৪) মসজিদু ইলিয়া, (৫) সালাম (৬) উরুশলেস (৭) ইয়াকুস। ঐতিহাসিকদের মতে, মসজিদুল আকসার কোন ঘর ছিল না বরং পরবর্তীতে মসজিদুল আকসা ও সাখরা ভবন নির্মিত হয়েছে। খালি স্থানকে মসজিদ বলার কারণ এটি 'ইবাদতের স্থান ছিল। পরবর্তীতে 'আকসা' ও 'সাখরা' নামে দু'টি ভবন তৈরি করা হয়।[৩০০] আল-আকসা মসজিদের পাশেই অনেকটা জায়গা নিয়ে দাঊদ (আ.) থেকে শুরু করে অনেক নবী-রাসূলগণের কবর রয়েছে। এ পবিত্র সমাধিস্থলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রকারের ফল-মূলের গাছ। এখানে বিভিন্ন ধর্মের পর্যটকদের ভিড় হয়। মুসলমানগণ থাকে কবর যিয়ারতে ব্যস্ত।[৩০১] আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্ব দাঊদ (আ.)-এর রাজত্ব কালে বনূ ইসরাঈল জেরুজালেম দখল করে সমগ্র প্যালেস্টাইনের উপর অধিপত্য বিস্তার করে। তাঁর পুত্র সুলায়মান (আ.) পিতার সম্রাজ্যকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাড় করান।[৩০২]

এ পৃথিবীতে প্রথম ঘর হল বায়তুল্লাহ্, আর দ্বিতীয় ঘর হল বায়তুল মুকাদ্দাস। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান চল্লিশ বছর।[৩০৩] হযরত দাঊদ (আ.) এ ঘর নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বের এগার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি মারা যান। বাকি কাজ তাঁর পুত্র সুলায়মান (আ.) সমাপ্ত করেন।[৩০৪] সুলায়মান (আ.) এতে স্বচ্চ কাঁচ ব্যবহার করেন, জানালা, মিনারও স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।[৩০৫] জানা যায়, সম্রাট বখতে নসর বায়তুল মুকাদ্দাসের ক্ষতি সাধন করে। পরে দাঊদ (আ.)-এর বংশের জনৈক ব্যক্তি তা সংস্কার

---

২৯৮. ইমাম আবূ 'ঈসা আত্ তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫

২৯৯. Gordon D. Newby. op.cit., P.144. বায়তুল মুকাদ্দাস পবিত্র ও বরকতময় স্থানে অবস্থিত বলে একে বায়তুল মুকাদ্দাস বলা হয়। (শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইয়াকূত, *মু'জামুল বুলদান*, ৫ম খণ্ড, বৈরূত:দারুল কুতুবুল 'আরাবী, তা. বি., পৃ. ১৭২)। বায়তুল মুকাদ্দাসকে মসজিদুল আকসা বলার কারণ এটি মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। (ইমাম ফখরুর রাযী, *আত্-তাফসীরুল কাবীর*, ২০তম খণ্ড, বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াউ আত্-তুরাসুল 'আরাবী, তা. বি., পৃ. ১৪৬)।

৩০০. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *আল-আকসা মসজিদের ইতিকথা*, ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৮ খ্রি., ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১৪

৩০১. স্বপ্নের মসজিদে তিন ঘণ্টা, লেখকের নাম বিহীন, *দৈনিক যুগান্ড়র*, ৩০-৭-২০০৮ খ্রি., পৃ. ৫

৩০২. মঈন বিন নাসির, *প্যালেষ্টাইন থেকে বসুনিয়া* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৯

৩০৩. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৮৭

৩০৪. 'আলণ্ঢামা আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ্-শায়বানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত্-তাবারী, *তারীখু আত-তাবারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮

৩০৫. 'আবদুর রহমান ইব্ন খলদুন, মুকাদ্দমা ইব্ন খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[৩০৬] ইরানের শাহ খসরু খিস্টপূর্ব ৩৬ সনে বাবেল আক্রমণ করে বখতে নসরের বংশধরগণকে পরাজিত করে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করেন। তিনি ইয়াহূদীদিগকে এখানে বসবাস করার অনুমতি দেন এবং তাঁর পুত্র তাঁদেরকে মসজিদুল আকসা নির্মাণের পুণরায় সুযোগ দেন।[৩০৭] অতঃপর তীতিশ (طيطش) নামক রোমের সম্রাট জেরুজালেম আক্রমণ করে বায়তুল মুকাদ্দাসের ক্ষতিসাধন করে এবং সেখানে চাষাবাদ করার নির্দেশ দেয়।[৩০৮]

মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করে এখানে যাত্রা বিরতি করেন এবং নবীগণের ইমাম হয়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন।[৩০৯] হযরত 'উমর (রা.) ৬৩৬ খ্রি. বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন।[৩১০] তিনি দেখেন 'সাখরা' মসজিদ থেকে আলাদা। তখন তিনি সাখরার উপর মসজিদ নির্মাণ করেন।[৩১১] হযরত 'উমর (রা.) বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। তখন সালাতের সময় হয়। তিনি মিহরাবে প্রবেশ করেন। পরে মিহরাবের নিকট দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন।[৩১২]

উমাইয়া খলীফা 'আবদুল মালিক বিন মারওয়ান (শাসনকাল ৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) দামেস্কের সাথে সাথে জেরুজালেমেও খিলাফতের বায়'আত নেন। তিনি জেরুজালেম শহরটি পুর্ণগঠনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ৬৮৫-৮৯ খ্রি. মসজিদে সাখরাকে সুন্দর করে পুনঃনির্মাণ করেন এবং নতুন করে মসজিদুল আকসা তৈরির জন্য আকসা মসজিদের দেয়াল ঘেরা সকল অংশ অর্ন্তভূক্ত করেন। 'আবদুল মালিক বিন মারওয়ান মসজিদুল আকসার পুরো সীমানার উপর মসজিদ তৈরির উদ্যোগ নেন। তাঁর ছেলে ওয়ালীদ বিন মালিক (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) মসজিদের নিমার্ণ কাজ সমাপ্ত করেন। 'আবদুল মালিক পুনঃনির্মাণের ব্যয় নির্বাহের জন্য মিসরের সাত বছরের খাজনা নির্দিষ্ট করেছিলেন।[৩১৩]

বায়তুল মুকাদ্দাসের সংস্কার

বায়তুল মুকাদ্দাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়, আব্বাসীয় খিলাফতের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) সময়ে। কারণ ৭৪৬ খ্রি. ভূমিকম্পে বায়তুল মুকাদ্দাস বিনষ্ট হয়। আব্বাসীয় খলীফা মনসূর (শাসনকাল ৭৫৪-৭৭৫খ্রি.) এবং ইমাম মাহদী 'আবদুল্লাহ্ বিন তাহির ৭৭১ এবং ৭৭৪ খ্রি.-এর মাঝামাঝি সময়ে মসজিদুল আকসা নির্মাণ করেন এবং সম্প্রসারিত করেন।[৩১৪] অতঃপর ১০৯৯ খ্রি. মুসলমানদের

---

৩০৬. 'আলণ্ঢামা ইব্ন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ৩৬

৩০৭. অধ্যক্ষ 'আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮। হিরদুস নামক জনৈক ব্যক্তি সুলায়মানের ভিতের উপর ছয় বছর ধরে তা নির্মাণ করে বলেও জানা জায়। দ্র. 'আবদুর রহমান ইব্ন খলদুল, *মুকাদ্দমা ইব্ন খলদুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

৩০৮. 'আবদুর রহমান ইব্ন খলদুন, *মুকাদ্দমা ইব্ন খলদুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

৩০৯. 'আলণ্ঢামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৩১০. আবূল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ৩৩২

৩১১. 'আবদুর রহমান ইব্ন খালদুন, *মুকাদ্দামা ইব্ন খালদুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

৩১২. শায়খ তোয়া-হাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২

৩১৩. এ,এন,এস, সিরাজুল ইসলাম, *আল-আকসা মসজিদের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৩১৪. The Encyclopaedia of Islam, op.cit., vol. vi, p.707

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বলতার সুযোগে ইউরোপীয় ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা সাখরা বা পাথর গম্বুজটিকে খ্রিষ্টান যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে তা গির্জায় পরিণত করে। এর ভেতর ও বাহিরে খ্রিষ্টান চিত্র ও পাদ্রিদের প্রতিকৃতি দিয়ে ভরে দেয় এবং গম্বুজের চূড়ায় একটি বিশাল স্বর্ণ নির্মিত ক্রস স্থাপন করে।[৩১৫] অতঃপর ১১৮৭ খ্রি. মিসরের সুলতান সালায়ুদ্দীন আইয়ুব খ্রিষ্টান বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করেন এবং গির্জা ধ্বংস করে পুনরায় মসজিদ নির্মাণ করেন। এখনও মসজিদটি সেই নির্মাণের উপর বিদ্যমান রয়েছে।[৩১৬]

১৫২০ খিস্টাব্দ থেকে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কী সুলতান কানুনী মসজিদুল আকসার চার দেয়াল সংস্কার করেন। মসজিদের পার্শ্বে দূর্গ, কূপ ও মসজিদের দরজা এবং দেয়াল পুনঃনির্মার্ণ করেন। তিনি মাকামে দাঊদ সংস্কার করেন। ১৯১৭ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী সুলতান জার্মানীর পক্ষে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। ফলে বিজয়ী বৃটেন তুর্কী শাসনের অবসান ঘটায় এবং জেরুজালেম দখলে নেয়। এর ফলে জেরুজালেমে মুসলিম শাসনের অবসান হয়।[৩১৭]

১৯৬৭ সনের জুন মাসে ইসরাইল একযোগে মিসর, সিরিয়া ও জর্দানের উপর আক্রমণ করে। ৬ দিনের যুদ্ধে ইসরাইল জর্দানের মুসলিম শাসন থেকে জেরুজালেম দখল করে নেয়। উল্লেখ্য দীর্ঘ ৩১ বছর ব্রিটিশ শাসনে থাকার পর জেরুজালেম ১৯৬৭ খ্রি. পর্যন্ত জর্দানের অধীনে ছিল। এরপর জাতিসংঘের ১৪২ নং প্রস্তাব গ্রহণ করে এতদ অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি এবং অধিকৃত 'আরব এলাকা থেকে ইসরাইলী বাহিনীর প্রত্যাহারের আহ্বান করে। কিন্তু সে প্রস্তাব আজও কার্যকর হয়নি। তাই জেরুজালেম এখন পর্যন্ত ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে।[৩১৮] আজ মুসলমানদের এ দূর্দিনে অসহায়ত্ব দূর করার জন্য জেরুজালেম বিজয়ী আবূ 'উবাদা বিন জাররাহ্ ও সালায়ুদ্দীন আয়ূবীর মত নেতৃত্ব ও সিপাহসালার প্রয়োজন।

---

৩১৫. 'আবদুর রহমান ইব্ন খলদুন, মুকাদ্দামা ইব্ন খালদুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

৩১৬. The Encyclopaedia of Islam, op.cit., vol. vi, p.708

৩১৭. এ.এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *আল-আকসা মসজিদের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৩১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মসজিদের মিহরাব

মসজিদের কেন্দ্রীয় দেয়ালে মক্কার দিকে নির্দশক বা কিবলা নির্দেশক কুলঙ্গি এবং জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় ইমামের দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য নির্ধারিত স্থানই মসজিদের মিহ্রাব হিসেবে পরিচিত। মসজিদুন্ নববীতে একটি বড় কালো পাথর যা উত্তরের দেয়ালে জেরুজালেম বা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নির্দেশক হিসেবে প্রতিস্থাপিত ছিল পরে কিব্লা পরিবর্তন হয়ে গেলে তা দক্ষিণের দেয়ালে কা'বা শরীফের দিকে নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত হয় এটাই মসজিদুন নববীর মিহরাব ছিল।[৩১৯] মুসলিম স্থাপত্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে মসজিদ। একটি মসজিদের বিভিন্ন অংশ থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্মিত মসজিদটি বিশ্বে ইসলামী যুগের ঐতিহ্যবাহী সর্বপ্রথম মসজিদ। ৬২২খ্রি. থেকে ৭১৫খ্রি. পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ এক শতাব্দী পর্যন্ত মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের ক্রমবিবর্তন হয় এবং এটি দামেস্কের মসজিদে পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহণ করে। একটি মসজিদের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে কিবলা প্রাচীর। মসজিদ নির্মাণের জন্য মক্কার কা'বা শরীফের দিকে প্রথম প্রাচীর নির্মাণ করে প্রাচীরের মাঝখানে একটি মিহ্রাব স্থাপন করতে হয়। এ মিহ্রাব কেবল কিবলা নির্ধারকই নয়, বরং ইমামের জন্য নির্দিষ্ট স্থান যেখান থেকে তিনি জামা'আতের সালাত পরিচালনা করে থাকেন।[৩২০]

মিহ্রাব শব্দের বিশ্লেষণ

محراب শব্দটি ح - ر - ب থেকে উদ্গত হয়েছে। এটি স্ত্রীলিঙ্গ। কখনও কখনও পুংলিঙ্গ হিসেবেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩২১] যুদ্ধ ক্ষেত্রের লুণ্ঠিত মালকে حرب বলা হয়ে থাকে।[৩২২] এ শব্দটির ক্ষুদ্রাত্মক বাচক শব্দ হয় حريب। আর বহুবচনে ব্যবহৃত হয় حروب। যেমনিভাবে 'আরবী ভাষায় বলা হয় رجل حرب অর্থাৎ বীর যোদ্ধা। তদ্রূপ মুশরিকদের দেশকে دار الحرب বলা হয়।[৩২৩] যুদ্ধকেও حرب বলা হয়।[৩২৪] আর محراب المسجد বলা হয় এজন্য যে, কারণ এ স্থানটি শয়তান ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের স্থান। এ স্থানে একজন মুমিনকে পার্থিব ব্যাপারে ও দুশ্চিন্তার সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। ফলে সে একজন যোদ্ধা হয়ে যায়। কারও কারও মতে, গৃহের মিহ্রাব হচ্ছে উপবেশন করার নির্দিষ্ট স্থান। মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর উহার বিশিষ্ট স্থানও মিহ্রাব নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ এ মন্তব্যও করে থাকেন যে, মসজিদের মিহ্রাব হতেই গৃহের বিশেষ উপবেশনের স্থানকে মিহ্রাব হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। আর এটাই সঠিক বলে মনে হয়।[৩২৫] محراب المسجد বলা হয় ঐ স্থানকে যে জায়গায় ইমাম অবস্থান করেন।[৩২৬]

---

৩১৯. Thomas Patrick Hughes, op.cit., P. 348
৩২০. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৩২১. মুহাম্মদ বিন আবূ বকর 'আবদুল কাদীর আর্-রাযী, *মুখতারুস্-সিহাহ,* মিসর: দারুল হাদীস, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৮১
৩২২. 'আল্লামা রাগিব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৩২৩. মাওলানা 'আবদুল হাফীয বিলইয়ারী, *মিসবাহুল লুগাত* (আরবী-উর্দূ), দিল্লী: মাকতাবায়ে বুরহান, উর্দূ বাজার জামি' মসজিদ, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ১৪৪
৩২৪. John Penrice, op, cit., P. 33
৩২৫. 'আল্লামা রাগিব ইসফাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৩২৬. *আল্ মুনজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫। محراب অর্থ الغرفة কক্ষ বা কামরা।

Dhaka University Institutional Repository

মিহ্‌রাব শব্দটি বাড়ি (House), তাঁবু (Tent), কামরা (Chamber) প্রভৃতিকেও বুঝায়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সম্মানিত ব্যক্তির আসনকে অনেক সময় মিহ্‌রাব বলা হয় । যেমন-'আরবী ভাষায় বলা হয় كان يكره المحاريب অর্থাৎ, তিনি কক্ষের উঁচু স্থানকে অপছন্দ করতেন। আবার যেখানে রাজা, বাদশাহ,সর্দার এবং মহৎ ব্যক্তিগণ উপবেশন করেন, সে স্থানকেও মিহ্‌রাব বলা হয়ে থাকে। কক্ষ বা কামরার উঁচু স্থানকেও মিহ্‌রাব বলা হয়ে থাকে, যে কক্ষে সিঁড়ি দিয়ে আরোহণ করতে হয়।[৩২৭] এ কারণে محراب অর্থ হয় কামরা। যেমন-মসজিদের মিহরাব- এটি صدر المجلس বা সমাবেশের সম্মুখ ভাগ। [৩২৮]

মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে محراب শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন:[৩২৯] كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا অর্থ যখনই যাকারিয়া (আ.) মিহ্‌রাবের মধ্যে তাঁর (মারইয়ম) কাছে আসতেন, তখনই কিছু খাবার দেখতে পেলেন। আলোচ্য আয়াতে মিহ্‌রাব বলতে মসজিদের পবিত্র স্থান ও সম্মুখ স্থানকে বুঝানো হয়েছে।[৩৩০] মারইয়ম (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাসের যে কক্ষে বা স্থানে অবস্থান করতেন এবং 'ইবাদত করতেন তাকে মিহ্‌রাব বলা হত।[৩৩১] كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا এ আয়াতে মিহ্‌রাব সম্পর্কে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, غرفة بنيت لما في بيت المقدس وجعلت بابها في وسط الحائط وكانت لا يصعد عليها بسلم مثل باب الكعبة. [৩৩২] অথাৎ ''একটি কক্ষ বা কামরা নির্মাণ করা হয়েছে মারইয়ম (আ.)-এর জন্য। আর এর দরজা নির্মাণ করা হয়েছে দেয়ালের মাঝামাঝি। যাতে সিঁড়ি ব্যতীত আরোহণ করা যেত না যেমনি কা'বা ঘরের দরজা নির্মাণ করা হয়েছে"। তাই কেউ কেউ এমন কামরা বা হুজরাকে মিহ্‌রাব বলেছেন-যাতে আরোহণ করতে সিঁড়ি লাগে। [৩৩৩]

সূরা মারইয়ামে মিহ্‌রাব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যথা: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا [৩৩৪] সুদ্দী মিহ্‌রাব বলতে মুসাল্লাকে বুঝিয়েছেন।[৩৩৫] আর محراب শব্দটি উৎকলিত হয়েছে المحاربة থেকে। কারণ মুসল্লী ঐ স্থানে শয়তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে অন্তরকে মুক্ত করে।[৩৩৬] কারও কারও অভিমত হল, ইমাম অবস্থানের স্থানকে মসজিদের মিহ্‌রাব এজন্য

---

৩২৭. Edward William Lane, op.cit., pt.,2, p. 541

৩২৮. মুহাম্মদ বিন আবূ বকর 'আবদুল কাদীর আর্-রাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১। محراب শব্দটি حرب থেকে চয়িত। অর্থ লড়াই করা। যুদ্ধ দ্বারা লুণ্ঠন করা, জরিমানা করা। মূলত মিহ্‌রাব হল সভাপতির আসন। আর এ থেকে মসজিদের মিহ্‌রাব। কারণ এটি নেতার স্থান।

৩২৯. আল-কুর'আন, ০৩: ৩৭

৩৩০. আবূ মুহাম্মদ আল-হুসায়ন ইব্‌ন মাস'উদ, *তাফসীর আল-বাগভী*, ১ম খ, ইদারাতুত্ তা'লীফাত, আশরাফিয়া, মুলতান পাকিস্ড়ান, তা. বি., পৃ. ২৯৭

৩৩১. মুহাম্মদ 'আলী সাবূনী, *সাফওয়াতুত্ তাফাসীর*, ১ম খ, দার স সাবুনী, মিসর, তা. বি., পৃ. ১৯৯

৩৩২. আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী, তাহকীক, ড. সায়্যিদ মুহাম্মদ আস-সায়দানী ও আস্-সায়্যিদ ইবরাহীম 'ইমরান, *তাফসীর রূহুল মা'আনী*, মিসর: ২য় খ, দার ল হাদীস, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৮৭

৩৩৩. কাযী জয়নুল 'আবিদীন মিরাঠী, *কামূসুল কুর'আন* ('আরবী-উর্দূ), করাচী: দার ল ইশা'আত, উর্দূ বাজার, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৪৮৫

৩৩৪. আল-কুর'আন, ১৯: ১১

৩৩৫. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীর দুররি মানসূর*, ২য় খ, দার ল কুতুবুল 'ইলমিয়াহ, বৈরূত, ২০০৪, ২য় সংস্কারণ, পৃ.৩৭

৩৩৬. শায়খ তোয়া হাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয় যেহেতু এ স্থান হল মসজিদের উৎকৃষ্ট স্থান। মিহ্‌রাব হল সালাতের কিবলা নির্ণয়ের স্থান। এজন্য এ স্থানকে মিহ্‌রাব বলা হয়। যেহেতু মুসল্লী আল্লাহ্‌র অনুগত্যের জন্য শত্রু ও শয়তানের বিরুদ্ধে সেখানে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।[৩৩৭] হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, " اتقوا هذه المحاريب"[৩৩৮]

محراب শব্দটি مفاعل এর ওজনে ব্যবহৃত হয়। مبالغة এর সীগা, আবার কেউ কেউ মসজিদকেই মিহ্‌রাব বলেছেন। কারও মতে, অতি উৎকৃষ্ট স্থান ও সামনের স্থানকে মিহ্‌রাব বলে। এ অভিমতের উপর ভিত্তি করে ইমাম দাড়ানোর স্থানকেই মিহ্‌রাব বলা হয়।[৩৩৯] আসলে প্রচলিত 'আরবী অভিধানগুলোতে মিহ্‌রাব শব্দের অর্থ গৃহের উচ্চতম অংশের প্রান্তভাগ (Upper end of houses), কোন স্থানের শ্রেষ্ঠতম আসন (First seat in a places), রাজ প্রাসাদ (Palace), সিংহের গুহা, রাজপুত্রের প্রাইভেট কামরা, 'ইবাদতের জন্য মসজিদের স্বতন্ত্র হুজরা বা প্রকোষ্ঠকে মিহ্‌রাব বলা হয়।[৩৪০]

নিম্নে মিহ্‌রাবের কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলঃ

১। 'তাফসীরুত্ তাবারী'তে 'আল্লামা 'আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী বলেন,

"المحراب فهو مقدم كل مجلس ومصلى وهو سيد المجاليس واشرفها واكرمها وكذلك هو من المسجد."[৩৪১]

২। 'The New Encyclopedia Britannica' তে বলা হয়েছে, "Mihrab-prayer nich in the qiblah wall (that facing of Macca) of a Mosque specified size and usually ornately decorated."[৩৪২]

৩। 'The World book Encyclopaedia' তে বলা হয়েছে, "The inner wall closest to the Holy city of Macca has a directive niche or arch called Mihrab."[৩৪৩]

৪। 'ফীরুযুল লুগাত' নামক উর্দূ অভিধানে মিহ্‌রাবের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে– " وہ قوس یا کمان نما جگہ جہاں امام کھڑا ہوکر نماز پڑھاتا ہے."[৩৪৪] অর্থাৎ ঐ বাঁকা স্থান যেখানে দাঁড়িয়ে ইমাম নামায পড়ান।

---

৩৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

৩৩৮. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *দুর্‌রি মানসূর*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩৩৯. আবুল ফজল শিহাবুদ্দীন সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭

৩৪০. 'আলণ্ঢামা আব্দুলণ্ঢাহেল কাফী, আল-কুরায়শী, *ফাতওয়া ও মাসায়েল*, ঢাকা:এম. এ. বারী আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ, নওয়াবপুর রোড, ২য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৪৩।

৩৪১. ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন তাবারী, *তাফসীর আত-তাবারী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮

৩৪২. The New Encyclopaedia of Britannica, voLÊ, vi, U.S.A. 1998, 15th ed., P. 882

৩৪৩. The World Book Encyclopaedia vol.13, op.cit., P. 633

৩৪৪. মৌলভী ফীরুযুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

Dhaka University Institutional Repository

৫। 'The Encyclopaedia of Islam' নামক বিশ্বকোষে মিহরাবের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, "The highest place in a mosque a niche: Which shows the direction of the qibla of the station of the imam in a Masque."[৩৪৫]

৬। 'The World book dictionary' তে বলা হয়েছে, "Mihrab a niche in a Moslem Mosque, Which points to Mecca."[৩৪৬]

যাইহোক উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ প্রত্যেকটিই প্রায় একই ধরনের। উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সালাত আদায়ের সময় ইমাম যে স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত পরিচালনা করেন-সেই পশ্চিমের দেয়ালের কা'বা নির্দেশক অংশের নামই মিহ্রাব।

মিহরাবের নির্মাণ ইতিহাস

মিহরাব অত্যন্ত সুসজ্জিতভাবে অলঙ্কৃত করা হয়। টাইলস দিয়ে খচিত করা হয়, অথবা কুর'আনের আয়াত দিয়ে খচিত করা হয়। এ ধরনের মিহ্রাব সংরক্ষিত হয়েছে- দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে (৭২০ খ্রি.)।[৩৪৭] মসজিদ সাধারণত গৃহ হতে পৃথক করার জন্য মিহ্রাব একটি স্থাপত্য প্রক্রিয়া। বর্তমানে মিহরাববিহীন মসজিদ খুব কমই দেখা যায়। খোলা মাঠে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অনেক সময় কিবলার দিকে বর্শা সংস্থাপন করে সালাত-আদায় করতেন। এটিকে কিবলা নির্দেশক হিসেবে গণ্য করা হত।[৩৪৮] হিজরী পনের সনের কিছু পূর্বে সিপাহ্সালার আবূ 'উবায়দার নেতৃত্বে যখন দামেস্ক বিজিত হয়- তখন সেখানকার এক গির্জার অর্ধাংশকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়। ঐ মসজিদে প্রথম নামায পড়ান হযরত আবূ 'উবায়দা (রা.)। তারপর সাহাবীগণও ঐ মসজিদে সালাত আদায় করেছেন। ঐ মসজিদে মিহ্রাবুস্ সাহাবা বা সাহাবীগণের মিহরাব বলে একটি স্থান নির্ধারিত ছিল।[৩৪৯]

মিহরাব হযরত দাউদ (আ.) এবং অন্যান্য নবীগণের আমল থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে। জেরুজালেম মসজিদে নবীগণের মিহরাব ছিল বলে মন্তব্য পাওয়া যায়।[৩৫০] তবে ০৭-৭০৯ খ্রি.-এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মদীনার মসজিদে কিবলা নির্ধারিত ছিল কালো পাথর দিয়ে। এটি অবিকল কা'বার কালো পাথরের অনুরূপ বিবেচনা করা হত।[৩৫১]

মসজিদের মধ্যভাগে কিবলার দিকে যে খোদাইকৃত স্থানটুকু ইমাম দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে, তাকেই মিহ্রাব হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ইমাম এতে দাঁড়িয়ে মুসল্লীগণের সালাত পরিচালনা

---

৩৪৫. Bos Worth and Others, op.cit., vol.vii, P. 7

৩৪৬. *The World Book Dictionary*, Vol-two, Chicago: World Book inc., ascott fetzer company, 2000, P, 1316

৩৪৭. Ludwig W.Adamec, *The A to Z of Islam,* Vision Books, Pvt., Ldt., New Delhi, 2003, P. 183

৩৪৮. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩৪৯. আবূ মোহাম্মদ 'আলীমুদ্দীন, *মেহরাবের তত্ত্বসার*, ঢাকা: এম.এ. বারী, আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, নওয়াবপুর রোড, ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ২

৩৫০. Syed Mahmudul Hasan, *Mosque Architecture of pre-Mughal Bangal*, op.cit., P.2

৩৫১. Ibid., P.6

Dhaka University Institutional Repository

বৈধ কি-না এধরনের কথা পূর্ব যুগের মুসলমানাদের জন্য বিশেষ কোন আলোচ্য বিষয় ছিল না।[৩৫২] তবে অনেক পণ্ডিতগণ মসজিদে মিহ্‌রাব নির্মাণ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেন এবং এতে সালাত আদায় বৈধ কিনা তা নিয়েও বির্তক সৃষ্টি করেছেন। ইবরাহীম নাখ'ঈ (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) " كان يكره ان يصلى في طاق الامام" এ হাদীসের ভিত্তিতে মিহ্‌রাবে সালাত আদায় করা মাকরূহ বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী (র.)ও (জ. ৯৭-মৃ ১৬১হি.) মিহরাবকে মাকরূহ্ বলেছেন।[৩৫৩] ইব্‌ন হাযম (মৃ. ১০৬৪ খ্রি.) বলেছেন, " تكره المحاريب في المسجد" অর্থাৎ আমরা মসজিদে মিহ্‌রাব নির্মাণকে মাকরুহ মনে করি। কায়েস ইব্‌ন আবী হাযম বলেছেন, "كان يصلى بنا في الطاق." রাসূলুলাহ্ (সা.) মিহ্‌রাবে সালাত আদায় করতেন। 'আবদুর রায্‌যাক বলেছেন, সা'ঈদ বিন যুবায়র (রা.) মসজিদের মিহ্‌রাবে সালাত আদায় করতেন। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে সকল যুগের মুসলমানগণই মিহ্‌রাবে সালাত আদায় করা মঙ্গলজনক মনে করতেন।[৩৫৪]

ইমাম আবূ বকর জালালুদ্দীন সুয়্যূতী (র.) (মৃ. ৯১১ হি.) মসজিদে মিহরাব বানানো বা এতে সালাত আদায় করাকে বিদ'আত ও মাকরুহ্ বলেছেন।[৩৫৫] রাসূলুলাহ্‌র (সা.) সালাত গ্রন্থে 'আল্লামা আলীমুদ্দীন নদীয়াভী বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) এবং সাহাবা কিরাম হতে উহা অবৈধ বা উহাতে সালাত শুদ্ধ নয়, এ ধরনের একটি উক্তিও সহীহ্ সনদে প্রমাণিত হয়নি। ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযম (র.) তাঁর মুহাল্লা কিতাবে মিহ্‌রাব মাকরূহ উক্তি করলেও তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে ঐ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য দলীল পেশ করতে সক্ষম হননি।"[৩৫৬] অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, " اتقوا هذه المذابح يعنى المحاريب"[৩৫৭] অর্থাৎ তোমরা মিহ্‌রাব প্রস্তুত করা থেকে বেঁচে থাক।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা.) (শাসনকাল ৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) সিরিয়াতে যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলেন এবং এতে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলেন (৬৩৭ খ্রি.)। তখন ঐ দরজা দিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে দরজা দিয়ে মি'রাজ রজনীতে প্রবেশ করেছিলেন। তখন তিনি তাহ্‌ইয়াতুল মসজিদ আদায় করলেন হযরত দঊদ (আ.)-এর মিহ্‌রাবে। ঐ মিহ্‌রাবেই মুসল্লীগণকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।[৩৫৮]

ড. ইয়াকুব আলী (জ. ১৯৩৯ খ্রি.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নির্মিত মদীনার মসজিদে মিহ্‌রাবের কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন। কিবলা নির্দেশক হিসেবে কিবলা প্রাচীরের বর্হিগাত্রে একটি পাথর

---

৩৫২. আবূ মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৩৫৩. আবূ মু'আয খালিদ বিন 'আবদুল 'আল, *ইত্তিহাফুস-সাজিদ বি আহ্‌কামিল মাসাজিদ*, জাম'ইয়াতু ইহ্‌ইয়াউত্-তুরাস, আন্দালুস, ২০০৭, পৃ. ৮৫

৩৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৩৫৫. শায়খ তোয়া-হাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

৩৫৬. আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী, *রাসূলুলণ্ঢাহর (সা.) সালাত*, ঢাকা:আশা কম্পিউার, মগবাজার, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১১৭

৩৫৭. ইমাম জালালুদ্দীন আবূ বকর সুয়্যূতী, *আল জামি'উস সগীর*, মিসর:আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ্, কায়রো, তা. বি., পৃ. ১৯

৩৫৮. ইসমা'ঈল ইব্‌ন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭ম খণ্ড, মিসর: মাকতাবাতুস সাফা, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজিত ছিল। মাকরিযীর মতে, মদীনার মসজিদ পুনঃনির্মাণের সময় 'উমর বিন 'আবদুল 'আযীয (জ. ৬১- মৃ. ১০১ হি.) তাতে একটি মিহ্‌রাব সংযোজন করেন, মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে এটি সর্বপ্রথম মিহরাব হিসেবে বিবেচিত। এরপর ৭১০-১২খ্রি. 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর ফুসতাত মসজিদ পুনঃনির্মাণকালে তাতে একটি মিহ্‌রাব সংযোজন করেন।[৩৫৯] আরনল্ডের মতে, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে কিবলা পরিবর্তনের সময় যখন কা'বা কিবলা হয়ে যায়, তখন উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে কিবলা নির্দেশক করা হয়। পরবর্তীতে মসজিদ নির্মিত হয় কুফাতে (৬৩৯ খ্রি.), 'আমর ইবনুল 'আস কর্তৃক ফুসতাতে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে। আর এ শতাব্দীর শেষের দিকে মিহরাবের সূচনা হয় বলে আলনল্ড মন্তব্য পেশ করেন।[৩৬০] যে কোন মসজিদেই কেন্দ্রীয় দেয়ালে মিহরাব স্থাপন করা এখন ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের প্রধান অংশ হয়ে উঠেছে। আর মিহ্‌রাব খ্রিষ্টানদের গির্জায়ও পরিলক্ষিত হয়।[৩৬১] P.K Hitti বলেন, æThe Mihrab, a recess or niche in the wall of the Mosque indicating the direction of Prayer, was a later addition in the equipment of the Mosque takan over from the church,"[৩৬২]

আল-ওয়ালীদ (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫খ্রি.) এবং তাঁর রাজত্বকালে 'উমর বিন 'আবদুল 'আযীযকেই (জ. ৬১-মৃ ১০১হি.) সাধারণত এ মিহরাবের নতুন চিত্র-প্রবর্তন করার কৃতিত্ব দেয়া হয়।[৩৬৩] তবে এর কিছুটা প্রাপ্য মু'আবিয়ারও (শাসনকাল ৬৬১-৬৮০খ্রি.)। খ্রিষ্টান বেদির মত মিহ্‌রাব মসজিদের পবিত্রতা নির্ণায়ক। বস্তুত এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটা অলঙ্কারিক দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। খ্রিষ্টান গির্জার বেদি স্ফীত। আর মসজিদের মিহ্‌রাব হল কুলঙ্গি বা খিলান আকৃতির-ভিতরের অংশ শূন্য থাকে।[৩৬৪] ধর্মীয় রীতি-নীতি নয় মসজিদ সংস্কারের স্বার্থে কিছুটা প্রবর্তনেরও চেষ্টা করা হয়। এ ব্যাপারে সাধারণত একটু বেশি দায়ী হযরত মু'আবিয়া (শাসনকাল ৬৬১-৬৮০খ্রি.) তিনি মসজিদে মাকসূরা তৈরি করেছিলেন।[৩৬৫] আর এটি মসজিদের প্রাচীর ঘেরা একটি অংশ যেখানে শুধু খলীফাগণের প্রবেশাধিকার থাকবে–তাই মাকসূরা। এ মাকসূরা নির্মাণের পেছনে নানা কারণ নিহিত রয়েছে। মূল কারণ হিসেবে খলীফাগণের নিরাপত্তাই আসল।[৩৬৬] হযরত 'উমর (রা.) (মৃ. ৬৪৪ খ্রি.) সালাত আদায় অবস্থায় আঘাত

---

৩৫৯. ড. ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৩৬০. Arnold, op. cit., P.158

৩৬১. *Architecture of the Islamic World*, Ed. George Michell, Thomas and Hudson Ltd., London, 1995, Reprinted, P-34

৩৬২. Philip k, Hitti, op, cit., p.261

৩৬৩. Ibid., P.261

৩৬৪. *Architecture of the Islamic world*. op, cit., P.34

৩৬৫. **মাকসূরা:** আরবী مقصوره শব্দটি قصر শব্দ থেকে চয়িত এর অর্থ অট্টালিকা, সুরক্ষিত প্রাসাদ, সুরক্ষিত প্রশস্ড় গৃহ। এরকম সুরক্ষিত প্রাসাদ যা থেকে কোন মহিলা বের হতে পারে না। অথবা মর্যাদাবান প্রশস্ড় গৃহকেও মাকসূরা বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে মসজিদে নির্মিত কক্ষকে মাকসূরা বলে। সাহাবা, তাব'ঈন সকলেই মসজিদের মাকসূরাতে সালাত আদায় করেছেন। দ্র. 'আলণ্ঢামা মজদুদ্দীন ফীর"যাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭; আল মু'জামুল ওয়াজীয, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪; আবূ মু'আয খালিদ বিন 'আবদুল 'আল, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২; শায়খ তোয়াহাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৩; ড. ইয়াকুব 'আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৩৬৬. Philip K. Hitti, op. cit., Pp. 261-262

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়ার ফলে পরবর্তী খালীফা হযরত 'উসমান (রা.) (শাসনকাল ৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) ইমামের দাড়ানোর স্থানটুকু ইট দিয়ে ঘিরে দেন।[৩৬৭] মু'আবিয়ার আমলে (৬৬১-৬৮০খ্রি.) মারওয়ান মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তিনিও নামাযে ইমামতি করতেন। তিনি কাঁচা ইটের ফাঁক দিয়ে আঘাত পান। ফলে তিনি লোহার রড দিয়ে ও জাল দিয়ে একে সুদৃঢ়ভাবে ঘিরে দেন।[৩৬৮]

আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) স্বয়ং খলীফাগণ, প্রদেশের গর্ভনরগণ ইমামতির দায়িত্বে থাকলেও পরবতীতে তাঁরা সালাত আদায় করানোর কাজ অন্যদের দিয়ে করাতেন। তাই আব্বাসীয় শাসনামলে (৮৫০-১২৫৮ খ্রি.) রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যার লক্ষ্যস্থল মসজিদের মিহরাবে থাকল না। ঐ সময় হতে মসজিদের ইমাম ও খতীবগণের উপর হামলার রীতি-নীতি বন্ধ হয়ে গেল। আর তখন মিহরাব ঘিরে রাখার রিওয়াজ উঠে গেল।[৩৬৯]

মিহ্‌রাবের গুরুত্ব

মধ্যযুগীয় লেখকগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন যে, প্রথম Concave মিহ্‌রাব মদীনায় ওয়ালীদের মসজিদে স্থাপিত ছিল। যা সুসজ্জিত করে মসজিদুন নববীতে স্থাপন করা হয়। আর দ্বিতীয়ত মিহ্‌রাব মসজিদের মাঝখানে স্থাপিত হয় নি। ঐ স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল যেখানে নবী (সা.) সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসারিগণের নিকট অফিস হিসেবে মিহ্‌রাবের রাষ্ট্রীয় বা রাজকীয় তাৎপর্য ছিল। একমাত্র ধর্মীয় গুরুত্বকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য অনেক ধর্মীয় বিল্ডিংসমূহে মিহ্‌রাব স্থাপন করা হয়ে থাকে।[৩৭০] ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, সর্বপ্রথম যিনি মিহ্‌রাবের প্রবর্তন করেন তিনি হলেন 'উমর বিন্ 'আবদুল 'আযীয (শাসনকাল ৯১-১০১হি.)। আর এর নির্দশন পাওয়া গেছে উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ বিন 'আবদুল মালিক (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫ খ্রি.)-এর সময়ে মদীনা মুনাওয়ারাতে।[৩৭১] উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রথম খলীফা 'উসমান (রা.) (সময়কাল ৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) মসজিদুন নববীতে মিহ্‌রাব তৈরি করেন। আর এ মিহ্‌রাব কিবলা নির্ণয়ে সাহায্য করত। আর ইমাম এ মিহ্‌রাবে সালাত আদায়ের সময় মিহ্‌রাবে দাঁড়িয়ে জামা'আতের সালাত পরিচালনা করতেন।[৩৭২]

আরব সাম্রাজ্যে প্রাথমিকভাবে যে কয়টি মসজিদে মিহ্‌রাবের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তা হল- (১) হযরত 'উমর (রা.) (শাসনকাল ৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)-এর আমলে বায়তুল মুকাদ্দাসে। (২) মসজিদুন নববীতে 'উসমান (রা.)-এর শাসনামলে (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.), (৩) হযরত 'আলী (রা.)-এর সময়ে (শাসনকাল

৩৬৭. 'আবদুর রহমান ইব্‌ন খলদুন, *মুকাদ্দমা ইব্‌ন খলদুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

৩৬৮. 'আলীমুদ্দীন নদিয়াভী, *মিহরাবের তত্ত্বসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩৭০. Ibid., P.40

৩৭১. শায়খ তোয়াহাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

৩৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) কুফার জামি' মসজিদে।[৩৭৩] মু'আবিয়ার আমলে (৬৬১-৬৮০খ্রি.) দামেস্কের জামি' মসজিদে। (৫) 'উকবা বিন নাফি' (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.)-এর কায়রোয়ান মসজিদে।[৩৭৪] (৬) 'আমর ইবনুল 'আস (রা) (মৃ. ৬৬৪ খ্রি.)-এর ফুসতাতের মসজিদে। 'আমর (রা.) ফুসতাতের মসজিদে মিহরাব তৈরি করেন এ উদ্দেশ্য যাতে এটি মক্কার কা'বার দিক নির্দেশ করে।[৩৭৫] আর ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কিবলা প্রাচীরে তিন বা ততোধিক মিহরাব স্থাপন। দিকালীর কিলআ-ই-কুহনার রাজকীয় মসজিদে পাঁচটি মিহ্‌রাব পরিদৃষ্ট হয়–যার নির্মাণ কাল ১৫৪২খ্রি.। ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে ও ১৬ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে ইরানী প্রভাব অধিকতর লক্ষণীয় হয়ে উঠে। এসময় ভারতীয় উপাদানের পরিবর্তে পারস্য দেশীয় নকশা-অলঙ্করণের স্থলাভিষিক্ত হয়।[৩৭৬]

প্রাথমিক ইসলামী যুগের বিজয়াভিযানের দায়িত্বে নিয়োজিত আরব সেনাপতিগণ ও সৈনিকগণ শিল্পকলার কোন অভিজ্ঞতা নিয়ে বিজিত অঞ্চলে প্রবেশ করেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যে স্থাপত্য বা শিল্পের কোন অবকাশ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর (৬৩২ খ্রি.) পর আশি বছরের মধ্যে তাঁর অনুসারিগণ হিজায থেকে বের হয়ে পশ্চিমে স্পেনের পিরেনিজ পর্বত মালা পর্যন্ত পূর্বে সিন্ধুর তীরবর্তী অঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার তাসখন্দ পর্যন্ত রোমান সম্রাজ্যের চেয়ে বিশালতম এলাকায় নিজেদের প্রভাব স্থাপন করেন। বিজিত অঞ্চলসমূহে মুসলমানগণ যেমন প্রাচীন স্থাপত্যের বহু নিদর্শন দেখতে পান তেমনি তাঁরা এসব অঞ্চলে সুদক্ষ কারিগরেরও সন্ধান পান। ৭০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলমানগণ মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থাপত্যিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।[৩৭৭] ৬২২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মদীনার মসজিদের কিবলা ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে মক্কার দিকে অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণে পরিবর্তিত হয়। তখন কিবলার দিকের দেয়ালে একটি পাথরের সাহায্যে মিহরাব চিহ্নিত হয়। আল্-ওয়ালীদের সময় ৭০৬-৭ খ্রি. পুনঃনির্মাণের সময় এতে মিহরাব পুনঃস্থাপিত হয়।[৩৭৮]

যা হোক নাসারাগণের মত মিহ্‌রাব তৈরি ইসলামে নিষেধ রয়েছে। তাছাড়া মসজিদে মিহরাব বৈধ এতে কোন বির্তক নেই।[৩৭৯] মিহরাব হল ইসলামী স্থাপত্যশিল্পের একটি অন্যতম নির্দশন। মিহরাব মসজিদের একটি অপরিহার্য অংশ ও কিবলা নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে ও ইসলামী স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মিহরাবের অভূতপূর্ব ভূমিকা রয়েছে।

---

৩৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

৩৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৩৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৩৭৬. ইসলামী বিশ্ব কোষ, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২৯০

৩৭৭. মফিজুলণ্ডাহ্ কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

৩৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

৩৭৯. আবূ মু'আয খালিদ বিন 'আবদুল 'আল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ মসজিদের মিম্বার

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান থেকে শুক্রবারের 'ইবাদতের অনুষ্ঠান একটু ভিন্নধর্মী। আর সেটা হ'ল খুৎবা প্রদান। আর জুমু'আ মসজিদে মিহ্রাবের সাথে মিম্বারেরও একটি সংযোজন রয়েছে-যাতে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব শুক্রবারের জাম'আতে খুৎবা প্রদান করে থাকেন।[৩৮০] 'আবদুল কাদের তৈয়ব বলেন, ''কর্তৃত্ব এরং নের্তৃত্ব ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এ অংশ হিসেবেই মসজিদের মিম্বার একটি শক্তিশালী প্রতীক''।[৩৮১] Matthew S. Gordon বলেন, ''Quite early on, the distinction emerged between small, local mosques and larger, congregational ones used not only for private prayer and study but also for the Friday communal session and weekly sermon (khutbah)''.[৩৮২]

মিম্বার শব্দের অর্থ

মিম্বার শব্দটি ر – ب – ن শব্দ থেকে উদ্গত। مِنبَرٌ শব্দে মীম অক্ষর যের যুক্ত হবে। النبرة শব্দের অর্থ ঠোঁটের উঁচু অংশ। আবার نبر শব্দের অর্থ হবে শরীর স্ফীত করা । প্রত্যেক উঁচু বস্তুকেও نبر বলা হয়। চিৎকার করা এবং সঙ্গীতের স্বর নীচু থেকে উঁচু করা। অল্প লজ্জাকেও نبر বলা হয়।[৩৮৩]

منبر শব্দের বহুবচন হল منابر । মিম্বার উঁচু স্থানকে বলে যা থেকে খতীব বা বক্তা বক্তব্য প্রদান করে থাকেন। খুৎবার সময় খতীবের স্বর উঁচু হয়ে থাকে বিধায় একে মিম্বার বলা হয়ে থাকে।[৩৮৪] Hughes বলেন, ''মসজিদের মিম্বার হল সেই স্থান যা থেকে খুৎবা পাঠ করা হয়। এটির তিনটি ধাপ থাকে। মসজিদের দেয়াল সংলগ্ন স্থানে থাকে এটি। কখনও কাঠের তৈরি হয়, যা স্থানান্তরযোগ্য। আবার কখনও ইটের বা লোহার তৈরিও হয়ে থাকে।''[৩৮৫] উপদেশ দেয়ার স্থান বা বিতর্ক করার উঁচু মঞ্চকে মিম্বার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আবার ঐ কাঠের সোপান বা সিঁড়িকেও মিম্বার বলা হয় যা থেকে মাতম (মরসিয়া) পাঠ করা হয়।[৩৮৬] 'مفتاح اللغات' এ বলা হয়েছে মিম্বার ঐ স্থান, যেখানে খতীব দাড়ায়।''[৩৮৭] বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, ''খুৎবা পড়বার সময় ইমামের তিন তাক বিশিষ্ট দাঁড়ানোর স্থানের নাম মিম্বার।[৩৮৮] 'The Oxford Dictionary of Islam'-এ

---

৩৮০. *Arechitecture of the Islamic World*, ed., George Michell, op,cit., P-36

৩৮১. Abdul Kader Tayob, *Islam: a short introduction*, One World Oxford, 2006, P-113

৩৮২. Matthew S. Gordon, *Islam*, Oxford University press, Newyork, 2002, P.76

৩৮৩. 'আলণ্ঢামা মজদুদ্দীন ফীর"যাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১

৩৮৪. *আল-মুনজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৫

৩৮৫. Thomas, Patrick Hughes, Op,cit., P-349

৩৮৬. মৌলভী ফীরূযুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯০

৩৮৭. মাওলানা আবূল ফাত্হ্ আল-'আযীযী, *মিফতাহুল লুগাত* পাকিস্ড়ন:(আরবী-উর্দূ অভিধান), কুর'আন মহল, তা. বি., পৃ. ৮১২

৩৮৮. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়েছে, ''মিম্বার হল মসজিদের মঞ্চ যা থেকে শুক্রবারের খুৎবা পরিবেশিত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও তাঁর খুৎবা পাঠ করেছেন ঐ মিম্বার থেকেই। আর এটি মিহ্রাব সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। [৩৮৯]

শব্দ উঁচু করা, ধমক দেয়া, দ্রুত উঠিয়ে নেয়া অর্থেও মিম্বার শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, হাদীসে বলা হয়েছে,"منبرى على حوضى" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার মিম্বার বা আমল থাকবে হাউযের উপরে। আর انبار বা আম্বার ফুরাত নদীর পূর্ব তীরের এক শহরের নাম।[৩৯০] মুসলমানদের মিম্বার হল যে স্থানে দাঁড়িয়ে ইমাম খুৎবা প্রদান করে। এটি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত একটি বাক্সের মত করে নির্মাণ করা হয়। সামনের ফাঁক বা মিম্বারের সামনের অংশ বন্ধ করে দেয়া হয়।[৩৯১]

যাই হোক যে স্থানে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব শুক্রবারের জুমু'আর খুৎবা প্রদান করে থাকেন, তাই মিম্বার নামে অভিহিত।

ইসলামে মিম্বারের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি সাধারণ মঞ্চে উঠে তাঁর খুৎবা পাঠ করতেন যাকে মিম্বার বলা হয়। ইসলামের পূর্ব যুগে এটিকে বিচারকের আসন (Seat) বলা হত যা ইসলামী যুগে জুমু'আর সালাতের প্রতীক হয়ে উঠে এবং এ মিম্বার সকল জুমু'আ মসজিদেই বিদ্যমান।[৩৯২] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় এ মসজিদ থেকেই তিনি নৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ও সমাজ গঠনমূলক বক্তব্য দিতেন তাঁর এ খুৎবাতে।[৩৯৩]

ধর্ম প্রচারক বা খতীব মিম্বারে উঠে হাতে একটি লাঠি বহন করে খুৎবা প্রদান করেন।[৩৯৪]

عن عبد الرحمن بن خالد وهو عدوانى عن ابيه انه ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائم على قوس اوعصاحين اثاهم.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও যখন খুৎবা প্রদান করার জন্য মিম্বারে আরোহণ করতেন, তখন হাতে একটি লাঠি বহন করতেন।[৩৯৫] ইসলামের পূর্বে বক্তা বা বিচারকের দু'টো প্রতীক ছিল সুতরা এবং মিম্বার। এ থেকেই এ দু'টো বস্তুর বিকাশ হয়।[৩৯৬] মিহ্রাব, মজলিস, সারীর, তাখত, অথবা কুরসী এক ও অভিন্ন। মসজিদের বেদি অর্থে শব্দটির ব্যবহার ইতিহাস থেকে নিঃসৃত। আরব দেশে অতীতে সাধারণত দাঁড়িয়ে ভাষণ দেয়া হত। প্রায়শ ধনুক বা বর্শা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতেন। অথবা আরোহিত পশু পৃষ্ঠে

---

৩৮৯. John l. esposito, *The Oxford Dictionry of Islam*. Newyork:Oxford University press, 2003 p. 201

৩৯০. 'আলণ্ডামা ওয়াহীদুজ্জামান, *লুগাতুল হাদীস*, পাকিস্ড়ান:কিতাবুন নূন, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, মারকাযুল 'ইলম ওয়া আদব, তা. বি., পৃ. ৮

৩৯১. Encyclopeadia of Britannica, Vol. vi, op.cit., P.7

৩৯২. Richard Ettinghausen and Oleg Gramber. op.cit., P.20

৩৯৩. Ibid., P.20

৩৯৪. Syed Mahmudul Hasan, *Glims of Muslim art and architecture*, Dhaka:Islamic foundation Bangladesh, 1983, P.70

৩৯৫. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক নীসাপূরী, তাহকীক ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফা আ'যামী, *সহীহ ইব্ন খুযাইমা*, ৩য় খ, আল্ মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরূত, ১৯৭৫, পৃ. ১৪

৩৯৬. Syed Mahmudul Hasan, *Glimps of Muslim art and architecture,* op.cit., P.70

Dhaka University Institutional Repository

উপবেশন করে ভাষণ দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রাথমিক অবস্থায় যখন তিনি মুসলমানদের মাঝে বক্তৃতা দিতেন, এমনকি মক্কা বিজয়ের দিনেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিয়েছিলেন।[৩৯৭]

ইসলামে মিম্বারের প্রচলন বা বিকাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।[৩৯৮] আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উটের পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন। মদীনার মসজিদে প্রথম ইসলামী মিম্বারের সূচনা হয়।[৩৯৯] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জুমু'আর দিনে মিম্বারে উঠে দু'টো খুৎবা প্রদান করতেন। দু'টো খুৎবার মাঝে অল্প সময় বসতেন।[৪০০] রাসূলুল্লাহ্ (সা.), আবূ বকর (রা.) (খিলাফাতকাল ৬৩২-৬৩৪ খ্রি.). হযরত 'উমর (রা.) (খিলাফাতকাল ৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)-এর সময় জুমু'আর দিনে ইমাম যখন মিম্বারের উপর বসতেন তখন প্রথম 'আযান দেয়া হত। অতঃপর 'উসমান (রা.) (খিলাফতকাল ৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) খলীফা হলেন এবং যখন লোকসংখ্যা বেড়ে গেল তখন তিনি মদীনা সংলগ্ন জাওরা নামক বাজারের একটি স্থান থেকে তৃতীয় 'আযান বৃদ্ধি করেন।[৪০১]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় মসজিদুন নববীতে মিম্বার সংস্থাপিত হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি খুঁটির উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করতেন। যখন তাঁর জন্য মিম্বার সংস্থাপিত হ'ল তখন খুঁটিটি ক্রন্দন করা শুরু করলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মিম্বার থেকে নেমে এসে এর উপর হাত বুলালেন।[৪০২] তখন এটি চুপ করে রইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি এটির কান্না বন্ধ না করতেন তবে এটি কিয়ামত পর্যন্ত ক্রন্দন করতে থাকত। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও চিন্তিত থাকতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশে খুঁটিটি পোতে ফেলা হয়।[৪০৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এই মসজিদুন নববীতে প্রথম মিম্বারে উঠে খুৎবা প্রদান করেন। ঐ সময় মিম্বার ছিল দুই তাক বিশিষ্ট এবং বহন করা যেত এমন হালকা।[৪০৪] আস্তে আস্তে স্থায়ী মিম্বার বসানো শুরু হয়। পরবর্তীতে এটি কাঠের মিম্বারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং মিম্বার লোহা, পাথর, সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা শুরু হয়। এমনকি মিম্বার কারুকার্য কাপড় দিয়েও সুশোভিত করে ঢেকে রাখার প্রথা প্রর্বতন হয়।[৪০৫] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদুন নববীতে মুসাল্লার ডানপার্শ্বে খেজুরের খুঁটিটিতে হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে তাঁকে দূর থেকে দেখা যেত না। তাই সাহাবীগণ একটা কিছু নির্মাণ করতে আবেদন করলেন যাতে খুৎবা প্রদানের সময় তাঁকে দূর থেকে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীগণকে একটি মিম্বার নির্মাণ করতে আদেশ দেন। তখন তামীমুদ-দারী একটি মিম্বার প্রস্তুত করে

---

৩৯৭. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৩৯৮. দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়া (উর্দূ বিশ্বকোষ), ২০তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪২

৩৯৯. প্রাগুক্ত, ২০ তম খণ্ড, পৃ. ৬৪৩

৪০০. আবূ বকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক নীসাপূরী, তাহকীক ড. মুহাম্মদ মুস্ত্ফা আ'যামী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪২

৪০১. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল জুমু'আ, পৃ. ১২৪

৪০২. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জুমু'আ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫

৪০৩. আবূ বকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক নীসাপূরী, তাহকীক, ড. মুহাম্মদ মুস্ত্ফা আ'যামী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪০

৪০৪. *Encyclopaedia of Britannica*. op.cit., vol. 6, P. 907

৪০৫. Ibid., Vol. 6, P. 907

Dhaka University Institutional Repository

দিলেন।[৪০৬] আবার একথাও বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) (মৃ.৬৮৭ খ্রি.)-এর গোলাম কিলাব রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য মিম্বার তৈরি করে দিয়ে ছিলেন। হযরত 'আলী ইব্ন কা'ব বলেন যে, এক আরামী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে একটি মিম্বার তৈরি করে দিয়েছিলেন।[৪০৭]

৬৭০ খ্রি. মু'আবিয়া (রা.) (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে নির্মিত কাঠের মিম্বারটি নিজের সঙ্গে করে সিরিয়ায় নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে এটি করতে দেয়া হয়নি।[৪০৮] উমাইয়াগণের নিজস্ব একটি মিম্বার ছিল। মু'আবিয়া (রা.) তা মক্কায় ভ্রমণকালে নিজের সঙ্গে এনেছিলেন। মু'আবিয়া (রা.) কর্তৃক নির্মিত মিম্বারটি খলীফা হারুন-অর-রশীদের সময় (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ৬৮৬-৮৭ অথবা ৭৯০-৯১ খ্রি. হজ্জ উপলক্ষে খলীফা হারুন-অর-রশীদ মক্কা ভ্রমণকালে মিসরের শাসনকর্তা তাঁকে নয় ধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বার (منقوش) 'মানকূশ' বা নকশা উপহার দেন এবং আগের পুরাতন মিম্বারটি আরাফাতের ময়দানে স্থাপন করা হয়েছিল। মক্কার মিম্বারটিও স্থানান্তর যোগ্য ছিল। এটি মাকামের কাছে থাকত। খুৎবার সময় যথাস্থানে সংস্থাপিত হত। আল-বাতাতূনীর মতে, সুলতান প্রথম সুলায়মান কর্তৃক ১৫৫৪-১৫৬৬ মাকামের উত্তর দিকে একটি মার্বেলের মিম্বার প্রস্তুত করা পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।[৪০৯] হযরত 'উমর (রা.)-এর মৃত্যুর (৬৪৪ খ্রি.) পর 'আমর ইবনুল 'আস (মৃ. ৬৬৩ খ্রি.) একটি মিম্বার ব্যবহার করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আল-হাকিম কর্তৃক ১০১৪ খ্রি. 'আমরের মসজিদে একটি নতুন বৃহৎ মিম্বার স্থাপিত হয়েছিল। অন্যান্য স্থানের শহরগুলোর জামি' মসজিদে মিম্বার স্থাপনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি পাওয়া যায়নি। মিম্বার ছিল শাসকের প্রতীক এবং শাসনকর্তার প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর উহার উপর উপবেশন করতেন। মিম্বার জুমু'আ মসজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত। যেখানে জনগণের সম্মুখে সরকারিভাবে ভাষণ প্রদান করা হত। তাই বুঝা গেল ৬৮৩ খ্রি. সকল প্রদেশের মসজিদেই মিম্বার ছিল। এ বছর রাজধানী নগরসহ হিজায, মিসর, সিরিয়া, জাযীরা, ইরাক, খুরাসান এবং অন্যান্য শহরে অবস্থিত মিম্বার হতে আনুগত্যের ঘোষণা প্রদান করা হয়েছিল। প্রথম, দ্বিতীয় শতকের শুরুতে ছোট ছোট শহরের মসজিদসমূহে শাসনকর্তাগণকে লাঠি হাতে খুৎবা প্রদান করতে দেখা যায়। ৭৪৯-৫০ খ্রি. মিসর প্রদেশসমূহে গর্ভনর 'আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) মিম্বার স্থাপন করেন।[৪১০] কা'বা যেরূপ আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ মিম্বারের উপরেও অল্পকালের মধ্যেই আচ্ছাদিত করা হয়। কথিত আছে যে, হযরত 'উসমান (রা) (সময়কাল ৬৪৪-৬৫৫ খ্রি.) সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিম্বারে একটি কাতীফা বা চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। মু'আবিয়া (রা.) (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) অনুরূপ করেছিলেন। আব্বাসীয়গণের আমলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ্

৪০৬. মুহাম্মদ 'আবদুল মা'বূদ। *তারীখে মদীনা মুনাওয়ারা* (উর্দূ), লাহোর: মাকতাবা রাহমানীয়া, তা. বি., পৃ.৩৯৭

৪০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

৪০৮. আবূল হাসান 'আলী বিন মুহাম্মদ আল-জাযারী, তাহকীক খায়রী সা'ঈদ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮

৪০৯. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৫

৪১০. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

(সা.)-এর মিম্বারের জন্য বাগদাদ হতে একটি নতুন কিসওয়া প্রেরিত হত। সুলতানগণ মাঝে মাঝে অনুরূপ করতেন।[৪১১]

উচুঁ মিম্বারের প্রথম সূচনা হয়েছিল মিসর, বিজেতা 'আমর ইবনুল 'আস (মৃ. ৬৬৩ খ্রি.)-এর সময় যখন তিনি ফুসতাতের (কায়রোতে) মসজিদ নির্মাণ করেন (৬৪১-৪২ খ্রি.)। আরবের চিত্র শিল্পীগণ (Craftsman) মিম্বরের সৌন্দর্য উদ্ভাবনের নিমিত্তে দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল। যাদের মধ্যে অনেক দক্ষ শিল্পী ছিলেন। এ ধরনের মিম্বারের মধ্যে সুলতান হাসানের নির্মিত মসজিদ (১৩৬২ খ্রি.) কায়রোতে শ্রেষ্ঠকীর্তি হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কায়রোর কায়টবে (Quit Bay) মসজিদের মিম্বারটি (১৪৬৮-১৪৯৬ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য। মিম্বারটি লন্ডনের ভিক্টরিয়া এবং আলবার্ট যাদুঘরে রক্ষিত আছে।[৪১২]

মিম্বারের ধর্মীয় গুরুত্ব

আজকাল অনেক স্থানের মসজিদে কাঠের মিম্বারের পরিবর্তে লোহা, ইটের মিম্বার সংস্থাপিত হতে দেখা যায়। আধুনিক কালে অনেক স্থানের মিম্বারে চাকাও সংযোজন করা হচ্ছে। আর এ মিম্বার বড় বড় মাঠে জামা'আত বা বড় বড় ধর্মীয় সমাবেশ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পদ্ধতিটি উমাইয়া যুগ থেকে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) চলে আসছে।[৪১৩] ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদের মিম্বার ছিল সিংহাসনের মত যাতে শাসকগণ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর বক্তব্য প্রদান করতেন, তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করতেন। মাঝে মাঝে সন্ধিও সম্পাদিত হত। এ অবস্থায় মসজিদ রাজনৈতিক, কার্মকাণ্ডের সূতিকাগারে পরিণত হয়।[৪১৪] মসজিদে মিম্বার সংস্থাপিত থাকবে কিবলা দেয়ালের সাথে, প্রথম কাতারের সামনে এককভাবে। কোন কাতারের সঙ্গে মিম্বার সংস্থাপিত থাকবে না। কারণ খতীব মিম্বারে বসবে, জনগণ তাঁর কথা শ্রবণ করবে। তাই মিম্বার প্রথম কাতারের সামনে একটু দূরে সংস্থাপিত হবে।[৪১৫]

খলীফা আল-মাহ্দী ৭৭৭-৭৮ খ্রি. মিম্বারের উচ্চতা কমিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিম্বারের সমান করতে আদেশ দেন। এতে বুঝা গেল তখন মিম্বার বেশ উচুঁ ছিল। যেমন বসরার মসজিদের মিম্বারটি ছিল ৩.৯০ মিটার উচুঁ। ইসলামী ঐতিহ্যের প্রাথমিক পর্যায় নির্মিত একমাত্র মিম্বারটি তিউনিসিয়ার কায়রোয়ান মসজিদে বিদ্যমান। সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মিত এগারটি ধাতু বিশিষ্ট ৩.৩১ মিটার উচ্চ এ মিম্বারটি কাষ্ঠ খোদাই চারুশিল্পের একটি অন্যতম নিদর্শন। আসলায়ী রাজ বংশীয় আমীর আল-ইবরাহীম আহমদ (৮৫৬-৮৬৩ খ্রি.) বাগদাদ হতে উহা আনয়ন করেন এবং সম্ভবত ৮৬২-৬৩ খ্রি. উহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।[৪১৬]

---

৪১১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৬

৪১২. Stephan and Nandy Ronart, Concise *Encyclopaedia of Arabic civilization*, Netherland: Djambatan Armsterdam, 1995, P.371

৪১৩. Reberf Helien Brand, op.cit., P.47

৪১৪. Ibid., P.48

৪১৫. আবূ হামীদ মুহাম্মদ গাজ্জালী, *ইহ্ইয়াউ 'উলূমুদ্দীন*, মিসর:দার ইব্ন হায়সাম, ২০০৪ খ্রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩

৪১৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন যুগে ইরান দেশে মিম্বার বিদ্যমান ছিল না। তবে ইব্ন ফুনদুক বলেন, তিনি আদীনা মসজিদে ৮৭৯ খ্রি. একটি মিম্বার দেখতে পান। যার গায়ে খুরাসানের গভর্নর আহমদ আল- খুজিস্তানের নাম উৎকীর্ণ ছিল। সর্ব প্রাচীন মিম্বার হল 'উশরার নগরের জামি' মসজিদের মিম্বার যাতে মে-জুন ১০৫৩ খ্রি. তারিখ লিখিত রয়েছে। এ মিম্বারটি তারকা ও বহুভূজ আকৃতির ফলক দ্বারা (panel) অলঙ্কৃত। এটি একটি প্রধান নিদর্শন। ৫ম/১১শ শতাব্দী থেকে মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক ও অন্যান্য ইসলামী দেশসমূহে মিম্বার প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৪১৭]

বাস্তবে ইসলামী মিম্বারের সূচনা হয়েছিল মদীনার মসজিদ প্রতিষ্ঠার ছয় বছর পর (৬২৭-৬২৮ খ্রি.)। খলীফা 'উমর (রা.) অন্যান্য মসজিদে মিম্বার সংস্থাপনের অনুমোদন দেননি। এমনকি প্রাদেশিক গভর্নর 'আমর বিন আল্-'আস কতৃর্ক নির্মিত ফুসতাতের (৬৪১-৬৪২খ্রি.) মসজিদের মিম্বারটি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।[৪১৮]

মসজিদের মিম্বারের প্রধান কাজ হল শুক্রবারের জুমু'আর খুৎবা পরিবেশন করা। আর শুক্রবারের খুৎবা প্রদান-এটা সালাতের একটি অভিন্ন অংশ। এতে রাজনৈতিক বিষয়াবলীও আলোচনা করা হয়। বস্তুত পূর্বে মিম্বারের খুৎবাতে শাসকের বৈধতার দাবিও করা হত। খুৎবাতে পূর্বে শাসকের নামও উল্লেখ করা হত।[৪১৯] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সময়ের চাহিদা অনুযায়ী খুৎবা প্রদান করতেন। কারও অভাব-অনটন দেখলে তিনি সদকা ও দান-খয়রাত ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে মিম্বারের খুৎবা পরিবেশন করতেন।[৪২০]

সকল খলীফাগণের কাছেই মিম্বার ইসলামের প্রতীক হয়ে উঠে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তখনকার সময়ে প্রাদেশিক গর্ভনরগণও প্রধান শাসকের কৌশল ব্যবহার করতে থাকেন। অতঃপর আস্তে আস্তে মিম্বারের খুৎবা ইহার রাজনৈতিক অবস্থা, তত্ত্বমূলক আলোচনা হারিয়ে ফেলে। তখন খুৎবার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে থাকে। আব্বাসীয় খলীফাগণের সময় থেকে (৭৫০-১২৫৮খ্রি.) খুৎবা শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই দেয়া হত।[৪২১] আসলে ইমাম সাহেবের ব্যবহৃত মিম্বার ও মিহ্রাবের পাশাপাশি অবস্থান তাঁদের পারস্পরিক পরিচিতি ব্যক্ত করে।[৪২২]

ইমাম সাহেব মিম্বারের খুৎবাতে আল্লাহ্র যিক্র, সকলকে তাকওয়া সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির ভীতি প্রদর্শন, কুর'আন পাঠ ও মুসলমানগণকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতে

---

৪১৭. প্রাগুক্ত, ১৯শ খ, পৃ. ৯২

৪১৮. 'আবদুর রহমান ইব্ন খালদুন, *মুকাদ্দমা ইব্ন খলদুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫; Mahmudul Hasan, *Mosque architecture of Pre- Mughal Beagal,* op.cit., P.15

৪১৯. Robert Helien Brand, op.cit., P. 46

৪২০. সায়্যিদ সাবিক, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৯৩

৪২১. Encyclopaedia of Britannica, op,cit., Vol-6, P.907

৪২২. Architecture of the Islamic World, op.cit., P.37

Dhaka University Institutional Repository

হবে। এর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের ব্যাপারে, নবী (সা.)-এর বিষয়ে এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতে হবে। কারণ খুৎবা হল অন্যতম ধর্মীয় নিদর্শন।[৪২৩]

ফাতেমীয় (শাসনামল ৯০৯-১১৭১খ্রি.) শাসকগণ ধর্মীয় দিক খুবই গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা মিম্বারে হস্তলিখিত দিওয়ান আল্-ইনশা হতে খুৎবা পাঠ করতেন।[৪২৪] খলীফা হারুন-অর-রশীদ (শাসনকাল ৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) প্রথম অপর কর্তৃক তৈরিকৃত খুৎবা থেকে মুখস্থ খুৎবা প্রদান করেন।[৪২৫] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিম্বারের খুৎবা দেয়ার সময় চোখ লাল হয়ে যেত, তাঁর স্বর উঁচু হয়ে যেত এবং তেজস্বিতা বৃদ্ধি পেত। যেন তিনি কোন সৈন্যদলকে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, তোমার জন্য এটাই মূহূর্ত।[৪২৬] হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, " ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم. " অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মিম্বারে উঠে সালাম প্রদান করতেন।[৪২৭] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মিম্বারে উঠে খুৎবা দেয়ার সময় কুর'আন পাঠ করতেন। খুৎবা শেষ করতেন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৪২৮] তাই ইমাম সাহেব যখন মিম্বারে উঠে খুৎবা প্রদান করতে থাকেন ঐ মূহূর্তে মুসল্লীগণকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) চুপ থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন।[৪২৯] জুমু'আর সালাত মিম্বারের খুৎবা ব্যতীত বৈধ হবে না। কারণ জুমু'আর সালাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের প্রবর্তন করা হয়েছে।[৪৩০] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর জীবনে খুৎবা ব্যতীত কোন জুমু'আর সালাত আদায় করেননি।[৪৩১] মিম্বারের উপরে প্রত্যেক খতীবের জন্য খুৎবা শর্ত। সে খলীফাই হোক অথবা অন্য কেউ। কারণ শ্রোতাগণ এতে সালাতের কার্যাবলীর শিক্ষা পায়। আর মিম্বার এ জন্যই যে, খতীবকে শ্রোতাগণ ও দর্শকগণ দেখতে পারে ও তাঁর কথা শ্রবণ করতে পারে।[৪৩২]

এ কথা অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, মিম্বারের খুৎবা হল শরী'আতের বিধান। এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং মনের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয়। আর খুৎবার প্রাণ হল বাস্তবে তা-ই। মিম্বারে উঠে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) উপর দরূদ পাঠ করতে হবে।[৪৩৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের (রা.) খুৎবা ছিল পূর্ণাঙ্গ ও পর্যবেক্ষণমূলক খুৎবা। এতে হিদায়াতের যিম্মাদারী ছিল। এমনভাবে ঈমান, তাওহীদ, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান মানবের ভালবাসায় পরিপূর্ণ খুৎবায় অন্তর ভরে

---

৪২৩. শাহ্ ওয়ালিয়ুলণ্ঢাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী, *হুজ্জাতুলণ্ঢাহিল বালিগা*, ২য় খণ্ড, গাউসিয়া পাবলিকেশন্স, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৫২ পৃ. ৩০

৪২৪. Salahuddih Khuda Baksh and D.S. Margoliouth, op.cit., P.319

৪২৫. Ibid., P.318

৪২৬. ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ, *যাদুল মা'আদ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১

৪২৭. মুহাম্মদ বিন 'আলী আশ্-শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, আবওয়াবুল জুমু'আ, ৩য় খণ্ড, দারুল হাদীস, মিসর, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২৭৩; 'আবদুলণ্ঢাহ্ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৪২৮. ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *যাদুল মা'আদ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১

৪২৯. মুহাম্মদ বিন 'আলী আশ্-শাওকানী, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩

৪৩০. আবূ বকর জাবির আল্-জাযায়িরী, *মিনহাজুল মুসলিম*, মাকতাবাতুস সাফা, মিসর, ১৪২৩/২০০১, পৃ. ১৯৫

৪৩১. মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান, *তানযীমুল আশতাত* (উর্দূ), ১ম খণ্ড, আল হেলাল প্রকাশনী, হাটবাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬১

৪৩২. ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১

৪৩৩. সায়্যিদ সাবিক, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

যেত। আর আজকাল মিম্বারের খুৎবাতে এ সমস্ত বিষয়াবলী সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত ও অনুপস্থিত। মিম্বারের খুৎবার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।[৪৩৪]

মিম্বার নেতৃত্বের প্রতীক

মুসলিম উম্মাহর বাস্তব প্রয়োজন ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা এবং 'ইবাদত-বন্দেগি, লেন-দেন, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সকল পর্যায়ের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করাই হচ্ছে শুক্রবারের মসজিদের মিম্বারের খুৎবার একমাত্র উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা.), সাহাবীগণ (রা.), তাব্'ঈন, তাব্-তাব্'ঈন, সাল্ফ-সালেহীন সকলেই এ খুৎবাতে আনুষ্ঠানিক, স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের আলোচনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম মিল্লাতের খুৎবার প্রয়োজনীয় বিষয় পেশ করা রীতিমত বন্ধ হয়ে যায়। শুধু খুৎবা রসম-রিওয়াজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়া ইসলাম বিরোধী চক্র যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তখন ইসলামকে শুধু রোযা, নামাযের জন্য সীমাবদ্ধ করে রাখে। তখন মসজিদে মসজিদে পঠিত হতে থাকে শুধু গদ-বাধা খুৎবা।[৪৩৫] সুতরাং বুঝা গেল মিম্বারে প্রদত্ত শুক্রবারের জুমু'আর খুৎবা মুসলিম জাতির জন্য খুবই তাৎপর্যবহ। খুলাফা রাশিদীনের সময়কালেও (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) মিম্বারে উঠে দু'আ করা হত। খুৎবায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর দরুদ, সাহাবীগণের জন্যও দু'আ করা হত। 'আমর ইবনুল 'আস (মৃ. ৬৬৩ খ্রি.) যখন মিসরের জামি' মসজিদে মিম্বার স্থাপন করেন তখন তিনি খলীফাগণের জন্য প্রথম দু'আ পঠনের রীতি চালু করেন।[৪৩৬]

মিম্বারের খুৎবায় যে ভাবে কর্তৃত্ব প্রদান করে ইসলামের অন্য কোন নির্দশনই এর মত নহে।[৪৩৭] মিম্বারের নের্তৃত্বের তাৎপর্য এই যে, মসজিদে গভীর চিন্তার সঙ্গে খুৎবা উপযোগী করে প্রদান করতে হয়। অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয় 'ইবাদতের বিষয়াবলী এবং ধর্ম প্রচারের বিষয়াবলী। যখন খতীব খুৎবা প্রদান করেন তখন শ্রোতাদের সামনে উচ্চ সিঁড়িতে আরোহণ করে খুৎবা দেন তাঁর অনুসারিগণকে। তিনি সালাতও পরিচালনা করেন এবং মিম্বারের খুৎবাতে ও ভাষণ প্রদান করেন। মসজিদের এ দু'স্থানের কাজ পরিচালনা করার কারণে মৌলিকভাবে ইহা বিভিন্ন নেতৃত্বের আভাষ প্রদান করে।[৪৩৮] আর মিম্বারের খুৎবাই হল শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রতীক।[৪৩৯] মদীনাতে ইসলামের যখন শিশু অবস্থা তখন মসজিদে ছিল মাত্র একটি মিম্বার এবং এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ যবানীতে খুৎবা দিতেন। কিন্তু তার ওফাতের পর (৬৩২ খ্রি.) যখন আরব সম্রাজ্য বিস্তৃত হতে লাগল মসজিদের সংখ্যাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেল তখন ইমামগণ শুধু 'ইবাদতের সম্পর্কেই খুৎবা দিতেন। রাজনৈতিক ব্যাপার খুর কমই খুৎবাতে গুরুত্ব পেত।[৪৪০] যুগ

৪৩৪. প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৩৭০

৪৩৫. অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৪৩৬. 'আবদূর রহমান ইব্ন খলদুন, *মুকাদ্দামা ইব্ন খলদুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. 214

৪৩৭. Abdul Kader Tayob, op.cit., P.114

৪৩৮. Ibid., P.114

৪৩৯. Ibid., P.115

৪৪০. Sir Thomas w. Arnold, *The Caliphate*, Delhi:Adam publishers and distributors, Shandar market, 1994, reprinted, P. 38.

Dhaka University Institutional Repository

যতই অতিক্রান্ত হচ্ছে, মানুষের অন্তর থেকে সত্যের আলো ততই নিভে যাচ্ছে। বর্তমান যুগে বিশেষ করে বাংলাদেশের অবস্থা ভয়-ভীতিকর কুসংস্কারাচ্ছন্ন আবাস ভূমির ন্যায় হয়ে পড়েছে।[৪৪১]

জামা'আত ও মসজিদে সমবেত হওয়ার জাতীয় উদ্দেশ্যকে সফল করার নিমিত্তে জুমু'আর খুৎবাকে অর্থবহ ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সচেতন হতে হবে। এ জন্য সচেতন, কুর'আন-সুন্নাহর পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী, চরিত্রবান, মসজিদ পরিচালনায় ও মুসলিম সমাজ পথ-প্রদর্শনে সক্ষম ও যোগ্যতা সম্পন্ন ইমাম নিয়োগ দিতে হবে। ইমাম সাহেবকে মাতৃভাষায় মিম্বারের খুৎবা পরিবেশন করার দক্ষতা থাকতে হবে।[৪৪২] জুমু'আর দিনে মিম্বারের খুৎবাতে সঠিকভাবে খুৎবা প্রদান করতে পারলে জাতি ইসলামী জাগরণে উজ্জীবিত হয়ে সঠিক পথের সন্ধান পাবে এবং অন্ধকার থেকে আলোর পথ পাবে।

৪৪১. আবূ মজহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী, *খুতবাতুত-তাওহীদ*, ওয়াস সুন্নাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ক, (ভূমিকা)।

৪৪২. অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ মসজিদের ক্রমবিকাশ

ইসলামী স্থাপত্য রীতির উদ্ভবে মসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে মসজিদের স্থান সর্বাগ্রে। মুসলিম অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে যুগে যুগে বিশ্বে মসজিদ নির্মাণ হয়েছে। মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অন্যান্য উপাসনালয় অপেক্ষা মসজিদ ঘর বিশাল আকারের এবং আলো-বাতাস প্রবেশের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে মসজিদ ঘর তৈরি। হৃদয়হীন কুরায়শ গোত্রের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাহাবীগণ ও পরিবার পরিজনসহ রাসূলুল্লাহ (সা.) জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন (৬২২ খ্রি.)।[৪৪৩] আর মদীনাতেই রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম মসজিদ ঘর নির্মাণ করেন (৬২২ খ্রি.)। মদীনায় নির্মিত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মসজিদের অনুকরণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানগণ মসজিদ নির্মাণ করেছেন। ইসলাম সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে। হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) মুসলিম সম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যে বায়জানটাইন ও সাসানীয় সম্রাজ্যদ্বয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এর ফলে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামের আধিপত্য বিস্তার হয়।[৪৪৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও খুলাফা রাশিদীনের যুগে (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) মসজিদের বিকাশ

রাসূলল্লাহ (সা.)-এর যুগে নবুয়াতকাল (৬১০-৬৩২ খ্রি.) বিভিন্ন গোত্রে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রত্যেক কবীলাতেই মসজিদ স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ মসজিদসমূহে শুধু সালাত সম্পাদনই হত না বরং দৈনিক পাঁচবার মসজিদসমূহে জমায়েত হয়ে মুসলমানদের সামাজিক কার্যকলাপ আলোচনা করা হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে শুধু মদীনাতেই নয়টি মসজিদ ছিল। যথা:- (১) মসজিদু বনী 'উমর (২) মসজিদু বনী সা'য়িরা (৩) মসজিদু বনূ সালমা (৪) মসজিদু বনী 'উবায়দা (৫) মসজিদু বনূ রায়েহ (৬) মসজিদু বনূ যুরায়ক (৭) মসজিদু গিফার (৮) মসজিদু আসলাম (৯) মসজিদু যুহায়না।[৪৪৫]

এছাড়াও বিভিন্ন গোত্র আরও অনেক মসজিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। নিম্নে মসজিদসমূহের নাম বিবৃত হল: (১) মসজিদু বনূ খাদা-রা (২) মসজিদু বনূ উম্মিয়া (৩) মসজিদু বনূ বাইয়াযা (৪) মসজিদু বনূ হাবালা (৫) মসজিদু বনূ 'আসিয়া (৬) মসজিদু আবূ কায়সালা (৭) মসজিদু বনূ দীনার (৮) মসজিদু উবাই বিন্ কা'ব (৯) মসজিদু নাবিগা (১০) মসজিদু ইব্ন 'আদী (১১) মসজিদু বিল হারিস বিন খাজরায (১২) মসজিদু বনূ হাতমাহ্ (১৩) মসজিদুল ফাসীহ (১৪) মসজিদু বনূ হারিসা (১৫) মসজিদু বনূ যাফর (১৬) মসজিদু বনূ 'আবদুল আশহাল (১৭) মসজিদু ওয়াকিম (১৮) মসজিদু বনূ মু'আবিয়া (১৯)

৪৪৩. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা:সুবর্ণ, ২০০১ খ্রি., পৃ. ১১

৪৪৪. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *বাংলাদেশের মসজিদ: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন*, পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ খ্রি., পৃ.১৬

৪৪৫. 'আলণ্ঢামা শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী (উর্দূ)*, ২য় খণ্ড, পাকিস্ড়ন:দারুল হাদীস, মুলতান, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদু বনূ কুরায়যা (২০) মসজিদু বনূ ওয়ায়িল (২১) মসজিদু সাজরাহ।[৪৪৬] ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে মদীনার বাইরেও অনেক মসজিদ নির্মাণ হয়েছে। এসব মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত 'আযান দেয়া হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনের পর 'আযানের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সৈন্যদলকে ওসীয়ত করতেন যদি কোথাও মসজিদ দেখ অথবা 'আযানের শব্দ শুনতে পাও তবে সেখানে আক্রমণ করবে না। মসজিদুন নববীর পর সর্ব প্রথম জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাহ্রায়নের 'আব্দুল কায়েস গোত্রের এক মসজিদে। এভাবে ইসলাম সম্প্রসারণের সাথে সাথে আরবের বাইরেও মসজিদ ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করে।[৪৪৭] যুলহুলায়ফাতেও রাসূলুল্লাহ্ (রা.)-এর সময় একটি মসজিদ ছিল। বাতহা নামক স্থানেও একটি মসজিদ ছিল। রাওহা নামক স্থানে একটি ছোট মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাত আদায় করেছেন। রুয়াইসার নিকটবর্তী একটি টিলাতেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাত আদায় করেছেন। সেখানেও একটি মসজিদ রয়েছে।[৪৪৮]

৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সকল স্থানে সালাত আদায় করেছেন সাহাবীগণ (রা.) বরকতের নিয়তে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। মসজিদগুলো হচ্ছে- (১) মসজিদুল কুবা (২) মসজিদুল ফসীহ (৩) মসজিদু বনূ কুরায়যা (৪) মুশাররাবায়ে ইব্রাহীম (৫) মসজিদু বনূ যূফর (৬) মসজিদু বাগলা (৭) মসজিদু বনূ মু'আবিয়া (৮) মসজিদুল ফাতহ্ (৯) মসজিদু কিবলাতায়ন।[৪৪৯]

এছাড়াও মদীনা থেকে তাবূক পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রসিদ্ধ কয়েকটি মসজিদ ছিল। মসজিদসমূহের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল:- (১) মসজিদু তাবূক (২) মসজিদু মাদরান (৩) মসজিদু যাতুয যুরাব (৪) মসজিদু বিল আখযার (৫) মসজিদু বিশ-শাক (৬) মসজিদু যিল জায়ফা (৭) মসজিদু বিসদার হাওযী (৮) মসজিদু বিল হাজার (৯) মসজিদু বিস্ সা'ঈদ (১০) মসজিদু বিওয়াদিল কুরা (১১) মসজিদু বির রুক'আ শাক্কা বনী ওযরা (১২) মসজিদু যিল মারওয়া (১৩) মসজিদু ফায়ফা (১৪) মসজিদু যিল খাশাব।[৪৫০]

রাসূলুল্লাহ (রা.)-এর নিকট যখনই কোন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আসত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখানেই মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ও চতুর্দিকে মসজিদের বিকাশ হতে থাকে। তালক ইব্ন 'আলী (রা.) যখন প্রতিনিধি দলের সাথে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসুলল্লাহ (সা.) তাঁর গোত্রের গির্জাটিকে ভেঙে মসজিদ-এ রূপান্তরিত করার নির্দেশ প্রদান করেন।[৪৫১] রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর জীবদ্দশায় বিদ্যমান মসজিদের মধ্যে

---

৪৪৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১

৪৪৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১

৪৪৮. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০-৭১

৪৪৯. 'আলণ্ঢামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩

৪৫০. 'আবদূর রউফ দানাপুরী, *আসাহুস সিয়ার*, দেওবন্দ ভারত: কুতুবখানা না'ঈমিয়্যাহ, তা. বি., পৃ.৩৩৬

৪৫১. ওয়ালিয়ুদ্দীন মুহাম্মদ আল-খাতিব আত্ তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কিতাবুস সালাত, বশীর হাসান এন্ড সন্স, লোরচিটপুর রোড, কলিকাতা, তা. বি., পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

আল্-ফাত্হ অন্যতম। মদীনার পশ্চিম দিকে সাল'আ পর্বতমালার পাদদেশে এ মসজিদটি অবস্থিত।[৪৫২] পাথরের ভিত, কাঁচা ইটের দেয়াল ও খেজুর শাখার ছাদ বিশিষ্ট এ মসজিদের দক্ষিণ দিকে ৮ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩ মিটার প্রস্থ একটি স্তম্ভ ছিল। ১২ তাক বিশিষ্ট একটি সিঁড়িও এতে ছিল। হুসায়ন ইব্ন লাহিজা ১১৭৯ খ্রি. মসজিদটি সংস্কার করেন।

মসজিদ- এ কিবলাতায়নও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। মদীনা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪০ মিনিটের পায়ে হাঁটার পথ। রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ মসজিদে সালাত রত অবস্থায় কিবলা পরিবর্তন হয়ে কা'বার দিকে হয়েছিল। ১৪৮৮ খ্রি. শাহীন জামালী মসজিদটি সংস্কার করেন এবং ১৫৪৩ খ্রি. তুর্কী সুলায়মান পুনঃসংস্কার করেন। মসজিদ-এ মুসাল্লা বা গামামা মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ২৬ মিটার, প্রস্থ ১৩ মিটার, উচ্চতা ১২ মিটার এবং দেয়ালের স্থূলতা দেড় মিটার। এতে ছয়টি গম্বুজ বিদ্যমান। এর ভেতরে মিহরাব ও মিম্বার রয়েছে। উত্তর দেয়ালের সন্নিকটে মুবাল্লিগগনের জন্য প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। এখানে উন্মুক্ত প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) দু' 'ঈদের সালাত আদায় করতেন। এজন্য এর নামকরণ হয় মুসাল্লা।[৪৫৩] রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর আগমনের পর অদ্যাবধি মুসলমানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এর সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই।[৪৫৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় মদীনাতে ও মদীনার বাইরে নির্মিত মসজিদসমূহে ইমামতি করতেন রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক মনোনীত সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। বড় বড় অঞ্চলে অনেক সময় ইমাম ও কর্মচারী আলাদা ছিল। নিম্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় বিভিন্ন মসজিদে যে সকল ইমাম ছিলেন তার একটি তালিকা গোত্র অনুসারে নিম্নে প্রদত্ত হল:-[৪৫৫]

ইমাম	**মসজিদের নাম**
১) হযরত মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা.) (মৃ. ৬২৫ খ্রি.)	মদীনা মুনাওয়ারা
২) হযরত সালিম (রা.) (মৃ. ৬৩৩ খ্রি.)	মদীনা মুনাওয়ারা
৩) ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.) (মৃ. ৬৪৪ খ্রি.)	মদীনা মুনাওয়ারা
৪) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) (মৃ. ৬৩৪ খ্রি.)	মদীনা মুনাওয়ারা
৫) আত্বান ইব্ন মালিক (রা.)	বনূ সালিম গোত্র
৬) মু'আয বিন জাবাল (রা.) (মৃ. ৬৩৯ খ্রি.)	বনূ সালিম গোত্র
৭) এক আনসারী (রা.)	মসজিদুল কু'বা
৮) 'আমর বিন সালমা (রা.)	বনূ জুরাস

৪৫২. ড. মুস্ড়ফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, প, ১০

৪৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪৫৫. 'আলণ্ঢামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৪-৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৯) উসায়দ বিন হুযায়র (রা.) (মৃ. ৬৪১ খ্রি.)	বনূ জুরাস
১০) আনাস বিন মালিক (রা.) (মৃ. ৭১২ খ্রি.)	বনূ নাজজার
১১) মালিক বিন হুয়ায়রাস (রা.) (মৃ. ৬৯৩ খ্রি.)	বনূ নাজজার
১২) ইতাব বিন উসায়দ (রা.) (৬৩৬ খ্রি.)	মক্কা মু'আয্যামা
১৩) 'উসমান ইব্ন আবিল 'আস (রা.) (মৃ. ৫১ হি.)	তায়েফ
১৪) আবু যায়েদ আনসারী (রা.)	আম্মান

'আযানের জন্য নিদিষ্ট কোন মু'আয্যিন ছিল না। তবে বড় বড় মসজিদে মু'আয্যিন ছিল। এর একটি ছক নিম্নে দেয়া হল:[৪৫৬]

মু'আয্যিনের নাম	মসজিদের নাম
১) হযরত বিলাল বিন রাবাহ (রা.) (মৃ. ৬৪১ খ্রি.)	মসজিদুন্ নববী
২)'আমর ইব্ন উম্মে মাকতুম কারশী (রা.) (মৃ. ৬৪৪ খ্রি.)	মসজিদুন্ নববী
৩) হযরত 'আবদুল কারত	মসজিদুল কুবা
৪) আবু মাহ্যূরা বিন মুগীরা (রা.) (মৃ. ৬৭৭ খ্রি.)	মক্কা মু'আয্যমা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মসজিদুন নববী- এর পর পর্যায়ক্রমে ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে বসরায়, ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কুফায় এবং ৬৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দে মিসরের ফুসতাতে প্রথম যুগের তিনটি মসজিদ নির্মিত হয়।[৪৫৭]

ইসলামী সভ্যতা বিকাশের প্রথম শতকে মদীনার মসজিদ অন্য সকল মসজিদের জন্য আদর্শ হয়ে উঠে। মদীনার মসজিদ ছিল উন্মুক্ত আকাশের নীচে বড় সর সালাত আদায়ের স্থান। চারধারে রোদে পোড়ানো মাটি দিয়ে ঘেরা। পরে রোদ আসা বন্ধ করতে মুহাম্মদ (সা.) তা খেজুর পাতা দিয়ে ছাদ তৈরি করেন।[৪৫৮] মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরিবেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। পরে মদীনার মসজিদ স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী উন্নত হয়ে উঠে।[৪৫৯] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের (৬৩২ খ্রি.) পর হযরত 'উমর(রা,)- এর খিলাফত কালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) 'উতবা বিন গায্ওয়ান ৬৩৫ খ্রি. বসরায় একটি সাদামাটা মসজিদ তৈরি করেছিলেন। মসজিদটি তৈরি হয়েছিল খাগড়া দিয়ে।[৪৬০] 'উত্বা বিন্ গায্ওয়ান যে মসজিদটি তৈরি করেছিলেন তা ছিল আরবের বাইরে জয় করা কোন দেশে প্রথম মসজিদ।

৪৫৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫; 'আবদুর রউফ দানাপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬

৪৫৭. মফিজুলণ্ডাহ্ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি. (পুনঃমুদ্রণ), পৃ. ৩২০

৪৫৮. Philip K. Hitti, *History of the Arabs,* London: Macmillan Education, LTD., 1970, Tenth ed., P. 258

৪৫৯. Ibid., P 258

৪৬০. 'আব্দুর রহমান ইব্ন খুলদুন, *তারীখু ইব্ন খুলদুন*, ২য় খণ্ড, বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৫৪০

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বসরা নামে একটি শহরও গড়ে তোলেন তিনি। তাছাড়া মসজিদটি সেনাবাহিনীর শীতকালীন শিবির হিসেবেও ব্যবহৃত হত।[৪৬১]

ইসলামী সম্রাজ্য দ্রুত বিস্তারের ফলে নতুন করে কিংবা পুরাতন শহরে নতুন সেনা ছাউনি নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিত। নির্মাণ স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদগণ মসজিদ কেন্দ্রিক শহর নির্মাণ করতেন। তাঁদের পরিকল্পনায় শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকত মসজিদ। এ মসজিদ সংলগ্ন থাকত প্রশাসনিক ভবন। প্রশাসনিক ভবন বা দারুল ইমারায় থাকত সেনাপতির বাসস্থান, কারাগার ও দীওয়ান।[৪৬২] হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শাসনামলে (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.) এমনকি হযরত 'উমর (রা)-এর শাসনামলেও (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) বিজিত অঞ্চলে মসজিদসমূহ বিকাশ লাভ করতে থাকে। বিশেষ করে বিজয়ী ইসলামী সৈন্যদল কর্তৃক বিজিত অঞ্চলের শহরসমূহ রক্ষার জন্য সেখানে সেনাদূর্গ গড়ে তুলতেন। তখন ঐ সমস্ত অঞ্চলের গভর্নরগণ খলীফাগণের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন এবং তাঁরা সালাতের সময় ইমামতির দায়িত্বও পালন করতেন। আর মসজিদের সালাত পরিচালনা ছিল রাজ্য সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।[৪৬৩]

বসরার পর মুসলমানগণ যে শহরের গোড়াপত্তন করেন তা হল কুফা। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রখ্যাত সাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াককাস (রা.) (মৃ. ৬৭৫ খ্রি.) শহরটি তৈরি করেন। শহরে সর্বপ্রথম জামি' মসজিদ তৈরি হয় ৬৮৩ খ্রি.।[৪৬৪] সা'দ মসজিদের জন্য একখণ্ড জমি নির্দিষ্ট করেন এবং দেয়ালের পরিবর্তে চারদিকে পরিখা খনন করে মসজিদের সীমানা চিহ্নিত করেন। মসজিদের সীমানা নির্ধারণের জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। তীর নিক্ষেপের দ্বারা মসজিদের চতুর্দিকের সীমানা নির্ধারিত করা হয়।[৪৬৫] ৬৭১ খ্রি. যিয়াদ বিন আবীহ মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেন।[৪৬৬] ৬৩৭ খ্রি. সা'দ বিন ওয়াককাস মাদায়েন বিজয় করেন। তখন তিনি মুসলিম বাহিনীসহ সাসানীয় রাজ-প্রাসাদে জুমু'আর সালাত আদায় করেছিলেন। ইরাকে এটাই ছিল প্রথম জুমু'আ। পরে তিনি উপরোক্ত জমিতে মসজিদ স্থাপন করেছিলেন।[৪৬৭]

ইসলামের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য মসজিদটি ছিল 'আমর ইব্নুল 'আস (রা.) (মৃ. ৬৬৩ খ্রি.) -এর মসজিদ যা কায়রোর ফুসতাতে নির্মিত হয়েছিল। ৪৪২ খ্রি. তিনি আফ্রিকাতে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[৪৬৮]

---

৪৬১. Philip K. Hitti, op.cit., P. 260

৪৬২. ড. মুস্ত্বফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮ (ভূমিকা)

৪৬৩. Ed. George. Michell, *Architecture of the Islamic World*, Londen:Thomas and Hudson, Ltd., 1995, Reprinted, P. 36

৪৬৪. এ, এন, এম, সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ২০০৫ খ্রি. পৃ. ৮৩

৪৬৫. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর, তাহকীক, মুস্ত্বফা সায়্যিদ ও তারিক সালিম, *তারীখু আত্-তাবারী*, ২য় খ, মিসর: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ্, তা. বি., পৃ. ৫৫৮-৫৫৯

৪৬৬. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৪৬৭. জালালুদ্দীন সুয়্যূতী, *তারীখুল খুলাফা*, মিসর: দার ল ফাজর লিতুরাস, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ১০৭

৪৬৮. Philip K. Hitti. op.cit., P.260

Dhaka University Institutional Repository

'আমর ইবনুল 'আস কর্তৃক নির্মিত ফুসতাতের মসজিদটি ইসলামী স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন।[৪৬৯] এ মসজিদটি পরে ৬৭৩ খ্রি. আরও সম্প্রসারিত হয়। মসজিদটিতে প্রথমে কোন মিহরাব ছিল না। পরে উন্মুক্ত মাঠ সংযুক্ত করা হয়। এটি পরে আলেকজান্দ্রিয়ার অনেক মসজিদের জন্য নমুনা হয়ে উঠে।[৪৭০] যদিও মসজিদটি চৌকোণা বিশিষ্ট ছিল তথাপি এতে সুন্দর মিম্বার বিদ্যমান ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে এতে মিহ্রাব, মিনার ও মাকসূরা সংযোজিত হয়ে এটি অত্যন্ত সু-সজ্জিত মসজিদে পরিণত হয়েছিল।[৪৭১] 'The art and architecture of muslim' গ্রন্থে বলা হয়েছে:- ''They were thus not only religious buildings but also the main social and political centres.''[৪৭২]

উমাইয়া যুগে মসজিদের বিকাশ (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

অতঃপর আল-কায়রোয়ানে 'উকবা বিন নাফির আমলে (৬৭০-৭৫০ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এ মসজিদটি কায়রোর মসজিদের মত ছিল সেনা ছাউনি। মসজিদ এবং তার আশেপাশে সরকারি বাড়ি নির্মাণ করেন 'উকবা। এ মসজিদটি বিভিন্ন সময়ে তাঁর উত্তরাধিকারিগণ নতুনভাবে সংস্কার করেন। চূড়ান্তভাবে আগলাবী সুলতান প্রথম যিয়াদত-আল্লাহ (৮১৭-৩৮খ্রি.) এটি তৈরি করেন। তাঁর সময় থেকেই এ মসজিদটি ইসলাম ধর্মের এক অন্যতম পবিত্র ধর্মস্থান বলে বিবেচিত হয়।[৪৭৩] উমাইয়া খলীফা প্রথম ওয়ালীদ (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫ খ্রি.) দামেস্কে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে। দামেস্কের এ মসজিদটি নির্মিত হয় একটি গির্জার কিছু অংশ নিয়ে। ওয়ালীদ গির্জার সমস্ত জমি ক্রয় করে সুবৃহৎ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।[৪৭৪]

আয়তনে আয়তাকার এ মসজিদটির অভ্যন্তরে দু'টি সমান সারি লিওয়ানটিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছে– যার মাঝখানে উত্তর-দক্ষিণে ছিল একটি নেভ। কিবলা প্রাচীরের মাঝখানে একটি অবতল মিহরাব ছিল। খিলানগুলো গোলাকার অশ্ব নলাকৃতির উপরে-নীচে দু'টো সারিতে নির্মিত। সাদা মার্বেলের ব্যবহার, ঢালু ছাদ ও কারুকার্য কাঠের মিহ্রাব, গম্বুজ জালির জানালা। বিশাল চত্বরের তিনপাশে রিওয়াক মসজিদটিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

আল্-ওয়ালীদ (শাসনকাল ৭০৫-৭১৫খ্রি.)-এর জামি' মসজিদটি ধর্মীয় গুরুত্ব বিচারে মক্কা, মদীনা এবং জেরুজালেমের পরেই চতুর্থ স্থান অধিকার করে রয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ ইমারতের স্থাপত্যশৈলী এবং অলঙ্করণ প্রণালির ভূয়সী-প্রশংসা করেছেন.। তাৎপর্য বিচারে এ মসজিদটি ধর্মীয়

৪৬৯. Dr. Syed Mahmudul Hasan, *Muslim architechure of the pre-Mughal Bengal*, Dhaka: University press LTD., 1979. P.16

৪৭০. Ernst Kuhnel, Trans. Katherine Watson, *Islamic art and architecture*, London: A Bell and sons LTD., 1966, P.33

৪৭১. Sir Thomas Arnold, *The Islamic Art and Architecture*, New Delhi: Good word Books, 2001, P.158

৪৭২. Richard Ettinghausen and Oleg Qumber, *The Art and Architecture of Islam*, New haven and Londen:Yele university press, 1994, P.36

৪৭৩. Philip. K Hitti. Op. cit., P.261

৪৭৪. শায়খ তোয়া হাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্য শৈলী ও স্থাপত্যিক দিক দিয়ে খুবই অনন্য সাধারণ।[৪৭৫] ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, "আজও এ উমাইয়া মসজিদকে বিশ্বের সকল মসজিদের মধ্যে চতুর্থ স্থানে মর্যাদার আসনে রেখেছেন মুসলিমগণ। মুসলমানদের কাছে এ মসজিদ বিশ্বে চতুর্থ আশ্চর্যের বিষয়।[৪৭৬] তিউনিসের নিকট কায়রোয়ানে খলীফা হাশিম (শাসনকাল ৭২৪-৭৪৩ খ্রি.) একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এতে সুউচ্চ মিনার ছিল। ৯ম শতাব্দীর শেষের দিকে ইহা পুনঃনির্মিত হয়। তিউনিসের যায়তুনাতে ৭৩২ খ্রি. একটি জামি' মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল।[৪৭৭]

কুফা ও বসরার মধ্যস্থিত শহরের নাম ওয়াসীত। উমাইয়া খলীফা 'আবদুল মালিকের খিলাফত আমলে (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭০৩-৭০৪ খ্রি. শহরটির গোড়াপত্তন করেন। তিনি এখানে দারুল ইমারা কুব্বাতুল খাযরা নির্মাণ করেন। এ মসজিদের ভিত আবিস্কারের পূর্ব পর্যন্ত আয়তনের পরিধির ক্রমানুসারে উমাইয়াদের সিরীয় তিনটি জামি' মসজিদের নাম জানা ছিল। দারুল ইমারার ছাদে সবুজ গম্বুজ সংস্থাপিত হওয়ার কারণে এটির 'কুব্বাতুল খাযরা' নামকরণ করা হয়েছে। দামিস্কের সুবৃহৎ জামি' মসজিদ নির্মাণকাল ৭০৫-৭১৫ খ্রি., দ্বিতীয় কসের আল্ হায়রে জামি মসজিদ নির্মাণকাল ৭২৯খ্রি., তৃতীয় হাররানের জামি' মসজিদ নির্মাণকাল ৭৪৪-৭৫০খ্রি., ওয়াসীতের জামি' মসজিদ আবিস্কার হওয়ার পর ইরাকের ভূমিতে উমাইয়া আমলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) প্রথম জামি' মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয় এটিকে।[৪৭৮] হাস্সান বিন নু'মান যখন ৭৩৮ খ্রি. আফ্রিকা জয় করেন তখন মিসরের যায়তুনাতে একটি জামি' মসজিদ স্থাপন করেন। কারও মতে 'উবায়দুল্লাহ্ বিন্ আল্-হাবহাব ৭৩৪ খ্রি. মসজিদটি স্থাপন করেন।[৪৭৯]

আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) মসজিদের বিকাশ

উমাইয়া রাজ বংশের পতনের পর বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হয়। মুসলিম স্থাপত্য তথা মসজিদ নির্মাণ কৌশল ও রীতিতে আব্বাসীয় খলীফাগণ (৭৫০-১২৫৮খ্রি.) অসামান্য অবদান রেখেছেন। মসজিদ নির্মাণে আব্বাসীয় খলীফাগণ যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তার উদাহরণ আল-মনসূর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) কর্তৃক নির্মিত বাগদাদ, রাক্কার দূর্গ মসজিদ, উমাইদিরের মসজিদ এবং বিশেষ করে সামারার বিশালকায় জামি' মসজিদ ও আবূ দুলাফের মসজিদ উল্লেখযোগ্য।[৪৮০] খলীফা আল-মনসূর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) বাগদাদে তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন একটি প্রসিদ্ধ জামি' মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। রোদে শুকানো ইট এবং কাদামাটি দিয়ে প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। মূল্যবান কাঠ দিয়ে স্তম্ভ

৪৭৫. ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৪৭৬. Philip K. Hitti, op.cit., P.267

৪৭৭. Arnold, *Islamic art and architecture*, op.cit., P. 163

৪৭৮. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, রাজশাহী: উত্তরণ অপসেট প্রিন্টিং প্রেস, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.,পৃ.৭৩

৪৭৯. শায়খ তোয়া-হাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯

৪৮০. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ করেছিলেন।[৪৮১] খলীফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৫ খ্রি.) উক্ত মসজিদ ভেঙে দিয়ে তা পুনরায় নির্মাণের আদেশ প্রদান করেন। পোড়া ইট ও জিপসাম দ্বারা মসজিদের প্রাচীর নির্মিত হয়। ৮০৭ খ্রি. এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ৮০৮ খ্রি. তা সমাপ্ত হয়। মসজিদ সম্প্রসারিত করে আল্-মনসূরের কার্যালয় কক্ষ 'দারুল কাত্তান' কে এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মুতাযিদ বিল্লাহ্র পূর্ব পর্যন্ত মসজিদের এ আকৃতি বহাল ছিল। ৮৭৩-৭৪ অথবা ৮৭৪-৭৫ খ্রি. মুতাযিদ বিল্লাহ মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেন।[৪৮২] 'The Renaissance of Islam' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, মিসরের ফুসতাতে ছিল দু'টি জুমু'আ মসজিদ। একটি 'আমর আল্-'আসের এবং অন্যটি তুলুন মসজিদ। হিজরী তৃতীয় শতকে বসরাতেও দু'টি জামি' মসজিদ ছিল যেখানে ৭০০০ স্থানের লোকজন সমবেত হত। মানুষের প্রয়োজনে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে কায়রোতে জুমু'আ মসজিদ বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। পুরাতন কায়রোতে 'আমরের মসজিদের সন্নিকটে আরও ছয়টি মসজিদ নির্মিত হয়।[৪৮৩]

আব্বাসীয় স্থাপত্যরীতির অপূর্ব স্বাক্ষর বহন করে আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিল (শাসনকাল ৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) কর্তৃক সামারায় ৮৪৭ খ্রি. নির্মিত জামি' মসজিদটি। ইহার দৈর্ঘ্য ২৬০ মিটার ও প্রস্থ ছিল ১৮০ মিটার। এর ভেতরে একলক্ষ মুসল্লী এক সাথে সালাত আদায় করতে পারত।[৪৮৪] এ মসজিদটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মসজিদ হিসেবে খ্যাত। প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ দিরহাম ব্যয়ে নির্মিত এ মসজিদটি আয়তাকার এবং প্রাচীর বেষ্ঠিত। মসজিদটির ছাদ এবং ভিতরের স্তম্ভরাজি অনেক আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এ মসজিদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর বুরুজবিশিষ্ট প্রাচীর, অসংখ্য প্রবেশ পথ, পোড়ামাটির নকশা এবং সর্বোপরি মালবীয় মিনার দেখে সহজেই অনুমান করা যায়।[৪৮৫] মসজিদটি ছিল টাইগ্রিস নদীর তীরে।[৪৮৬] খলীফা মুতাওয়াকিকল (৮৪৭-৮৬১খ্রি.) সামারার জামি' মসজিদ নির্মাণ করার পর সামারা হতে উত্তর দিকে আল্-মাহুয়া নামক স্থানে ৮৬০ খ্রি. একটি নতুন শহর গড়ে তোলেন। এখানে একটি জুমু'আ মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি ছিল সামারার প্রথম মসজিদের অনুরূপ। মসজিদটি আবূ দুলাফ মসজিদ হিসেবে খ্যাত। শহরটি আল্-জাফারিয়া কিংবা আল-মুতাওয়াক্কিলিয়া নামে পরিচিত।[৪৮৭] মিসরে নিযুক্ত আব্বাসীয় গর্ভনর তুলুন একটি জামি' মসজিদ ফুসতাত ও কায়রোর মাঝামাঝি স্থান আল-কাতা-ই নামে পরিচিত। এখানে একটি আকর্ষণীয় মসজিদ ছিল। আব্বাসীয় স্থাপত্যে অত্যন্ত সুন্দর নকশায় মসজিদটি তৈরি। আব্বাসীয় খলীফা আবুল আব্বাসের নির্দেশে মসজিদটি অত্যন্ত মনোরম ও

---

৪৮১. Ernest Kuhnel, op.cit., P. 50

৪৮২. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৪৮৩. Salahudding Khuda Bakhsh and D.S. Margoliouth, *The renaissance of Islam,* Chittagong:Bangladesh Co-operative book society Ltd., 1996. P. 450

৪৮৪. Ernesf Kuhnel, Op.cit., P.51

৪৮৫. ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪৮৬. Dogan Kuban, The central Arab lands, *The Mosque History Architectural development and regional diversity*, London:Thomas and Hudson LTD., 1994, P.92

৪৮৭. ড. এ. কে. ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছিল। (৮৭৭-৮৭৮ খ্রি.)[৪৮৮] আরনল্ড বলেন, "From the end of the ninth century to the end of the twelfth century the number of surviving muhammadan Mosques is not large, Much Military architecture was produced during that period."[৪৮৯]

ফাতেমীয় শাসনামলে (৯৬৯-১১৭১খ্রি.) মসজিদের বিকাশ

৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয়দের অভ্যুত্থানের ফলে আব্বাসীয় খিলাফতের বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়। উত্তর আফ্রিকা থেকে ফাতেমীয় আন্দোলন মিসরে পাড়ি জমাতে থাকে। তাঁরা মিসর বিজয়ের পরে উমাইয়া মুরীয় স্থাপত্যরীতির উপর কায়রো শহরের গোড়াপত্তন করেন। তাঁরা পারস্য স্থাপত্যরীতি থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। 'উকবার কায়রোয়ানের মসজিদ এবং ফুসতাতের শহরতলীতে ইব্ন তুলুনের মসজিদ-স্থাপত্যের উপর ভিত্তি করে ফতেমীয় স্থাপত্যরীতি গড়ে উঠে। এ সময় নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে জাওহার কর্তৃক নির্মিত আল-আযহার মসজিদ, আল-হাকীমের জামি' মসজিদ (নির্মাণ কাল ৯৯১-১০১২ খ্রি.), সেনাধ্যক্ষ আল-জামালির মসজিদ (১০৮৫ খ্রি.) এবং আল-আকমারের মসজিদ ১১২৫ খ্রি. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৪৯০] জাওহার মাকাল্লী যখন ৯৬৯ খ্রি. মিসর জয় করেন। তিনি কায়রো শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তিনি মিসর শহরে একটি মসজিদ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শনিবার ১৪ই রমযান ৯৭০ খ্রি.।[৪৯১] ৭৯২ খ্রি. মসজিদ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং ৭ই রমযান প্রথম জুমু'আর সালাত আদায় হয়।[৪৯২] অতঃপর 'আবদুল 'আযীযের শাসনামলে (৯৭৬-৯৯৬ খ্রি.) মন্ত্রী 'আবদুল ফারাগের পরামর্শে ৯৮৯ খ্রি. মসজিদে মহাবিদ্যালয়ের ক্লাস আরম্ভ হয়। বর্তমানে যা আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত।[৪৯৩]

আব্বাসীয় খিলাফতের (৭০৫-১২৫৮খ্রি.) শেষ ভাগে সেলজুক বংশ শাসন ক্ষমতা দখল করে। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইরাক ও পারস্যে অসংখ্য ইমারত বিশেষ করে মসজিদ নির্মিত হয়। এ সমস্ত ইমারতের মধ্যে অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত দামগানের তারিখখানা মসজিদ, দশম শতাব্দীতে নাইনে নির্মিত জামি' মসজিদ এবং ইসফাহানের বিশালকায় ও অনিন্দ্যসুন্দর জামি' মসজিদ (একাদশ শতাব্দী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসফাহানের জামি' মসজিদটিতে (১০৮৮ খ্রি.) সামারার জামি' মসজিদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৪৯৪] এটি একটি চার ইওয়ান বিশিষ্ট মসজিদ। উত্তর দিকের ইওয়ানের উপর গম্বুজ রয়েছে।[৪৯৫]

---

৪৮৮. Dogon Kuban, op.cit. P.95

৪৮৯. Arnold. *The Islamic architecture*, op.cit., P.167

৪৯০. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৪৯১. শায়খ তোয়া-হাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩

৪৯২. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৪৯৩. ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও হাফিজ মুজতবা রিজা আহমদ, স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১০৯

৪৯৪. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩

৪৯৫. মফিজুলণ্ঢাহ কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

সেলজুক আমলের পর গজনি রাজত্ব শুরু হয় এবং এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান মাহমূদ গজনীতে স্থাপত্য শৈলীর অপূর্ব নির্দশন স্বরূপ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সেলজুক আমলে যেমন সিরাজ, ইয়াজদ, গুলপায়গান প্রভৃতিস্থানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে তেমনি ইলখানি যুগেও অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মসজিদ পারস্য-স্থাপত্যকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। ইলখানি যুগে নির্মিত অনন্য সাধরণ ইমারত হচ্ছে ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে ভারামিনের মসজিদ।[৪৯৬]

চর্তুদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমীর তৈমূর বিশাল তৈমূরী সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় শিল্পকলা ও স্থাপত্যে এক রেনেসাঁর সূচনা হয়। রাজধানী সমরকন্দ ছিল তৈমুরী সম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র এবং এ নগরী অসংখ্য অপূর্ব সৌধরাজি দ্বারা সুশোভিত ছিল। এ যুগের আকর্ষণীয় মসজিদ হচ্ছে বিবি খানমের মসজিদ (১৪০৫-৬ খ্রি.)। তৈমুরী স্থাপত্য রীতির প্রকৃত বিকাশ ঘটেছিল, সমরকান্দের বিবি খানমের মসজিদে। সমগ্র মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে মসজিদ-ই-শাহ-এর মত স্থাপত্যিক নৈপুণ্যের মূর্ত প্রকাশ অন্য কোন ইমারতে দেখা যায় না। শাহ্ আব্বাস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজধানী ইসফাহানে এ মসজিদটি নির্মাণ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে মসজিদের বিকাশ

মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে মুসলমান অধিকৃত সমগ্র অঞ্চলে। ইসলাম সম্প্রসারণের ফলে ইসলাম শুধু ধর্ম হিসেবেই প্রসার লাভ করেনি, বরং সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলায়ও ব্যাপক প্রভাব ফেলে। মুহাম্মদ বিন্ কাসিমের সিন্ধু বিজয় (৭১২খ্রি.) ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম বিজয়ের ফলে সর্ব প্রথম মুসলমানদের ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্য শিল্পকলার সংস্পর্শে আসে। তাঁরা ভারতে আসার পর আরব, পারস্য, মধ্যপ্রাচ্য থেকে স্থাপত্যিক উপাদান মুসলিম ভারতীয় ইমারতে প্রয়োগ করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় শিল্পকলার প্রভাবে বিভিন্ন উপকরণ সংযোজন করতে থাকে। এর ফলে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সৃষ্টি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মিত হয় করাচী থেকে ৪০ মাইল দূরে বানবোর নামক স্থানে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের দেবলই বর্তমানে বানবোর। সম্পূর্ণ ইটের নির্মিত নতুন ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বানবোর এবং মনসুরার মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় মদীনা, কুফা, বসরা এবং ওয়াসীতের নির্মিত চতুস্কোণ মসজিদের সঙ্গে এর যথেষ্ঠ মিল রয়েছে।[৪৯৭]

প্রথমে ৬৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাফত কালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) ওমান থেকে ভারতে প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়। ৬৬০-৬১ খ্রি. মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ ভারতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।[৪৯৮] ৭১২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মণ রাজা দাহির সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও নিহত হন।

---

৪৯৬. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৪৯৮. 'আলণ্ঢামা গোলাম আহমেদ মোর্তজা, *ইতিহাসের ইতিহাস*, ঢাকা: মুন্শী মুহাম্মদ মেহের্লণ্ঢাহ্ বিসার্চ একাডেমী, বাংলাবাজার, ৩য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি. পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

তারপর এক বছরের মধ্যে দাহিরের গোটা সম্রাজ্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের দ্বারা মুসলমানদের অধিকারে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ৬৩২ খ্রি. পরলোক গমন করেন। আর কাসিমের পুত্র মুহাম্মদ ৭১২ খ্রিস্টাব্দে এ ঐতিহাসিক যুদ্ধে ইসলামের বিজয় কেতন ভারত ভূমিতে উড্ডীন করেন।[৪৯৯] মালাবারের প্রাচীন নাম ছিল চেরর বা কেরল। সেখানে সেই যুগেই দশটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল।[৫০০] যথা: (১) প্রথম মসজিদ পেরুমলের রাজধানী কর্ণক্লোর (কোড়ঙ্গনে) বা ক্রাঙ্গানূরে নির্মাণ করেন মালিক বিন দীনার। (২) দ্বিতীয় মসজিদ নির্মিত হয় ত্রিবান্ধোড়ের অন্তর্গত কওলাম বা কোল্লমে (বা কুইলনে)। (৩) তৃতীয় মসজিদ নির্মাণ করে ডিল্লি পর্বতে (বা হিল্লী মারাওয়াতে)। (৪) চতুর্থ মসজিদ নির্মিত হয় দক্ষিণ কানাডার অন্তর্গত বুর্করে (বা পাকনূরে)। (৫) পঞ্চম মসজিদ মঙ্গলের নগরে। (৬) ষষ্ঠ মসজিদ দেল্লীচেরীর অন্তর্গত ধর্মপত্তন (বা দরমফতন) নগরে। (৭) সপ্তম মসজিদ নির্মিত হয় বেপুর রেল টার্মিনালের নিকটবর্তী চালিয়াম (বা শালিয়াত) নগরে। (৮) অষ্টম মসজিদ জৈফত্তন বা জরফতনে, যার বর্তমান নাম হচ্ছে সুরুকুন্ডপুরম। ইব্ন-বতুতা খ্রিস্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে এ মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন। (৯) নবম মসজিদ পন্থারিনীতে বা ফন্দারিনায় নির্মাণ করা হয়। (১০) কঞ্জর কোট নামক স্থানে দশম মসজিদ নির্মিত হয়।[৫০১] মসজিদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে এতদ্দেশে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃতি হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এসকল মসজিদের ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক সম্পত্তিও প্রদত্ত হয়েছিল। ঐ সময় উপকূলবাসী মুসলমানগণের এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সংখ্যায় পরিবৃদ্ধি হয়েছিল। ক্রমে তাঁরা রাজ্যের মধ্যে এভাবে প্রভাব সম্পন্ন হয়ে উঠে।[৫০২]

উপমহাদেশে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে অতীতে ইসলামী স্থাপত্যের বিকাশ ঘটেছিল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এ উপমহাদেশে মুসলমান বিজেতাদের কর্তৃক তার সূচনা হয়েছিল। আর ইসলাম ধর্মের প্রয়োজনে অট্টালিকাসমূহে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ইসলামী স্থাপত্যের প্রভাব পড়েছিল। তবে মূলত সে শতাব্দীতেই বাগদাদের খলীফার প্রভাবে ভারতীয় অঞ্চলে মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা হয়েছিল।[৫০৩] মূলত ভারত উপমহাদেশে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের সূচনা হয়েছিল দাস রাজবংশের শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার অধীনে। কুতুবুদ্দীন আইবেক (১২০৬-১২১০খ্রি.) মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা করেন-১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে। এটি ব্যয়বহুল প্রজেক্ট হিসেবে গড়ে উঠে। আর মসজিদের একটি অংশে বিখ্যাত কুতুব মিনার গড়ে তোলা হয়। কুতুবুদ্দীন আইবেক আজমীরে 'আড়াই-দিন-কা ঝোপড়া' মসজিদ নির্মাণ করেন। এ দুই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে মুসলিম স্থাপত্যের উম্মেষ ঘটে ভারত উপমহাদেশে। দিল্লীতে তিনি 'কুয়াত আল-ইসলাম' নামে আরও একটি প্রসিদ্ধ মসজিদ নির্মাণ করে মুসলিম স্থাপত্যকে এগিয়ে নিয়ে যান। এ

৪৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৫০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৫০১. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: প্রকাশকাল ২০০২ খ্রি., পৃ.৬১

৫০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৫০৩. Percy Brown, *Indian architecture*, Bombay:Tarapurevala sons and private LTD., Naoroji Road fort, Published. N.D. P.6

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ তিনটি নির্মিত হয়েছিল ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ভারতীয় উপমহাদেশে এ তিনটি মসজিদ সনাতন মুসলিম স্থাপত্যের স্বাক্ষর বহন করে।[৫০৪]

দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময় যখন মুসলিম শক্তি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারতীয় উপমহাদেশে তখন মুসলমানগণ তাঁদের উচ্চ স্থাপত্য শিল্পের অধিকারী হন। তাঁদের কিছু নিজস্ব স্থাপত্য উপাদান তাঁদের সঙ্গেই ছিল। যেমন- খিলান, গম্বুজ, মিনার, মিম্বার, মিহরাব, এর উপাদানগুলো মুসলিম বিশ্বে সাধারণত সবখানেই বিদ্যমান।[৫০৫] দাস বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ইলতুতমিস (সময়কাল ১২১১-১২৩৬ খ্রি.) দিল্লীতে একটি ছোট মসজিদ, 'ঈদগাহ এবং বাদউনে জামি' মসজিদ নির্মাণ করেন। বাদাউনের মসজিদটি দিল্লী ও আজমীরের অনুকূলে নির্মিত। খিলজি বংশের রাজত্বে (রাজত্বকাল ১২৯০-১৩২০ খ্রি.) বিশেষভাবে আলায়ুদ্দীন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.) দিল্লীতে নিযামুদ্দীন আওলিয়ার মাযারে যে জামা'আতখানা নির্মাণ করেন তা বিশেষ ভাবে তাৎপর্যবহ। অবশ্য মসজিদ নির্মাণের কৌশল ও ব্যাপকতায় খিলজি অপেক্ষা তুঘলুক আমল (১৩২০-১৪১৩ খ্রি.) ছিল খুবই সমৃদ্ধ। ১৩৭৫ খ্রি. ওয়াযিরাবাদের শাহ্ আলমের দরগা সংলগ্ন মসজিদ, ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে বেগমপুরী মসজিদ, ১৩৭৬ খ্রি. কালি মসজিদ, চর্তুদশ শতাব্দীর খিরকি মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে ভারত উপমহাদেশের ওয়াযিরাবাদের মসজিদে সর্বপ্রথম জেনানা গ্যালারী নির্মিত হয়। মহিলাদের জন্য নির্মিত এ ধরনের পৃথক নামাযের স্থান বাংলাদেশেও বহু মসজিদে পরিলক্ষিত হয়।[৫০৬] দানী বলেন, "Islam was able to evolve for itself a new culture, which rapidly became common to the whole Muslim empire, and at the same time to elaborate novel forms of architecture especially adapted to its religious and social needs." [৫০৭]

দিল্লীর সুলতানী আমলের পতনের পর সমগ্রভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক স্থাপত্যরীতির উদ্ভব ঘটে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বাংলাদেশ (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.), গুজরাট (১৪০০-১৫৭২ খ্রি.), বেগমপুরী (১৩৬০-১৪৮০ খ্রি.), গুলবাগা (১৩৪৭-১৪২২ খ্রি.), বিদর (১৪২২-১৫১২ খ্রি.) এবং মালব (১৪০৫-১৫৬৯ খ্রি.)। স্থাপত্য ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সিন্ধুর মুলতান অঞ্চলে মসজিদ অপেক্ষা পীর-ফকীর-দরশের মাযার অধিক নির্মিত হয় এবং এ সমস্ত ইমারতের স্থাপত্য কৌশল এর অলঙ্করণরীতি নিঃসন্দেহে মুসলিম ভারতীয় স্থাপত্যে অবদান রেখেছে। স্থাপত্য শৈলীর দিক থেকে জৌনপুরের মসজিদসমূহ খুবই আকর্ষণীয়। জৌনপুরের প্রাচীন মসজিদ ১৩১১ খ্রি. জাফরাবাদে শেখ বরহা কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৩৭৭ খ্রি. নির্মিত দূর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইব্রাহীম নায়েব বরবকের মসজিদটির ছাদ বাংলা চালাঘরের অনুকরণে। ১৩৭৬-১৪০৮ খ্রি. নির্মিত আতলাদেবীর মসজিদ খুবই উল্লেখযোগ্য মুসলিম স্থাপত্য কলার নির্দশন। জৌনপুরের মত মালাবেও মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব নির্দশন

---

৫০৪. Ibid., P.6

৫০৫. Ahmad Hasan Dani, *Muslim architecture in Bengal*, Dacca: Asiatic Society Bangladesh, Published in 1961. P.6

৫০৬. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৫০৭. Ahmad Hasan Dani, op.cit., P.6

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত সু-প্রাচীন মসজিদ হচ্ছে কামাল মাওলা মসজিদ। আলবে মালিক মুগীসের মসজিদ (১৪৩২-৩৩ খ্রি.), ১৪৪০ খ্রি. নির্মিত মাণ্ডুর জামি' মসজিদ মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম নির্দশন।[৫০৮]

সুলতানী আমলের পতনের পর আঞ্চলিক ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের উদ্ভব হয়। তার মধ্যে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে গুজরাট। গুজরাটের পাটানের আদিনা মসজিদটি স্থানীয় অমুসলমান ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে নির্মিত। বাংলার হুগলী জেলার ত্রিভেণীতে জাফরখানের মসজিদও এ ধরনের উপকরণে নির্মিত। কাম্বেতে সর্বপ্রথম ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে খিলানের সাহায্যে মসজিদ নির্মিত হয়। আহমদ শাহের মসজিদটি ১৪১৪ খ্রি. দূর্গে নির্মিত হয়। গুজরাটে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে মাহমুদ বিগারার রাজত্বকালে (১৪৫৯-১৫১১ খ্রি.)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আহমেদাবাদে নির্মিত দস্তরখানের মসজিদ, বিবি অছুদ কুকির মসজিদ, চাম্পনীরের জামি' মসজিদ এবং ষোড়ষ শতাব্দীতে আহমেদাবাদে নির্মিত সিদি সৈয়দের মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাহমানী রাজ্যের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদ স্থাপত্য একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ ধারণ করে। যেমন গুলবার্গের জামি' মসজিদ। তবে এর পূর্বে ১৩১৮ খ্রি. মুবারক খিলজির মসজিদ স্থাপিত হয়। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যকলার ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে মুসলিম তথা মসজিদ স্থাপত্য এবং বিশেষ করে পারস্য ও ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য-কৌশলের ধারা জানা প্রয়োজন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত মসজিদ নির্মিত হয়েছে এর মূল কারণ এই যে, ইসলামী শিল্পকলার ধারা অব্যাহত থাকা। বাংলাদেশের মসজিদসমূহ পর্যালোচনা করলে এ কথার সত্যতা যাচাই হবে।[৫০৯] আহমদ হাসান দানী বলেন, "The Muslim had come to Bengal with their developed civilization of islam as their heritage."[৫১০]

মূলত ইসলামে মসজিদ নির্মাণ অতি পূণ্যের কাজ। ইসলামী সম্রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে খলীফা, প্রদেশিক গর্ভনর, গোত্রপতি ও সমাজপতিদের মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগও সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। পৃথিবীর এমন এলাকা খুঁজে পাওয়া কঠিন- যেখানে মুসলমানদের আবাস আছে কিন্তু মসজিদ নেই। বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ মুসলমান। তাঁদের প্রতি হাজারের জন্য গড়ে একটি করে মসজিদ রয়েছে।[৫১১]

বাংলাদেশে মসজিদের বিকাশ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সেন বংশের সর্বশেষ নৃপতি লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলায় সর্ব প্রথম মুসলিম বিজয়ের পর থেকে দিল্লীর অধীনে গভর্নরগণ বাংলা শাসন করেন। তুঘলক বংশের পতনের পর বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়।

---

৫০৮. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৫০৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯

৫১০. Dani, op.cit., P.2

৫১১. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে মুহাম্মদ ইব্ন বখতিয়ার খিজলী বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম করেন এবং লক্ষণাবতী অথবা গৌড়ে রাজধানী স্থাপিত হয়। তিনি মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে অসংখ্য মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও সূফী সাধকদের খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রখ্যাত খিলজী শাসক গিয়াস উদ্দীন এর সময় বাংলাদেশে মুসলিম অধিপত্য সুদৃঢ় হয়। তিনি গৌড় থেকে উত্তর দিনাজপুরের দেবীকোট পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দিন সিরাজ এ সময়ে গৌড়ে আসেন এবং তাঁর কীর্তি স্বচক্ষে দেখেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও খানকা স্থাপন করেন।[৫১২] স্বাধীন ইলিয়াস শাহী রাজ্য কায়েমের বহুপূর্বে শাসকগণের মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্যের সম্প্রসারণ এবং ধর্ম প্রচারের সঠিক তথ্য জানা যায়। ধর্ম প্রচারের সাথ সাথে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়। খিলজী, বলবনী ও তুঘলকী শাসনামলে দিল্লী থেকে বাংলাদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। প্রাক সুলতানী আমল বাংলাদেশে যে অসংখ্য মসজিদ, দূর্গ খানকা, মাদ্‌রাসা, মাযার প্রতিষ্ঠিত হয় তা কালের কবলে বহু আগেই বিলীন হয়ে যায়।[৫১৩]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হুগলী জেলার ত্রিবেনী মুসলিম শাসনের আওতায় আসে। পরবর্তীকালে সাওগাঁ এবং ছোট পাণ্ডুয়া মুসলিম অধিকারে আসে। ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে জাফর খান গাজী ত্রিবেনী দখল করেন এবং সর্বপ্রথম বাংলাদেশে মসজিদ স্থাপত্যের সূচনা করেন। তিনি ত্রিবেনীতে যে মসজিদ স্থাপন করেন তা জাফর খান গাজীর মসজিদ নামে পরিচিত। প্রাচীন স্থানীয় প্রাক-মুসলমান স্থাপত্যিক উপকরণের ব্যবহার সত্ত্বেও এই মসজিদটি আয়তকার বহু গুম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত।[৫১৪] দুটি আইলে বিভক্ত। এই মসজিদটি ১০টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। কিবলা প্রাচীরে পাঁচটি অবতল মিহরাব স্থাপিত হয়। এই মসজিদে মোটা ভারী ধরণের পাথরের যে স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তীকালে হযরত পাণ্ডুয়ায় নির্মিত আদিনা মসজিদের মহিলা গ্যালারীতে তা দেখা যাবে। এই মসজিদের পাশেই জাফর খান গাজীর সমাধী রয়েছে। মসজিদের মত সমাধীতেও প্রাচীন প্রাক-মুসলমান কালের পাথর খণ্ড এবং উভয় ইমারতে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত নকশা দেখা যাবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, জাফর খান গাজীর মসজিদ বাংলাদেশে সম্পূর্ণ গুম্বজ ঘেরা, চত্বর ও মিনারবিহীন ইমারতের রীতিতে নির্মিত যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয়েছে।[৫১৫] ত্রিবেনী ছাড়াও সাওঁগা এবং ছোট পাণ্ডুয়াতে মুসলিম বসতি গড়ে উঠে এবং এর প্রমাণ স্বরূপ ছোট পাণ্ডুয়াতে প্রতিষ্ঠিত বিশালাকার বড় মসজিদটির উল্লেখ করা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মসজিদটির পরিমাপ হচ্ছে ২১৩ ফুট × ৪২ ফুট। তিনটি আইলে বিভক্ত এই মসজিদের অভ্যন্তরে দুইটি স্তম্ভ সারি আছে এবং কৌনিক খিলান ও পেনেডন টিভের সাহায্যে সর্বমোট ৬৩টি ছোট আকারের গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই মসজিদের কিবলা প্রাচীরে মোট ২১ অবতল অর্ধ গোলা করে মিহরাব দেখা যাবে। জ্যামিতিক এবং লতাপাতার নকশা এই মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। এই ইমারতের প্রধান

---

৫১২. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৬

৫১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৫১৪. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলমিক সেন্টার, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ১৮

৫১৫. মহীউদ্দীন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম*, মাসিক মদীনা, জানুয়ারি, ১৯৯২, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

আকর্ষণ মিনার ও মিম্বার। সাতধাপ বিশিষ্ট গম্বুজাকৃতি মিম্বারটি আদিনা মিম্বারের পূর্বসূরী বলে মনে হয়। সম্ভবত এই মসজিদেই সর্বপ্রথম মহিলাদের নামাযের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয় মহিলা গ্যালারীতে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অসংখ্য মসজিদে মহিলা গ্যালারী দেখা যাবে। যেমন আদিনা মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, হুগলীর মোল্লা সিমলায় ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে এক গম্বুজ বিশিষ্ট্য চতুষ্কোাকার মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫১৬] ছোট পাণ্ডুয়ায় প্রাক-সুলতানী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যিক নিদর্শন দেখা যাবে মিনারে। ছোট মসজিদ থেকে প্রায় ১৭৫ ফুট দূরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই মিনারটি মসজিদের একটি অংশ কিনা সঠিক বলা না গেলেও এটি যে আযানের জন্য ব্যবহৃত হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কোন ঐতিহাসিক ছোট পাণ্ডুয়ায় মিনারকে বিজয় স্তম্ব মনে করেন। পাঁচটি স্তরে ক্রঃমশ ঢালু করে নির্মিত এই মিনারটির ভিত্তি মূল ৬০ ফুট হাল ও চূড়া ১৫ ফুট। ইটের খোদাই করা নকশা রয়েছে। দানী বলেন, æThe Bari Masjid and the Minaret at Chhoto Pandua exemplity typical brick style at Bengal." অন্য এক স্থানে তিনি যথার্থই বলেন যে, "বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এই সমস্ত আদি মসজিদসমূহ মুসলিম প্রার্থনাগারের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ দ্বারা নির্মিত ছিল। বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশে অসংখ্য বৌদ্ধস্তুপ ও হিন্দু মন্দিরের মাঝে এ ধরনের মুসলিম ইমারত শুধু ব্যতিক্রমই নয় বরং স্থাপত্য কলার ইতিহাসে এক নব দিগন্তের সূচনা করে।"[৫১৭]

দিল্লীর কর্তৃত্ব অবজ্ঞা করে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরউদ্দীন মুবারাক শাহ সোনারগায়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। তাঁর সময়ে চট্টগ্রামে মুসলিম পর্যটক ইব্ন বতুতা বাংলাদেশে আগমন করেন। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ১৩৩৮ খ্রি. থেকে ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। মুবারক শাহ যখন সোনারগাঁয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট তখন গৌড়ের অধিপতি ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহ। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ আলাউদ্দীনকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। ইলিয়াস শাহ ক্রমশ স্বীয়-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র বাংলায় ইলিয়াস শাহী নামে একটি স্বাধীন রাজবংশ কায়েম করেন।[৫১৮] স্বাধীন বাংলায় একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন ইলিয়াস শাহ এবং এরপর থেকে দুইশত বৎসর পর্যন্ত এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। এ সময় বাংলাদেশে মুসলিম সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। এ সময় 'আরব পারস্য মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু সূফী সাধক, সেনাপতি স্থপতি, কারিগর বাংলাদেশে আগমন করেন। সুদীর্ঘ দুইশত বৎসরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকা, মাযার, দূর্গ, রাস্তা, সেতু জলাশায়, প্রাসাদ প্রভৃতি।[৫১৯] সুলতানী আমলে বাংলাদেশের স্থাপত্য রীতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। একটি দেশের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও কৌশল নির্ভর করে, সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সহজলভ্য উপকরণ, স্থানীয় ও বিদেশী

৫১৬. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৩২
৫১৭. প্রাগুক্ত।
৫১৮. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৫১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্য প্রভাব এবং বিশেষ করে পৃষ্ঠ পোষকতার উপর। বাংলায় স্বাধীন রাজ্য কায়েমের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন সাংস্কৃতিক এবং স্থাপত্যিক ধারা প্রচলিত হয়।[৫২০]

ইলিয়াস শাহ বংশই সর্বপ্রথম এই কৃতিত্বের দাবীদার। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪৫ খ্রি. স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। 'সুলতান-ই-বাঙালা' নামে পরিচিত শামসউদ্দীন কেবলমাত্র একডালা দূর্গ নির্মান করেননি, সেই সঙ্গে শায়খ আলাউল হকের সম্মানার্থে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। যার প্রবেশ তোরণ এখনও হযরত পাণ্ডুয়ায় দেখা যাবে। তিনি ১৩৫৮ খ্রি. মৃত্যুবরণ করলে তার সুযোগ্য পুত্র সিকান্দার শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিকান্দার শাহ অত্যন্ত প্রতাপশালী সুলতান ছিলেন এবং তিনি হযরত পাণ্ডুয়ায় বিশালাকার অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত আদিনা মসজিদের নির্মাতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[৫২১] এছাড়া শিললিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৩৬৩ খ্রি. দিনাজপুর জেলার দেবীকোটে মোল্লা আতার দরগাহে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ রাজত্ব শুরু করেন। তিনি সোনারগাঁয়ের মগরা পাড়ায় সমাহিত আছেন। তাঁর আমলে বাংলাদেশে সাহিত্য, সংস্কৃতি এ স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে। চীনা পর্যটকদের বর্ণনায় তাঁর রাজত্বের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ্য আছে। তিনি দানবীর ছিলেন এবং মক্কা ও মদীনার মাদ্‌রাসা ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। ইলিয়াস শাহী রাজবংশের অবসান হয় ১৪০১ খ্রি.। তাদের স্থলাভিষিক্ত হন রাজা গণেষের বংশধর। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গণেশের পুত্র যদু, জালালুউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে ইসলাম কবুল করেন। তিনি ১৪১৫ খ্রি. থেকে ১৪৩১ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য মসজিদ, জলাশয়, সরাইখানা নির্মিত হয়।[৫২২] তিনি রাজধানী গৌড় থেকে হযরত পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসক ছিলেন এবং মুদ্রায় নিজেকে 'ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী' হিসেবে প্রচার করেন।

রাজা গণেশের বংশধরগণ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে ১৪৪৩ খ্রি. পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। এরপর নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ নামে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের এক পৌত্র সিংহাসন পুন. দখল করে দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী রাজত্ব কায়েম করেন। তাঁর দীর্ঘ ২৪ বৎসরের রাজত্বকালে (১৪৪২-৬০ খ্রি.) তিনি রাজ্যের সর্বত্র অনিন্দ্য সুন্দরইমারত নির্মাণ করেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে বিভিন্ন স্থানে নির্মিত মসজিদসমূহে।[৫২৩]

ঢাকার বিনত বিবির মসজিদের (১৪৫৭ খ্রি.) শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি ময়মনসিংহের ঘাগরা, হুগলি, সাতগাঁ, পুরাতন মালদার মুঘলটুলী অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫২৪] উল্লেখ্য যে, সাধক সেনাপতি শাসক খান জাহান আলী খুলনার বাগের হাট অঞ্চলে সুলতান মাহমুদ শাহের রাজত্বে

---

৫২০. Syed Mahmudul Islam, *Architecture of Pre-mughal Bengal*, University Press Ltd. 1979, P. 422

৫২১. Syed Mahmudul Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh*, Dhaka:Islamic Foundation of Bangladesh, 1987, P. 231

৫২২. Syed Mahmudul Hasan, *Dhaka The City of Masques*, Dhaka:Islamic Foundation of Bangladesh, 1981. P. 206

৫২৩. A. H. Dani, *Muslim Arohitecture of Bengal*, Dhaka-1961, P.206

৫২৪. মোঃ আব্দুর রশীদ, *ঢাকা মহানগরীর মসজিদ নির্দেশিকা*, ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

খলিফাতাবাদ নামে একটি শহরই প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেখানে অসংখ্য জলাশয়, বাসস্থান, রাস্তা, মসজিদ ও মাযার নির্মাণ করেন। কতিথ আছে যে, এ সময় বাগের হাট অঞ্চলে ৩৬০টি মসজিদ নির্মিত হয় যার বেশির ভাগই আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বিখ্যাত ষাট গম্বুজ মসজিদ, নয় গম্বুজ, সিঙ্গার মসজিদ, বন বিজয়পুর মসজিদ এখনো কালের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।[৫২৫] মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র বরবক শাহ ১৪৭৪ স্ত্রীর সিংহাসনের আরোহণ করেন। বরবক শাহের আমলে অসংখ্য শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। যার পাঠোদ্ধার করে জানা যায় তিনি সমগ্র রাজ্যে ১৪টি মসজিদ ও ১টি ফটক নির্মাণ করেন। ত্রিবেনীর হুগলী, বীরভূমের বারা, দিনাজপুরের দেহতলা ও মাহি সন্তোষ, গৌড়ের শ্রীরামপুর, শ্রীহট্টের হাটখোলা, বাকেরগঞ্জের মির্জাগঞ্জ, ঢাকার পারিল, চট্টগ্রামের হাটহাজারী, ময়মনসিংহের গরাই প্রভৃতি অঞ্চল থেকে উদ্ধারকৃত শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে।[৫২৬]

বরবক শাহের পুত্র সুলতান ইউসুফ খান রাজধানী গৌড়কে বিভিন্ন অনিন্দ্য সুন্দর ইমারত দ্বারা সুশোভিত করেন। তাঁর আমলে ১০টি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এর প্রায় অংশ মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত তাঁর অমর কীর্ত হচ্ছে গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ ও মাদ্‌রাসা রাজশাহীর সুলতানগঞ্জের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ।[৫২৭]

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে মুসলিম স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়, যা হোসেন শাহী আমলকে ছাড়িয়ে যায়। সুলতান ফতেহ শাহ একজন শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁর আমলে উৎকীর্ণ অসংখ্য শিলালিপি ঢাকার ধামরাই, রামপাল ও সোনার গাঁ, রাজশাহীর হেতেশখান, গৌড়ের মাহাদীপুর এবং হুগলী জেলার সাতগাঁও থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলিতে বেশিরভাগই মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে।[৫২৮] গৌড়ের গুণমন্ত্র মসজিদটি (১৪৮৪ খ্রি.) এখনও স্থাপত্য কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে। এ প্রসেঙ্গ উল্লেখ্য যে, লেখক বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও প্রকাশ করে তাঁর রাজত্বকাল ১৪৮৭ খ্রি. পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন এবং বলাই বাহুল যে, এই শিলালিপিটি কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের গাঁয়ে ছিল।[৫২৯] ফতের শাহের মৃত্যুতে পরবর্তী ইলিয়াস শাহ্ রাজত্বের অধঃপতন হয় এবং তাঁকে হত্যা করে হাবশী সুলতান শাহজাদা, গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। মোট চারজন হাবশী সুলতানের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতাপশালী ছিলেন ফিরোজ শাহ (দ্বিতীয়) এবং মুজাফ্‌ফর শাহ। তাঁরা ১৪৮৬ খ্রি. থেকে ১৮৯৩ খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ফিরোজ শাহের আমলে বাংলার সর্বত্র ইমারত নির্মিত হয়। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, দিনাজপুরের বিরল, গৌড়ের গোয়ামালতী, পুরাতন মালদা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মসজিদের শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। ফিরোজ শাহের অসামান্য স্থাপত্যকীর্তি হচ্ছে গৌড়ের ফিরোজ মিনার (১৪৭৯-৯০ খ্রি.) এবং একটি মসজিদ যা আজ ধ্বংস প্রাপ্ত। রিয়াজ-উস-সালাতীনে উল্লেখ আছে যে, তিনি একটি মসজিদ এবং একটি জলাধার গৌড় নগরীতে নির্মাণ করেন। ফিরোজ

---

৫২৫. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা:আধুনিক প্রকাশনী, পৃ. ৮৩
৫২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৫২৭. মোঃ আব্দুলণ্ঢাহ, *মসজিদের বিধানাবলী*, ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২০
৫২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৫২৯. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সিদিবদর নামক একজন হাবশী তাকে হত্যা করে মুজাফ্ফর শাহ উপাধী ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার তিন বছরের (১৪৯০-৯৩ খ্রি.) রাজত্বকালে স্থাপত্যকলার প্রসার অব্যাহত থাকে। তাঁর আমলের শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে দিনাজপুরের দেবীকোর্টে নির্মিত শাহ আতার দরগাহে ভাগলপুর জেলার চম্পা নগর এবং গৌড়ে। এই সমস্ত শিলালিপি মসজিদ সংক্রান্ত ছিল।[৫৩০]

স্বাধীন বাংলার স্বর্ণযুগের সূচনা হয় হোসেন শাহী আমলে। ১৪৯৩ খ্রি. হাবশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অসাধারণ প্রতিভাধারী আলাউদ্দীন হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদান রাখেন। ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রি. পর্যন্ত ৩৫ বৎসরের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলায় কেবল তাঁর আধিপত্যই কায়েম হয়নি, বরং তিনি সাহিত্যও শিল্পকলার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠ-পোষকতাও করেন। তার আমলের অসংখ্য মুদ্রা ও শিলালিপি অবিস্কৃত হয়েছে।[৫৩১] শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি তার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, মাযার, ফটক, দূর্গ, পুল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ করেন। অপর কোন সুলতানের আমলে এত শিলালিপি খোদিত হয়নি। শুধু বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই নয় বিহারের পাটনা, ভাগলুপর সারণ প্রভৃতি স্থান থেকেও শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর আমলে বিখ্যাত ইমারত বিশেষ করে মসজিদ এখনো দেখা যায়। যেমন গৌড়ের লোটান মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, ফরিদপুরের রুকুন খানের মসজিদ, সোনার গাঁয়ের গোয়ালদি মসজিদ এবং চট্টগামের পরাগলপুরের ছুটি খানের মসজিদ।[৫৩২] জনাব সামস উদ্দীন আহম্মদ তার গ্রন্থ inscriptions of Bengal. Vol-iv এ ১৪১৯ খ্রি. থেকে ১৫১৯ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালে উৎকীর্ণ অসংখ্য শিলালিপির বর্ণনা করেছেন। হোসেন শাহী স্থাপত্য রীতির উদ্ভাবক সুলতান আলাউদ্দীন ছিলেন শিল্পানুরাগী। তাঁর এই অসাধারণ গুণ তাঁর পুত্র নসরত শাহ লাভ করেন। নসরত শাহ পিতার মত জ্ঞানীগুণী, স্থাপতি ও কারিগরদের সমাদর করতেন। তাঁর আমলে চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানদের দখলে ছিল এবং সেখানে নসরত শাহ যে প্রসাদ ও মসিজদ নির্মান করেছেন তা বহুদিন আগেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।[৫৩৩] তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি তাঁর স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন বহন করেছে। গৌড়, সোনারগাঁ, বর্ধমানের মঙ্গলকোট, মালদার, মৌলনাতলী, মালদা শহর ও দেওতলা, মুর্শিদাবাদ, পাবনার নবগ্রাম, ঢাকার আসরফপুর, হুগলীর সাতগাঁও, সন্তোষপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে অসংখ্য শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে। এই সমস্ত শিলালিপি বেশির ভাগই মসজিদে নির্মাণের স্বাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে ধরা যায়।[৫৩৪] তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহীর বাবা মসজিদ, গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ ও কদম রাসূল সৌধ, পাবনার নবগ্রাম মসজিদ হযরত পাণ্ডুয়ার নূর কুতুবউল আলমের চিল্লাখার মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৫৩৩ খ্রি. তৃতীয় ফিরোজ শাহ তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং

---

৫৩০. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ১২১

৫৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৫৩২. R. C. Majumdar, *History of Bengal*, Vol-1, P.18

৫৩৩. *বাংলাদেশের লোক স্থাপত্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ১৯৮৫

৫৩৪. M.M. Chakravarti, Pre-Mughal Mosques of Bengal, Journal of Asiatic Socity of Bengal, 1910, p. 277

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী পর্যায়ে তার চাচা তৃতীয় মাহমুদ শাহ তাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তার আমলে ময়মনসিংহের জাওয়ারা ও গৌড়ের সাদুল্লাপুরে মসজিদ নির্মিত হয়। সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে শের শাহ ১৫৯২ খ্রি. গৌড় অধিকার করলে হোসেন শাহী বংশের পতন হয়।[৫৩৫]

শেরশাহ শূরী স্বাধীন সুলতানী আমলের রাজধানী গৌড় অধিকার করার পর থেকে ১৫২৮ খ্রি. প্রাক-মুঘল যুগের অবসান হয়। এরপর বাংলার সম্পদ অধিকার করেন কররানী বংশ। সূর বংশের সুলতানদের পরাজিত করে কররানী শাসন কায়েম হয়। এবং দাউদ খান কররানীকে রাজমহলের যুদ্ধে পরাস্ত করে ১৫৭৬ খ্রি. বাংলাদেশকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুঘল শাসনামলে বাংলাদেশে অসংখ্য মসজিদ, মিনার, মাযার, দূর্গ, হাম্মামখানা, পুল, ঈদগাহ, সরাইখানা নির্মিত হয়েছে। ১৬০৮ খ্রি. বাংলাদেশের রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে মুঘল স্থাপত্য রীতি ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে। মুঘল স্থাপত্যকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, মুঘল রাজত্বে বাংলা একটি প্রদেশ বা সুবায় পরিণত হয়।[৫৩৬] ফলে স্বাধীন আমলে স্বকীয় এবং আকর্ষণীয় পোড়ামাটির ইটের তৈরি মসজিদ ও এর অলংকরণের যে ধারা চলে আসছিল তা ব্যাহত হয়। মুঘল স্থাপত্য কীর্তিতে সুলতানী এবং দিল্লী, আগ্রা, লাহোরের রাজধানীর মুঘল স্থাপত্য শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটে। এই সময়ে পোড়ামাটির অলংকরণ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পলেস্তারার প্রচলন হয়।

কুমিল্লার বড় গোয়ালীতে নির্মিত মসজিদটি সম্ভবত সর্বপ্রথম মুঘল ইমারত। গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। এই ইমারতের অনুকরণে পরবর্তীকালে বগুড়ার শেরপুর বিবি মসজিদ, ময়মনসিংহের এগার সিন্ধুতে সাদীর মসজিদ, ঢাকার আল্লাকুরী মসজিদ সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। মুঘল যুগের প্রথম দিকে বাংলায় যে সমস্ত মসজিদ স্থাপিত হয়। যেমন ১৫৫৮ খ্রি. কুসুম্বা মসজিদ, বগুড়ার খেরুয়ার মসজিদ (১৫৮২ খ্রি.) বগুড়ার শেরপুরের খন্দকার তোলা মসজিদ (১৬৩২ খ্রি.) ঢাকার খাওয়াজা শাহবাজের মসজিদ, (সপ্তদশ শতাব্দী), পাবনার চাটমোহরের মাসুম খাঁন কাবুলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ (১৫৮২ খ্রি.) প্রাক-মুঘল স্থাপত্য রীতি প্রভাবে লক্ষ্য করা যায়।[৫৩৭]

আর. ডি. ব্যনার্জী বলেন, æThe last two capitals of the Mughal Subahs of Bengal (Rajmahal and Dhaka) contain a nery large momber of mosques in the Deccani style of the later Muhammadan arohitecture in Dacca the local People have give the name Shista Khani to this partieula style."

শায়েস্তাখান বাংলার সুবায় দুইবার সুবেদারের দায়িত্ব পালন করেন। একবার ১৬৬৩ খ্রি. থেকে ১৬৭৮ খ্রি. এবং দ্বিতীয়বার ১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রি. পর্যন্ত। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী ঢাকা এবং প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়। ঢাকায় নির্মিত শায়েস্তাখানের মসজিদ, লালবাগ দূর্গের মসজিদ,

৫৩৫. C.D. Oyly. *Antiquities of Dacca.* 1824, p. 248

৫৩৬. M. Abid Ali Khan, Op.cit. P. 277

৫৩৭. Nazimuddin Ahmed, Edited by John Sarday, *Discover the Momments of Bangladesh*, 1986, p. 478

Dhaka University Institutional Repository

সাত মসজিদ, খাওয়াজা শাহবাজের মসজিদ, চকবাজারে শাহী মসজিদ, কাওরান বাজারের মসজিদ ছাড়াও চট্টগ্রামের আন্দর কিল্লার নির্মিত জামে মসজিদসহ অসংখ্য মসজিদ শায়েস্তা খানের শিলা ফলক প্রতি উদার মনোভাবের পরিচয় বহন করে।[৫৩৮]

ব্রাউলি বার্ট বলেন, His (Shaista Khan) rule was the period at Dacca's greatest prosperity. Noble building designed and executed with all the skill at Muhammadan art rose to beauti by the city...."

সুলতানী শাসনামলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মসজিদসমূহ

ঢাকা, বিনত বিবির মসজিদ, ১৪৫৭ খ্রি.

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের আমলে ঢাকার নারিন্দা অঞ্চলে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিলালিপি অনুযায়ী এই মসজিদটি ১৪৫৯ খ্রি. মারহামাতের কন্যা বিনত বিবি কর্তৃক নির্মিত হয়। সম্ভবত বাংলাদেশে এত প্রাচীন মসজিদ অন্য কোথাও নেই। বর্তমানেএই মসজিদটি সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে আদি রূপ নির্ণয় করা দুরূহ হলেও এই মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার ধরনের ছিল।[৫৩৯]

বাগেরহাট (খুলনা) ষাট গম্বুজ মসজিদ, ১৪৫৯

বাংলাদেশের সর্ববৃহতৎ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতানী ইমারতের নির্দশন রয়েছে বাগেরহাটে। সাধারণভাবে এটি ষাট গম্বুজ মসজিদ নামে পরিচিত। সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে সৈনিক খান জাহান আলী সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করে বসতি স্থাপন করেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বাগেরহাটে তাঁর অসামান্য কীর্তিসমূহ ও তাঁর অসামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাগের হাটে জনশ্রুতি আছে যে, ৩৬০টি মসজিদ যে তিনি নির্মাণ করেছেন এককথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না তবে তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ খুলনা ও যশোর জুড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেন। বহুকীর্তিই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং যেগুলি এখনও অক্ষত আছে তা স্থাপত্য শৈলীর এক অনুপম নির্দশন বলা যায়। বাগেরহাট ছিল খলিফাতাবাদ এবং এখানে খানজাহান আলীর প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। তাঁর মাজারে রক্ষিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৪৫৯ খ্রি. ইন্তেকাল করেন। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে তিনি ষাট গম্বুজ ও এর আশে পাশে অসংখ্য মসজিদ ও বিভিন্ন ইমারত স্থাপন করেন।

ঘোড়াদীঘির পূর্বদিকে ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের সুলতানী স্থাপত্যের অসাধারণও গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি। মসজিদটি আয়তনে পূর্ব-পশ্চিমে ২০৮ফুট এবং উত্তর দক্ষিণে ১৬০ ফুট। সম্পূর্ণ পোড়ামাটির ইটের তৈরি এই বিশালাকার মসজিদটির দেয়াল ৯ ফুট পুরু, বাগেরহাটের সর্ববৃহৎ মসজিদের চারিপাশে একটি বেষ্টনী বা প্রাচীর ছিল। পূর্ব দিকের খিলান সম্বলিত সুউচ্চ প্রবেশ তোরণ এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে।

৫৩৮. Sayed Hasan, Op.cit. P. 627

৫৩৯. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

তথা কথিত ষাট গম্বুজ মসজিদটির বিশালত্ব দেখে অনেকে একে "দরবার কক্ষ" বলে অভিহিত করেন। কিন্তু মসজিদের সকল উপকরণ লিওয়ান, মিনবার, হিজরার প্রভৃতি থাকায় এটি অবশ্যই একটি মসজিদ। তবে মসজিদটি সামাজিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজেও ব্যবহৃত হত। সম্ভবত খান জাহান এখানে তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে সভা করতেন। এই অপূর্ব সুন্দর মসজিদটি সুলতানী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মসজিদ যাতে তুগলকীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাব পড়েছিল। বহু গুম্বুজ বিশিষ্ট বিশালাকার মসজিদ হিসেবে এবং স্থাপত্যিক ও অলংকরণের দিক থেকে বাগারহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদটি খান জাহানের অমরকীর্তি।[৫৪০]

গোপালগঞ্জ (দিনাজপুর) মসজিদ, ১৪৬০ খ্রি.

১৪৫০ খ্রি. নির্মিত দিনাজপুরের গোপালগঞ্জের মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট চতুষ্কোণী ধরনের। প্রাক-মুঘল যুগে সুলতানী আমালে এ ধরণের ভিত্তি ভূমির উপর অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়। বিনত বিবির মসজিদটি সম্ভবত প্রথম কিন্তু গোপালগঞ্জের মসজিদটিতে সর্বপ্রথম পূর্বদিকে বারান্দা স্থাপিত হয়। কিবলা প্রাচীরে তিনটি অবতল মিহরাব রয়েছে এবং এই মসজিদে পাথরের ব্যবহার ইমারতের শ্রীবৃদ্ধি করেছে।[৫৪১]

গৌড় (ফিরোজপুর, চাপাই নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী) দরসবাড়ী মসজিদ ও মাদ্‌রাসা (১৪৭৯ খ্রি.)

চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের ফিরোজপুর এলাকা প্রাচীন গৌড়ের অংশ বিশেষ। ১৯৪৭ খ্রি. বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে গেলে এই অঞ্চলে সুলতানী আমলের কতিপয় আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত মসজিদ রয়ে যায়। এই সমস্ত সুন্দর ইমারতগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন হচ্ছে দরসবাড়ী মসজিদ ও মাদ্‌রাসা। 'দরস' কথার অর্থ মুখস্থ করা এবং এই শব্দ থেকে মনে হয় এই অঞ্চলে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্‌রাসার সংলগ্ন মসজিদটি দরসবাড়ী মসজিদ নামে পরিচিত। শিলালিপি থেকে জানা যায়, মসজিদটি সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বে ১৪৭৯ খ্রি. নির্মিত হয়। ইতিহাসবিদ দানী এই মসজিদের অলংকরণের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। পার্সি ব্রাউন আহমদাবাদের সিদি সৈয়দ মসজিদের অলংকরণের সঙ্গে দরসবাড়ী মসজিদের অলংকরণের তুলনা করেন। [৫৪২]

রামপাল (ঢাকা), বাবা আদমের মসজিদ (১৪৮৩ খ্রি.)

বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহী শাসনামলের (১৪৩৭-১৪৮৭ খ্রি.) নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে বাবা আদমের মসজিদটি পুরাতন স্মৃতি নিয়ে টিকে আছে। কিন্তু এর মূল কাঠামো বর্তমানে পরিবর্তন করা হয়েছে। এ মসজিদটি বৃহত্তর ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপালে অবস্থিত। যদিও মসজিদটি সংস্কার করা হয়েছে তথাপি এখনও তাঁর পুরাতন চিহ্ন রয়ে গেছে। উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে ১৪৮৩ খ্রি. জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ (১৭৮১-৮৬ খ্রি.)-এর শাসনামলে।[৫৪৩]

---

৫৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৬
৫৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৫৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭
৫৪৩. Muhammad Hafizullah Khan, op.cit., P.150-51. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

Dhaka University Institutional Repository

কথিত আছে, যে স্থানে বাবা আদম নামায পড়তেন ঠিক সেই স্থানটি নির্বাচন করে মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদটি ইস্টক মসৃন ও কারুকার্য খচিত। পূর্বে ছয়টি গম্বুজ পুরোভাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত। বর্তমানে মাত্র তিনটি গুম্বুজ বিদ্যমান। বক্রী তিনটি ভূমিকম্পে ছাদসহ ধ্বংসের পথে রয়েছে। মসজিদের মধ্যস্থিত দু'টি প্রস্তর স্তম্ভ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মসজিদে প্রবেশ করলেই দ্বারের দুই পার্শ্বে এ স্তম্ভ দুটি পরিদৃষ্ট হয়।[৫৪৪] মসজিদটি উচ্চতা ৭ হাত এবং পরিধি ৩ হাত। কথিত রয়েছে, মসজিদের গায়ে মূল্যবান মনি রত্ম ছিল। মগেরা তা লুণ্ঠন করে নিয়েছে। এক সময়ে ফায়জুদ্দীন খন্দকার, মফিজুদ্দীন দেওয়ান এবং আইনুদ্দীন খন্দকার এ মসজিদের খাদিম ছিলেন। মসজিদটি মেরামত করার ফলে মসজিদের প্রধান রূপ আর নেই।[৫৪৫]

যদিও পূর্বে এ অঞ্চলে মুসলিম জনবসতি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। তথাপি হযরত আদম শহীদের মসজিদ যে স্থানে অবস্থিত সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ হিন্দু রাজধানী রামপাল ও তৎপাশ্ববর্তী স্থানসমূহে বর্তমানে মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন অধিবাসী নেই বললেই চলে।[৫৪৬]

বাবা আদম শহীদের মসজিদের শিলালিপির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই সব মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই, অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করনা।" রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যিনি দুনিয়াতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ তা'আলা বেহেস্তে তাঁর জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র জালাল-উদ-দুন-ইয়া, ওয়াদ দীন- সুলতান আবদুল মুজাফ্ফর ফতেহশাহের আমলে মহান রাজা মালিক কাফুর ৮৮৮ হিজরীর রজব মাসের মাঝামাঝি তারিখে এ জামি' মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫৪৭]

মসজিদটি আয়তাকার, এর দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট ও প্রস্থ ৩৬ ফুট। চার কোণায় অষ্টভূজ আকৃতির টাওয়ার রয়েছে। দেয়ালগুলো কিছুটা ঢালু এবং কুলুঙ্গি খাঁজ কাটা। পরে এগুলো অলঙ্করণ করা হয়েছে। পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। পশ্চিমের দেয়ালে তিনটি মিহরাব বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় মিহ্রাবটি অন্য দু'টি মিহ্রাবের তুলনায় অধিকতর বড়। প্রবেশ পথের উপরে দু'টি অলঙ্কারিক প্যানাল রয়েছে। মসজিদের ভেতরে দু'টি স্তম্ভ পথ রয়েছে এবং দু'টি পাথরের স্তম্ভের মাঝখানে একটি স্তম্ভ পথ রয়েছে।[৫৪৮]

প্রাচীন মিহরাবটি এবং দু'পার্শ্বের দু' মিহরাবের পার্শ্বে দেয়াল জুড়িয়া লতা-পাতা, জ্যামিতিক নকশা ও গোলাপ ফুল, ঝুলন্ত প্রদীপ ও শিকল প্রভৃতি উপকরণ পরিদৃষ্ট হয়। সুলতানী আমলের মসজিদে কোন বারান্দা ছিল না এবং খোলা চত্বরও ছিল না। ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের

---

৫৪৪. যোগেশ নাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা: কথারূপ লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৪০৪

৫৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫

৫৪৬. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, *মুন্সিগঞ্জ- বিক্রমপুরের ইতিহাস*; ঢাকা: মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর, গবেষণা পরিষদ, ওয়ারী, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ.৩৭২

৫৪৭. মুন্সী আলী রহমান তায়েশ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৪

৫৪৮. Muhammad Hafizullah Khan, op.cit., p. 151

Dhaka University Institutional Repository

বহু মসজিদ রয়েছে। যেমন হাটহাজারী মসজিদ (১৪৭৪-৮১ খ্রি.), যশোরের শৈলকুপার মসজিদ।[৫৪৯] এফ. বি. ব্রাডলি বার্ট বলেন, "পূর্ব বাংলার মুসলিম শক্তি চুড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠার পর বিজয়ী মুসলমানগণ বাবা আদমের হত্যাস্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।"[৫৫০] Dr. Nazimuddin Ahmed বলেন, "It displays the fully mature form of the Regional style, with faceted, octagonal turrets at each corner's, a gracefully curved cornice and both the facade and the three mihrabs, beautiful terracotta floral and hanging patterrs, are all features that can be found in the eklake tomb in padua."[৫৫১] এ মসজিদটি স্থানীয়ভাবে বাবা আদম শহীদের মসজিদ নামে পরিচিত। এ মসজিদের পাশেই ছিলেন অত্যন্ত শীর্ষ স্থানীয় সাধক-দরবেশ। বল্লাল সেনের রাজত্বকালে বাবা আদম শহীদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে আগমন করেন এবং বল্লাল সেনের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।[৫৫২] বাংলায় ইসলাম প্রচার মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন এ সমস্ত সূফী- দরবেশগণ। যাদের অধিকাংশই এসেছিলেন পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে।[৫৫৩] বাংলাদেশে যে সমস্ত মনীষী ইসলাম প্রচার করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, বাবা আদম শহীদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তাঁর শাহাদাত স্থানে মসজিদটি নির্মিত হয়।

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

হাটহাজারীতে সুলতানী আমলের একটি ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তকার মসজিদ নির্মিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থাপিত এই ইমারতটি বাবা আদমের মসজিদের অনুকরণে নির্মিত। সুলতান ইউসুফ শাহের আমলের এই মসজিদটির ধ্বংসবশেষ পাওয়া যায়।

কসবা (বরিশাল) মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার কসবা নামক স্থানে একটি বহু গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ দেখা যায়। এই মসজিদটির সঙ্গে বাগেরহাটের নয় গম্বুজ এবং মসজিদ কুড়েরের নয় গম্বুজের সাদৃশ্য রয়েছে। চার কোনায় গোলাকার বরুজ, ছোট ছোট গম্বুজ এবং বক্রাকার কার্নিশ কসবা মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গৌড় (ফিরোজপুর, চাপাই নওয়াবগঞ্জ) রাজবিবি মসজিদ, পঞ্চাদশ শতাব্দী

গৌড়ের অন্যতম সুন্দর ও কারুকার্য মণ্ডিত ইমারত হচ্ছে রাজবিবি মসজিদ, এক গম্বুজ বিশিষ্ট, চতুষ্কোনী মসজিদ। ভূমি পরিকল্পনার নির্মিত এই মসজিদটি মালদার গৌড়ের চামকাটি মসজিদের অনুরূপ। এই ধরণের অসংখ্য মসজিদ বাংলাদেশের সর্বত্র নির্মিত হয়, যেমন ঢাকার বিনত বিবির মসজিদ, বাগের

৫৪৯. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশের মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৫৫০. এফ. বি. বার্ডলি বার্ট, অনু রইসুদ্দীন সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৪

৫৫১. Dr. Nazimuddin Ahmed, *Discovery the monumenty of Bagladesh*, op.cit., P.159

৫৫২. Habiba Khatun, op.cit., P.118; Ahmud Hasan Dani, *Muslim architecture in Bengal*, op.cit., P.154; ড. আবদুল করীম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

৫৫৩. ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা:মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

হাটের খান জাহান আলীর মসজিদ ইত্যাদি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই মসজিদটি সংস্কার করেছে। বিভিন্ন ধরণের অলংকরণ এই মসজিদটির শোভা বৃদ্ধি করেছে।

ধনচক (ফিরোজপুর, চাপাই নওয়াবগঞ্জ) মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

রাজবিবি মসজিদের অদূরে ধনচক মসজিদ অবস্থিত। ধন বা ধূনী অর্থ তুলার কারিগর। ধনচক মসজিদটি আয়তকার তিনি গম্বুজ বিশিষ্ট। এই মসজিদটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও সুলতানী আমলের সকল স্থাপিত্যক বৈশিষ্ট্য এতে দেখা যায়। পাথরে খোদাই করা নক্সার পাশাপাশি পোড়ামাটির অলংকরণ মিহরাব প্রাচীরের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। বহু পূর্বেই গম্বুজ তিনটি পরে গেছে। এক আইল বিশিষ্ট তিন গম্বুজ সমন্বিত আয়তাকারে মসজিদ হিসেবে ধনচক মসজিদটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পূর্ববর্তী যুগে এ ধরণের অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। যেমন, মুঘল আমলের শেরপুরের (বগুড়া) খেরুয়অ মসজিদ এবং ঢাকার লালবাগ কেল্লার মসজিদ ও মোঃপুরের সাত মসজিদ।[৫৫৪]

মসজিদ কুড়ের (খুলনা) মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

খুলনা চাঁন্দখালীর দক্ষিণে কপোতাক্ষ নদী তীরে মাটি থেকে খনন করে একটি নতুন মসজিদ আবিস্কৃত হয়েছে। মাটি থেকে খুড়ে উদ্ধার করা হয়েছে বিধায় এই মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে মসজিদ কূড়। ওয়েস্টল্যান্ড বলেন, "The building thus found proclaims at the first glance that it owes its origin to the same hand which build the sath Gumbaz"

মসজিদ বাড়ী (বরিশাল) মসজিদ, ১৪৬৫ খ্রি.

বরিশালের মসজিদ বাড়ী মসজিদটি সুলতান বরকত শাহের আমলে নির্মিত। একটি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, জনৈক আয়জল খান ১৪৬৫ খ্রি. মির্জাগঞ্জের অদূরে মসজিদবাড়ী নামক স্থানে এই মসজিদিটর প্রতিষ্ঠাতা।[৫৫৫]

বাগেরহাট খান জাহান আলীর মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

বাগেরহাটের সাধক সুফী খান জাহান আলী ছিলেন সুন্দরবন অঞ্চলের একজন প্রতাবশালী সেনাপতি ও শাসক। তাঁর সমাধী বাগেরহাটের ঠাকুর দীঘির পাশে নির্মিত হয় এবং সমাধিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে থেকে জানা যায় যে ১৪৫৯ খ্রি. সুলতান মাহমুদ শাহের রাজত্বে তিনি সমাহিত হন। এই মাজারের পশ্চিম দিকে খান জাহানের মসজিদ অবস্থিত। [৫৫৬]

বাগেরহাট সিস্তরা মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

৫৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
৫৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
৫৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত ষাট গম্বুজ মসজিদের প্রায় ৩০০ গজ দক্ষিণ পূর্বে সুন্দঘোণা গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানে সিঙরা মসজিদ নির্মিত হয় খান জাহান রীতিতে বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি স্থাপিত হয়। বলাই বাহুল্য যে, বাগেরহাটের অন্যান্য ইমারতের সমসাময়িক ছিল এই মসজিদটি।[৫৫৭]

বাগেরহাট, বিবি বেগিনীর মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

ঘোড়াদীঘির পশ্চিমপাড় থেকে ৩০০ গজ পশ্চিমে বাগেরহাটের খান জাহানের অপর একটি কীর্তি দেখা যাবে। বিবি বেগিনীর মসজিদ নামে পরিচিত এই স্থাপত্যকীর্তি খান জাহানের রীতিতে নির্মিত। এটি সিঙরা মসজিদের অনুকরণে নির্মিত বলে মনে হয়।[৫৫৮]

বাগেরহাট রন বিজয়পুর মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

বাগেরহাটে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইট ও পোড়ামাটির নক্সা দ্বারা যে খান জাহানী রীতি প্রবর্তিত হয় তার একটি অসামান্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে রণবিজয়পুর মসজিদ। সনাতনী বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারত হলেও রনবিজয়পুর মসজিদটি আকারে পূর্ববর্তী অনুরূপ মসজিদ অপেক্ষা বৃহৎ। মসজিদের গঠন প্রণালী, উপাদাসমূহের বিন্যাস এবং অলঙ্করণের সৌকার্য সুলতানী স্থাপত্যকলার ঐশ্বর্যই প্রকাশ করে।[৫৫৯]

শাহজাদপুর (পাবনা) মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

পাবনা জেলার প্রখ্যাত সুফী দরবেশ মাখদুম শাহ-দৌলা শহীদ কর্তৃক শাহমাদপুরে একটি অপূর্ব সুন্দর মসিজদ নির্মিত হয়েছে। আয়তাকার বহু গম্বুজ বিশিষ্ট ভূমি পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত শাহগজাদপুরের মসজিদটি সুলতানী আমলের স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক। গঠন শৈলীর দিক থেকে এই মসজিদটি ত্রিবেনীর জাফর খান জাগীর মসজিদ গৌড়ের তাঁতি পাড়া, রামপালের বাবা আদমের মসজিদের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে।

মুয়াজ্জমপুর (ঢাকা), মসজিদ, ১৪৩৫-৩৬ খ্রি.

ঢাকা শহরের ২০ মাইল উত্তরে মুয়াজ্জেমপুর গ্রামে একটি সুলতানী আমলের মসজিদ রয়েছে। এই ইমারত থেকে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন শিলালিপি থেকে জানা যায় সুলতান আহমদ শাহের আমলে (১৪৩৫-৩৬) এই আয়তাকার ৬ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নির্মিত হয়। এই মসজিদটি শাহ লঙ্গরের দরগার সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল।[৫৬০]

দেবীকোট (দিনাজপুর), রুকুন খানের মসজিদ, ১৫১২ খ্রি.

---

৫৫৭. প্রাগুক্ত।
৫৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৫৫৯. প্রাগুক্ত।
৫৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মসজিদ স্থাপত্য বাংলাদেশে একটি বিশেষরীতিতে পরিণতই হয়নি বরং এর ব্যাপকতা মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশকেই ইঙ্গিত করে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সর্বত্র মসজিদ নির্মিত হয়েছে বিশেষ করে হোসেন শাহী বংশের পৃষ্ঠপোষকতায়। এই যুগের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ স্থাপিত হয় দিনাজপুরের দেবীকোটে। শিলালিপি অনুযায়ী ১৫১২ খ্রি. হোসেন শাহের রাজত্বে রুকুন খান কর্তৃক মৌলানা আতার দরগার সংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মিত হয়। শিলালিপি থেকে থেকে জানা যায় যে, শেখ আল মাশায়েখ শেখ আতার (মাজারের) দরজার সম্মুখে আলাউদ্দীন উপাধী ধারী রুকুন খান একটি মসজিদ এবং মিনার প্রতিষ্ঠা করেন।" এতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে মসজিদ সংলগ্ন মিনার নির্মিত হয়, যদিও গৌড়ের ফিরোজা মিনার এবং ছোট পাণ্ডুয়ার মিনার ছাড়া আর কোন মিনার দেখা যায় না।[৫৬১]

হাজী বাবা সালেহের মসজিদ ১৫০৫-০৬

হাজী বাবা সালিহ সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে একজন কর্মকর্তা হিসেবে পরিচালিত ছিলেন। হাজী বাবা সালিহ নিজেকে একজন আমীর হিসেবে বর্ণনা করেন। হাজী বাবা সালেহ বন্দরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। (১৫০৫-০৬ খ্রি.)।[৫৬২] মসজিদটি সুলতান হুসায়ন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) ১৫০৫-০৬ খ্রি. নির্মিত হয়।[৫৬৩] হাজী বাবা সালেহের মসজিদের উৎকীর্ণ লিপিটির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ "আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয়ই সব মসজিদ আল্লাহ্র। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না। আস-সুলতান 'আলা-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবূল মুজাফফর হুসাইন শাহের আমলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাজ্যকে স্থায়ী করেন। শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত রাজা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেবক উভয় পবিত্র স্থানের হজ্জ আদায়কারী ও উভয় পদচিহ্নের যিয়ারতকারী হাজী বাবা সালেহ ৯১১ হিজরীতে এ মসজিদ নির্মাণ করেন। ৯১১ হি.।"[৫৬৪]

নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে বন্দর নামক স্থানে হাজী বাবা সালেহের মসজিদ অবস্থিত- এ স্থান মসজিদ বাড়ি হিসেবে পরিচিত। এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। দৈর্ঘ্য ২৯ ফুট, প্রস্থ ২৬ ফুট এবং প্রাচীর ৫ ফুট চওড়া।[৫৬৫] মসজিদটি পরে নতুনভাবে সংস্কার করা হয়েছে এবং বড় করা হয়েছে। মসজিদের পূর্বদিকে বারান্দা সংযুক্ত করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালটি আদি রূপ প্রমাণ করে।[৫৬৬]

---

৫৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৫৬২. ফজল মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৫৬৩. Ayesha Begum, inscriptions, ed., A.B.M. Hosoin, *Sonargaon-panam*, op.cit., P.153

৫৬৪. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *তাওরীখে ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৫৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৫৬৬. Perween Hasan, Muslim architecture, ed., A.B.M. Hosain, *Sonargaon-panam*, op.cit., P.74

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের পূর্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি প্রবেশ পথ রয়েছে। পূর্বদিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি পাশ্ববর্তী দু'টি প্রবেশ পথ থেকে আকারে বড়। পশ্চিমের দেয়ালে ৩টি মিহরাব রয়েছে এবং মধ্যবর্তী মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী দু'টি মিহরাব থেকে আকারে বড়।[৫৬৭]

মূল গম্বুজের উত্তর-দক্ষিণ দিকে আরও দুটি গম্বুজ সংযোজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অপর দু'টি থেকে আকারে বড়। বৃত্তাকার ভিত্তির উপর গম্বুজগুলি প্রতিস্থাপিত এবং গম্বুজের চারদিকে মার্লিন শোভিত রয়েছে। গম্বুজগুলোর উপর উল্টানো পদ্ম এবং চুড়ায় কলস বসানো হয়েছে।[৫৬৮]

শিলালিপি ও ভূমি নকশা থেকে হাজী বাবা সালিহের মসজিদটিকে সুলতানী রীতির স্থাপত্য নির্দশন চিহ্নিত করা গেলেও মসজিদটিতে সুলতানী বাংলার অলঙ্করণ রীতির কোন প্রমাণই বর্তমানে টিকে নেই। কেবলমাত্র গম্বুজের গঠন শৈলী, পদ্ম ও কলসচূড়া থেকে সুলতানী রীতির বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।[৫৬৯]

হাজী বাবা সালিহ একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। ইসলাম ধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁর প্রমাণ মিলে নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকায় সল্প ব্যবধানে দু'টি মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, বন্দরশাহী মসজিদের শিলালিপিতে উল্লেখিত 'বাবা সালিহ' এবং আলোচ্য মসজিদের শিলালিপিতে উল্লেখিত হাজী বাবা সালিহ খুবই সম্ভব এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি যখন প্রথম মসজিদটি নির্মাণ করেন (১৪৮১ খ্রি.) তখন হয়ত হাজী ছিলেন না। কিন্তু হাজী বাবা সালেহের মসজিদের শিলালিপিতে 'মক্কা ও মদীনার যিয়ারতকারী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি হজ পালন করার পর এ মসজিদটি নির্মাণ করেন।[৫৭০] আলোচ্য মসজিদটি যে এলাকায় অবস্থিত সে স্থানটি বর্তমানে সালেহ নগর হিসেবে পরিচিত। স্থানীয় এলাকার নামকরণ ও স্বল্প ব্যবধানে দু'টি মসজিদ নির্মাণ থেকে ধারণা করা যায় তিনি একজন ঐতিহাসিক মহান ব্যক্তিত্ব যিনি সুলতানী আমলের একজন নিবেদিত ইসলাম প্রচারক ছিলেন। মসজিদটি সুলতানী বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের অনুপম সাক্ষ্য ও বন্দর শাহী মসজিদের উত্তরসুরী।[৫৭১]

গোয়ালদী (সোনার গাঁ) শাহী মসজিদ, ১৫১৯ খ্রি.

নারায়ণগঞ্জের সোনার গাঁ উপজেলায় আমিনপুর ইউনিয়নের গোয়লদী গ্রামে এ মসজিদটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এ মসজিদের নাম ছিল গোয়ালদী শাহী মসজিদ। ঢাকা চিটাগাং রোডের মুগড়াপাড়া থেকে ভেতরে উত্তর-পূর্ব দিকে গ্রামের ভেতরে মসজিদের অবস্থান। মসজিদের নির্মাণ কাল ১৫ শা'বান ৯২৫ হিজরী, ১২ আগষ্ট ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে মোল্লাহ হিজবর আকবর খান কর্তৃক সুলতান আলায়ুদ্দীন হুসাইন শাহের শাসনামলে মসজিদটি নির্মিত হয়।[৫৭২]

---

৫৬৭. কামর-ন্নেছা খন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৫৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৫৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৫৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

৫৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৫৭২. Pewen Hasan, Muslim architecture, ed., A.B.M. Hosain, *Sanargaon-panam,* op.cit., P.75

Dhaka University Institutional Repository

গোয়ালদী মসজিদটি বেলে পাথরের তৈরি যা একবার দেখলে বারংবার দেখতে ইচ্ছা করে। মসজিদটির দেয়ালে রয়েছে বিভিন্ন কারুকার্য প্রাকৃতিক দৃশ্যকে পাথরের নিপুণ কারুকার্যে ফুটিয়ে তুলা হয়েছে।[৫৭৩] Dani বলেন, "Today it makes a huge heep of Earth: but within the mound lie buried the beautifully carved mihrab stone, the ornamented pillars and many others floral motives on brick."[৫৭৪] Taifur বলেন, "It was a beautiful specimen of saracenic art, The mosques has only recently fallen down and its stone door frames, artistic mihrab, and pulpit and its inscription slab in beautiful cursive Arabic is thrown about there."[৫৭৫]

মসজিদ প্রধান আরবী রীতির সুন্দর ইমারত। ভেতরের পরিমান ১৬.৫ বর্গফুট এবং এর মাত্র একটি গম্বুজ। পশ্চিম দিকের প্রাচীরে তিনটি মিহরাব। মাঝখানের মিহরাব পাথরের তৈরি এবং দরজার পায়া পাথরের তৈরি। বর্তমানে এ মসজিদটি অত্যন্ত ভগ্নাবস্থায় রয়েছে।[৫৭৬] এ মসজিদের শিলালিপির হুবহু বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, সব মসজিদই আল্লাহ্র। অতএব, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। আল্লাহ্ সঠিক ব্যাপারে অধিকতর জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যিনি দুনিয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য বেহেস্তে ৭০টি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সৈয়দ আশরাফ আল-হুসায়নীর পুত্র সুলতান-উস-সালাতীনু সুলতান হুসায়ন শাহের আমলে আল্লাহ তা'আলা তার সম্রাজ্য ও শাসনকে চিরস্থায়ী করুন, এ মসজিদ নির্মাণ করা হয় ৯২৫ হিজরীর ১৫ই শা'বান তারীখে। মোল্লা হিজবর আকবর খান এ মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলমানদের উপদেশ দাতা মুহাম্মদ ফখরুল্লাহ্ শরীফ মুয়াজ্জমাবাদ ইকলীমের উজীর তাঁর সুনাম চিরস্থায়ী হউক।[৫৭৭]

দেয়াল সংলগ্ন পাথরের স্তম্ভ থেকে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে, মসজিদের পূর্বদিকে কোন বারান্দা দেখা যায় না। চার কোণায় গোলাকার তিনস্তর বিশিষ্ট বুরুজ রয়েছে। বক্রাকার কার্নিশ, দেয়ালে প্যানেল এবং পোড়া মাটির অলঙ্করণ মসজিদটির সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। প্রধান মিহরাবটিতে খোদিত রয়েছে লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি ঢাকার বিন্ত বিবির মসজিদ, বাগের হাটের খান জাহান আলীর মসজিদ এবং নারায়ণগঞ্জ বন্দরের এলাকার বাবা সালেহের মসজিদের

৫৭৩. ফজল মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৫৭৪. Ahmad Hahan Dani, *Muslim arehitecture in Bengal*, op.cit., P.237

৫৭৫. Syed Muhammad Taifur, op.cit., P.31

৫৭৬. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

৫৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরসুরী।[৫৭৮] দীর্ঘ দিন থেকে এ মসজিদে 'আযান ও নামায বন্ধ রয়েছে।[৫৭৯] এ মসজিদটি ১৮৫২ খ্রি. পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।[৫৮০]

অতীব দুঃখের বিষয় মসজিদে গিয়ে দেখা যায় এটি বর্তমানে অতীতের সাক্ষ্য হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। আলায়ুদ্দীন হুসায়ন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) এ মসজিদটি ছিল সোনার গাঁয়ের ইসলামী ঐতিহ্য ও স্থাপত্যের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু বর্তমানে তা ইতিহাসের পাতায়ই লিখিত আছে। মসজিদটিতে নামায চালু করার কোন পদক্ষেপই নেয়া হচ্ছে না। সরকারও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। সরকার ও এলাকাবাসী যদি উদ্যোগ নিয়ে মসজিদটি আবাদ করত- তবে সুলতানী আমলের মত এটি একটি ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হত। যেহেতু সোনার গাঁ ছিল ইসলামী স্থাপত্য ও ইসলাম প্রচারের স্বাধীন পূর্ব বাংলার প্রধান কেন্দ্র ভূমি।

ফিরাজপুর (চাপাই নওয়াবগঞ্জ) ছোট সোনা মসজিদ, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.

বাংলাদেশের মসজিদ স্থাপত্যের অনবদ্য সৃষ্টি এবং সাধারণভাবে "গৌড়ের অলংকার" হিসেবে পরিচিত ফিরোজপুরের ছোট সোনা মসজিদ গঠনশৈলী, স্থাপত্যিক ভারসাম্য, অলংকরণের সৌকার্য এ বিন্যাসের জন্য অসামান্যকীর্তি বলে পরিগণিত। গোসেন শাহী আমলে নির্মিত এই মসজিদটির নামকরণ সমন্ধে বলা হয়েছে যে, ব্যাপক সোনালী রঙ ব্যবহারের ফলে আয়তাকার এই মসজিদটি সোনা মসজিদ নামে পরিচিতি। ক্রেটন গম্বুজ ও মিহরাব প্রাচীরে সোনালী রঙ্গের প্রলেপ দেখতে পাওয়া যায়।

বাঘা (রাজশাহী) মসজিদ, ১৫২৩ খ্রি.

রাজশাহী জেলার বাঘায় সুলতানী আমলের একটি অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদ আজও দর্শকদের বিস্ময়েরউদ্রেক করে। ১০২৩ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৮১]

নভগ্রাম (পাবনা) মসজিদ, ১৫২৬ খ্রি.

শিলালিপি অনুযায়ী ১৫২৬ খ্রি. পাবনার নভগ্রামে সুলতান নসাত শাহের আমলে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এটি এক গুম্বজ বিশিষ্ট বর্গকারে মসজিদ। গোপালপুরের মসজিদের মত ২৪ বর্গফুট পরিমাপের এই মসজিদটিতে সুলতানী আমলের সকল স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

সুবা (দিনাপজুর) মসজিদ, ষষ্ঠদশ শতাব্দী

দিনাজপুরের সুবা নামক স্থানে ষষ্ঠাদশ শতাব্দীতে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। রীতি ও প্রকারণ অনুসারে এই মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকারে ইমারত। এই মসজিদে কোন শিলালিপি পাওয়া না গেলেও

---

৫৭৮. বাংলাদেশ ইসলামিক ডাইরেকটরী, প্রাগুক্ত, (বাংলায় ইসলাম ও মসজিদ অধ্যায়), পৃ. ২০

৫৭৯. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৫৮০. Mahmudul Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh*, op.cit., P.125

৫৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

গঠন শৈলী, স্থাপত্য কৌশল এবং অলংকরণের রীতি দেখে বলা যায় যে, এই ইমারতটি ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত হয়।[৫৮২]

পাথরাইল (ফরিদপুর) মসজিদ, ষষ্ঠাদশ শতাব্দী

ফরিদপুর জেলার পাথরাইল গ্রামে মজলিস আওলিয় নামে এক সাধক ব্যক্তির মাজার আছে এবং তার পাশেই রয়েছে একটি প্রাচীন মসজিদ। সুলতানী আমলের শেষভাগে মসজিদটি নির্মিত হয়।

শৈলকূপা (যশোর) মসজিদ, ষষ্ঠদশ শতাব্দী

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় হযরত মৌলানা মোহাম্মদ আরব নামক এক সাধক পুরুষের মাজার আছে। সাধারণভাবে তিনি "মৌলানা সাহেব" নামে পরিচিত। এই মাজারের পাশে একটি প্রাচীন মসজিদ এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। শৈলকূপার এই অপূর্ব সুন্দর মসজিদটি ৬ গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার পরিকল্পনায় স্থাপিত। বলাই বাহুল্য সুলতানী স্থাপত্য কলায় সকল অপরিহার্য উপকরণ এই মসজিদে সংযোজিত হয়েছে। আব্দুল ওয়ালী এই মসজিদের উচ্ছাসিত প্রশংসা করে বলেছেন, "The cornics are all very beautiful and well-planned. The space over the top of the entrance of facade is raised and the brieks are earved and ornamented but broken."

মুঘল শাসনামলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মসজিদসমূহ

অষ্টগ্রাম (ময়মনসিংহ) কুতুব শাহের মসজিদ, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগ

স্থানীয় সুফী-সাধক কুতুব শাহ কর্তৃক নির্মিত অষ্টগ্রামের মসজিদ একটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিমাপে ৩৬ × ১৬ - ৯´-এই মসজিদের চার কোণায় চারটি আটকোণাকার বুরুজ আছে এবং প্রাক-মুঘল স্থাপত্যরীতির বক্রকার কার্ণিশ পূর্ব দিকের দেয়ালে দেখা যাবে। এই মসজিদটিতে সুলতানী ও মুঘল যুগের স্থাপত্যরীতি ও গঠনশৈলীর সংমিশ্রণ দেখা যাবে।

আটিয়া (টাঙ্গাইল) মসজিদ, ১৬০৯ খ্রি.

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে টাঙ্গাইলের আটিয়ার একটি অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত মসজিদ নির্মিত। শিলালিপি অনুযায়ী সৈয়দ খান পন্নী ১৬০৯ খ্রি. সুফী-সাধক পীর অলি শাহেন শাহ বাবা কাশ্মীরীর সম্মানে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। দানী যথার্থই বলেন যে, আটিয়ার জামে মসজিদে প্রাক-মুঘল এবং মুঘল যুগের স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ বটে।

শেরপুর (বগুড়া) খন্দকারতোলা মসজিদ, ১৬৩২ খ্রি.

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত শেরপুরের খন্দকারতোলা মসজিদ শাহ জাহানের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। এই ইমারতটি এক সারিবিশিষ্ট তিন গম্বুজ সম্বলিত একটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। ৭৮´ × ৩০´ পরিমাপের এই মসজিটির সঙ্গে শেরপুরের খেরুয়া মসজিদের সাদৃশ্য দেখা যাবে।

---

৫৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

চুড়িহাট্টা (ঢাকা) মসজিদ, ১৬৪৯ খ্রি.

ঢাকার ইসলামপুর এলাকার চুড়িহাট্টা নামক স্থানে একটি ব্যতিক্রমধর্মী মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে শাহ সুজার একজন কর্মচারীম মুহাম্মদ বেগ এই মসজিদটির নির্মাতা। এই মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রার্থনাগারটি বাংলার দো-চালা ঘরের অনুকরণে নির্মিত।

এগারসিন্ধু (ময়মনসিংহ) সাদীর মসজিদ, ১৬৫২ খ্রি.

ময়মনসিংহে মুঘল আমলে কতিপয় মসজিদ স্থাপিত হয়, যেমন, আটিয়া, এগারসিন্ধুর, সাদী ও শাহ মুহাম্মদ, মসজিদপাড়া এবং গুরাই মসজিদ। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহ জাহানের আমলে সাদী নামে এক ব্যক্তি একটি অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মসজিদের অলঙ্করণ প্রসঙ্গে দানী বলেন, The creeper device round the mains cntrance embossed designs at the spandrels and applied cusps at the outer faces, all speak of a revial of the terracotta art after the Mughals estableshed peace in the province.''[৫৮৩] এই মসজিদটি এগারসিন্ধুর শাহ মোহাম্মদের মসজিদ এবং গুবাই এর মসজিদের পূর্বসুরী।

চট্টগ্রাম জামে মসজিদ ১৬৬৮ খ্রি.

চট্টগ্রামের আন্দরকেল্লার টিলার উপর মুঘল আমলের একটি চমৎকার মসজিদ দর্শকদের আকর্ষণ করে। ১৬৬৮ খ্রি. নবাব শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্স উমিদ খান আয়তকার এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। ঢাকার বাইরে অসংখ্য শায়েস্থাখানী স্থাপত্যরীতিরতে নির্মিত মসজিদের অনুরূপ চট্টগ্রামের জামে মসজিদ স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, সম্রাট আওরঙ্গযেবের রাজত্বে শায়েস্তা খান আরাকানীদের পরাজিত করে ১৬৬৬ খ্রি. মুঘল রাখা হয় এবং সেখানে একটি দূর্গ (আন্দার কিল্লা) এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমিদ খানের প্রত্যাবর্তনের পর এই মসজিদটি ক্রমশ: ভগ্নপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বৃটিশগণ মসজিদটিকে অস্ত্রাগারে রূপান্তরিত করে। স্থানীয় মুসলমানদের বিশেষ করে মৌলভী হামিদ উল্লাহ খানের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই ইমারতটি তার পূর্ববর্তী ধর্মীয় ভাব-গাম্বীর্যপূর্ণ পরিবেশ ফিরে পায়।

মৈয়মনসিংহ মসজিদপাড়া মসজিদ, ১৬৬৯ খ্রি.

এগারসিন্ধু থেকে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মসজিদ পাড়া নামক স্থানে একটি একগম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ দেখা যাবে। শিলালিপি অনুযায়ী ১৬৬৯ খ্রি. সম্রাট আওরঙ্গযেবের রাজত্বকালে এই মসজিদটি নির্মিত হয়।

চক বাজার জামি' মসজিদ, ১৬৭৬ খ্রি.

ঢাকা জেলখানার দক্ষিণে পাদশাহী বাজার অর্থাৎ আজকের চক বাজার। এ চক বাজারকে আগে গ্রামাঞ্চলের বহুলোক চৌক বন্দর বলে আখ্যায়িত করত। মোগল আমল থেকেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এটা একটা প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত ছিল এবং এটি সবার কাছেই পাদশাহী বাজার বলে

৫৮৩. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত ছিল। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে রাজা মানসিংহ যখন তাঁর সদর দফতর ভাওয়াল গড় থেকে স্থানান্তর করে এর আশে-পাশে কোথাও স্থাপন করেন, সে সময় থেকেই ধীরে ধীরে এখানে একটি বাজার গড়ে উঠতে থাকে।[৫৮৪]

চক বাজার মসজিদটি ১৬৭৬ সনে নওয়াব শায়েস্তা খান তাঁর নিজস্ব স্থাপত্য আঙ্গিকে তৈরি করেছিলেন এবং মসজিদের সম্মুখ দিয়ে কিছু দোকানের ব্যবস্থা করেছিলেন। যাতে এসব দোকানের আয় থেকে মসজিদটি সুচারুরূপে পরিচালিত হতে পারে। বড় বড় উৎসবাদিতে আগের দিনে নায়েব-নাযিমগণ এতে সালাত আদায় করতেন। মসজিদটিতে আগের দিনের শান-শওকত না থাকলেও আজ চক মসজিদটিতে বহু মুসল্লী সালাত আদায় করে থাকেন। তবে বর্তমানে আধুনিক স্থাপত্যের সাথে মিল রেখে এখনও কর্তৃপক্ষ মসজিদটিকে সুন্দরভাবে সম্প্রসারিত করে চলেছেন। এ মসজিদে নামায আদায় ছাড়াও 'আলিমগণ বহুকাল যাবৎ কুর'আনের তাফসীর বর্ণনা করে চলেছেন। তন্মধ্যে হযরত মাওলানা দীন মুহাম্মদের নাম উল্লেখযোগ্য। মসজিদের দক্ষিণ দিকে মাওলানা কিরামত আলী জৈনপুরীর (র.)-এর পুত্র মাওলানা হাফিয আহমদ (র.)-এর কবর রয়েছে।[৫৮৫] লালবাগ কেল্লার খুব কাছেই চক বাজার স্থাপিত হয়। যা শহরে নবাগতদের ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র ছিল। যদিও সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে কোন বাজারের উল্লেখ নেই। তবুও ড. আবদুল করিম বিশ্বাস করেন প্রকৃতপক্ষে এটি বাদশাহী বাজার।[৫৮৬]

১৮৩২ সনে ঢাকার তৎকালীন কালেকটর মি. ওয়ালটার সিপাহসালার ও সুবাদার মীর জুমুলা কর্তৃক সোয়ারী ঘাটে প্রতিষ্ঠিত বিরাট কামানটি উঠিয়ে চকবাজারের অসংখ্য দোকানের মাঝখানে স্থাপন করেন। অবশ্যই ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা যাদুঘরের পরিচালক ড. ভট্টশালীর প্রচেষ্টায় এ কামানখানা চকবাজার থেকে সদরঘাটে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৫৭ সনে ডি.আই. টির চেয়ারম্যান জনাব জি.এ. মাদানী তৎকালীন পাকিস্তান মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারের সহযোগিতায় পুনরায় সদরঘাট থেকে বঙ্গবন্ধু এভেন্যুতে কামানটি স্থাপন করেন।[৫৮৭]

চক বাজার মসজিদের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণে একটি বিরাট কূপ ছিল। কয়েক বছর আগে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য এটি বন্ধ করে দেয়া হয়। এ প্রাঙ্গনে আযাদী পূর্বকালে ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহম উপলক্ষে বিভিন্ন মহল্লা থেকে বহু লোক মওলুদ পড়ার জন্য এখানে সমবেত হত। অপরাহ্নে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হত। এ মওলুদ অনুষ্ঠানে পৌঢ় ও যুবকরা অংশ গ্রহণ করত এবং এ দৃশ্য দেখার জন্য বহু লোক রাস্তা ও মসজিদের বারান্দায় সমবেত হত।[৫৮৮]

---

৫৮৪. নাজির হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯-৯০; Dr. Syed Mahmudul Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh,* op.cit., P.67

৫৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৫৮৬. ড. আবদুল করিম, *মোগল রাজধানী ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৫৮৭. নাজির হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৫৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

জুমু'আর দিনে চক মসজিদে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে যেন এটি আরেক 'ঈদের জামা'আত। মসজিদের প্রাঙ্গন পেরিয়ে রাস্তা পর্যন্ত এসে পৌঁছত জামা'আতের সারি। 'ঈদের জামা'আতের মতই মসজিদ প্রাঙ্গনে ভিক্ষুকদের ভিড় লেগে থাকত। চক মসজিদে জামা'আতের সঙ্গে জানাযা লাভ বিশেষ সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করা হত। এ মসজিদে জানাযার জন্য শহরের দূর-দূরান্ত থেকে মুর্দা নিয়ে আসত।[৫৮৯]

নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সম্প্রতি মসজিদে আধুনিক একটি বারান্দা সম্প্রসারিত করা হয়। মসজিদের নীচের কিছু কক্ষ মসজিদের খরচ বহন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রবেশ তোরণের উপর একটি মিনার নির্মাণ করা হয়েছে- যা ঢাকা শহরের মধ্যে সবচেয়ে উচুঁ মিনার। সুবাদার ও উমরাগণ মসজিদে জুমু'আর সালাত আদায় করতেন। নবাব এবং উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ মসজিদ চত্বরে মহররম ও অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতেন।[৫৯০] মসজিদের পূর্ব দেয়ালে আয়তাকার সুসজ্জিত প্যানেল করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথে যথারীতি সামনের দিকে কিছুটা বর্ধিত করা হয়েছে। ভিতরের কক্ষটিও সংস্কার করা হয়েছে। মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে সুশোভিত করা হয়েছে।[৫৯১] মসজিদটিতে যে শিলালিপি রয়েছে তার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ, "আল্লাহ্‌র পথের অনুসারী আমীর-উল-উমারা শায়েস্তা খান আল্লাহ্‌র জন্য আন্তরিকভাবে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অনুসন্ধানকারী প্রজ্ঞা থেকে যখনই নির্মাণের তারিখ অনুসন্ধান করল, আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে ফরয আদায় হল। ১০৮৬ হিজরী ।"[৫৯২] মুনশী রহমান আলী তায়েশ বলেন, "আগে এ মসজিদে ঢাকার নাজিমগণ জামাতের সাথে 'ঈদের নামায পড়তেন। বারান্দা, হাউস প্রভৃতি হাজী ফকির মুহাম্মদ নির্মাণ করে দেন। এতে মসজিদের সম্মান ও মর্যাদা দ্বিগুণ হয়।"[৫৯৩] মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম বলেন, "মসজিদ নির্মানের মধ্য দিয়ে চক বাজারের উদ্বোধন। চক বাজারের কেন্দ্রস্থলে বাজারটি প্রতিষ্ঠিত হয় আরও পরে ১৭০২ খ্রি.। প্রতিষ্ঠা করেন মুর্শিদকুলী খান। এই বাজারটি 'পাদশাহী বাজার' নামেও খ্যাত ছিল।[৫৯৪]

ঢাকার মোগল মসজিদের মধ্যে চক বাজার মসজিদের গুরুত্বই ছিল সর্বাধিক। কারণ এটি মোগল রাজধানীর প্রধান মসজিদ। অথচ এ বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হয়। চক বাজার এলাকাটি জনবহুল বিধায় স্থান সংকুলানের বিষয়কে মুখ্য করে মসজিদের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ করা হয়।[৫৯৫] শায়েস্তা খানের আমলে মসজিদ নির্মাণের মধ্যে চক বাজার মসজিদ অন্যতম। মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে এ মসজিদটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

---

৫৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৫৯০. Taifur, op.cit., P.149

৫৯১. Dani, *Dacca*, op.cit., P.190

৫৯২. মুনশী রমান আলী কায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪

৫৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪

৫৯৪. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়্যুম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

৫৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-৪

Dhaka University Institutional Repository

হাজী খাজা শাহবাজের মসজিদ, ১৬৭৯ খ্রি.

এ মসজিদটি রমনা রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমানে সোহরাওয়াদী উদ্যান) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং তিন জাতীয় নেতার সমাধি স্তম্ভের ঠিক পূর্ব দিকে। মসজিদটি উঁচু স্থানে উন্মুক্ত প্রান্তরে নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ২০.২৭ মিটার এবং প্রস্থ ৮.৪৫ মিটার। এটি একটি আয়তাকার অষ্টকোণী টাওয়ার বিশিষ্ট মসজিদ। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে ৩টি প্রবেশ পথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উত্তরে একটি এবং দক্ষিণে একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ থেকে ঐ দু'টো প্রবেশ পথ আকারে একটু ছোট। সদর মসজিদটিতে ভারতীয় মোগল স্থাপত্য রীতি পরিদৃষ্ট হয়।[৫৯৬] খাজা শাহবাজের এ মসজিদটি একটি আকর্ষণীয় মোগল স্থাপত্য। শাহবাজ ছিলেন মালিক-উত-তুজ্জার অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। একটি উচুঁ স্থানে আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নানা কারণে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।[৫৯৭] হাজী খাজা মার্চেন্ট শাহজাদা ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৬৭৯ খ্রি. মসজিদটি নির্মিত হয়।[৫৯৮] মসজিদের পশ্চিমের দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবে অত্যন্ত সুন্দর ডিজাইনের কিবলা নির্দেশক চিহ্ন রয়েছে। মসজিদের রয়েছে একটি মিম্বার।[৫৯৯] পূর্বদিকের দেয়ালে শিলালিপি প্রোথিত আছে। সম্মুখভাগ অসংখ্য প্যানেল এবং সরু ও লম্বা টারেট বা ছোট আকারের শিখা দ্বারা বিভক্ত। বলাই বাহুল্য যে, তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার শায়েস্তাখানী মসজিদের দৃষ্টান্ত রয়েছে লালবাগ দূর্গে ও তৎসংলগ্ন আতিশখানায়, খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদ এবং মুহাম্মদপুরে সাত গম্বুজ মসজিদে।[৬০০]

মসজিদের আঙ্গিনার পূর্ব দিকে সুন্দর এক গম্বুজ বিশিষ্ট হাজী শাহবাজের কবর রয়েছে। কবর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান ২৬ ফুট। মসজিদের শিলালিপির অবিকল বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ "খাজা হাজী শাহবাজ এ পবিত্র ঘর নির্মাণ করেন। উচ্চতায় এটি মহান 'আরশ' এর সমকক্ষ। পূর্ণ প্রজ্ঞার ভাষায় এ পবিত্র ঘর নির্মাণের তারিখ হাজী খাজা শাহবাজের দ্বারা মসজিদ সুশোভিত হয়ে এসেছে। ১০৮৯ হিজরী।"[৬০১]

শাহবাজ হলেন একজন হাজী। হাজী শাহবাজ কাশ্মীর থেকে এখানে আগমন করেন এবং বসবাস করতেন টঙ্গীতে। সেখান থেকে নামাজ পড়তে আসতেন নিজ মসজিদে। তাঁর মসজিদের মিম্বারটি কালো পাথরের তৈরি । মসজিদের আঙ্গিনায় শায়িত আছেন খাজা শাহবাজ। এর সমাধিটি চৌ. কোণা এক গম্বুজ বিশিষ্ট।[৬০২] 'Mughal Monuments of Bangladesh' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "For the decoration of the mosque turrets, panels and merlon designs have been used. Turrets are placed at

---

৫৯৬. Naziy Choduury and Babu Ahmed, ed., Dr., Enamul Haque, *Mughal munuments of Bangladesh*, Palton tower, Dhaka, 2006, P.48

৫৯৭. মোঃ আবদুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৫৯৮. ড. এ. এইচ. দানী, আবূ জাফর (অনূ), *কালের স্বাক্ষী ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৫৯৯. Syed Mahmudul Hasan, *Dhaka the city of mosques*, op.cit., P.50

৬০০. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫

৬০১. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭-৪৮

৬০২. মুনতাসির মামুন, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ.৬৫

Dhaka University Institutional Repository

the side of door ways and out word. Projection of the central mihrab. All turrets are elongated over the horizontal prarapet. The surface of the eastern wall is divided in several small panels. All panels are filled by deep niches."[৬০৩]

মালিক আম্বরের মসজিদ, ১৬৭৯-৮০ খ্রি.

তেজগাওয়ের কাওরান বাজার নামক স্থানে ময়মনসিংহ রোডের ডানদিকে খাজা মালিক আম্বরের মসজিদটি অবস্থিত। ইটের তৈরি একটি ছোট প্লাটফর্মের উপর মসজিদটি স্থাপিত। সিঁড়ির ডান পাশে রয়েছে একটি কূপ যা খাজা আম্বর খনন করেন। মসজিদটি সম্প্রতি সংস্কার করা হয় এবং এ সময় অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়। কিন্তু এর সাধারণ বিশিষ্ট্য যেমন তিনটি গম্বুজ এবং অলঙ্করণ, বর্হিভাগ এবং অভ্যন্তরের আকর্ষণীয় হল অপরিবর্তিত রয়েছে। এসব নির্মাণ কাঠামো শায়েস্তাখানী স্থাপত্যের সঙ্গে পুরাপুরি মিল রয়েছে।[৬০৪] শায়েস্তা খানের অনুচর মালিক আম্বর মসজিদটি ১৬৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে উঁচু স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থাপত্যের দিক থেকে সনাতনী শায়েস্তাখানী তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার মসজিদ। উল্লেখ্য যে এ মসজিদের মিম্বার, মিহরাব ও খিলানসমূহ মূল্যবান কষ্টি পাথরের তৈরি ছিল।[৬০৫]

মসজিদের আঙ্গিনায় রয়েছে নির্মাতার কবর, মসজিদটির অধীনে মোগল আমলের অনেক জমিজমা থাকলেও কালক্রমে তা বেহাত হয়ে যায়। ফলে আর্থিকভাবে তা রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধা দেখা দেয়। স্থানীয় মুসলমানগণ কর্তৃক কোন রকমে মসজিদটি চালু থাকলেও সংস্কারের অভাবে সেটার জীর্ণ দশা ঘটে। এমতাবস্থায় নবাব আহসানুল্লাহ্ বহু টাকা ব্যয়ে মসজিদটি সংস্কার করেন। তাঁর ওয়াকফ স্টেট থেকে বেশ কিছু সম্পত্তি তিনি মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারণ করেন। ফলে ধ্বংসের হাত থেকে মসজিদটি রক্ষা পেয়ে সংরক্ষিত হয় এবং নিয়মিত নামায চলতে থাকে। হাল আমলে মসজিদটির ব্যাপক সংস্কার করলেও এর আদি নামায কক্ষটি এখনও অটুট আছে।[৬০৬] মসজিদের কেন্দ্রীয় দরজার উপরে একটি শিলালিপি রয়েছে। এতে নির্মাণ তারিখ লিখা রয়েছে। আরেকটি উৎকীর্ণ লিপি রয়েছে মিহরাবের উপরে। এতে কুর'আনের আয়াত খচিত রয়েছে। মসজিদটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর মিহরাব, মিম্বার ও খিলানে যে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে তা রাজমহল পাহাড় থেকে আনা হয়েছে।[৬০৭] মসজিদটি অত্যন্ত সুন্দর, তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এবং দৃঢ় করে তৈরি করা হয়েছে। মিম্বার ও দরজার চৌকাঠ পাথর দিয়ে তৈরি। মুনশী রহমান আলী তায়েশ মসজিদটিকে ভগ্নাবস্থায় দেখেছেন। আশেপাশের মুসলমানগণ আলোর ব্যবস্থা করে নামায ও 'আযান চালু রেখেছেন। এ মসজিদের আঙ্গিনায় খাজা আম্বরের কবর রয়েছে। স্কর্টনের খালের উপর ইট দিয়ে অত্যন্ত দৃঢ় করে পুল তৈরি করা হয়েছে। এটি ঢাকা ময়মনসিংহ রোডের প্রথম পুল। পুল

---

৬০৩. Naziy Chodhury Babu Ahmed ed., Dr. Enamul Haque op.cit., P.48

৬০৪. ড. এইচ. দানী, আবূ জাফর (অনূ), *কালের স্বাক্ষী ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৬

৬০৫. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১

৬০৬. মোঃ আলমগীর, *বাংলার মুসলিম সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান*, পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ.১৬৫

৬০৭. Dani, *Dacca,* op.cit., P.220-21

Dhaka University Institutional Repository

এবং জলাশয় একই আমলে তৈরি ।[৬০৮] মসজিদের শিলালিপির বাংলা অনুবাদ অবিকল নিম্নরূপ "সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তাঁর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর সৌভাগ্যের পরশে যখন শায়েস্তাখানের দ্বারা সারা বাংলার রাজ্য সুশোভিত হয়ে উঠে তখন অভিজাত বংশীয় আম্বরের দ্বারা ঢাকায় কূপ, পুল, বাগান ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। নির্মাণের পর তাঁর নির্মাণ তারিখের চিন্তায় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলে প্রজ্ঞার উদ্ভব হয়। একজন দৈব্য পুরুষ বলে উঠলেন, হে প্রভূ, পৃথিবীতে যেন মসজিদ, পুল ও খাজা আম্বর বাকি থাকে। ১০৯০হি. ।"[৬০৯]

আল্লাকুরীর মসজিদ, ১৬৮০ খ্রি.

আল্লাকুরী মসজিদটি সাত গম্বুজ মসজিদ রোডের পার্শ্বে মুহাম্মদপুর কলোনিতে অবস্থিত। মোগল স্থাপত্যের মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট ১৭শ শতকের। মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে একটু উচূঁ ভূমিতে। বর্গাকৃতির এ মসজিদে রয়েছে চার কোণায় চারটি অষ্টভূজি বুরুজ। মসজিদটি যে উচুঁ স্থানে অবস্থিত তাঁর পাশে একটি কূপও ছিল। মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ সামনের দিকে বর্ধিত করা। এ বর্ধিত অংশ টারেট দিয়ে বর্ডার করা হয়েছে। কর্ণারের টাওয়ারের মধ্যে প্লাস্টার করা কিয়স্ক (Kiosk) রয়েছে। মসজিদের ভিতরের অংশ একটি ছোট কক্ষের মত। মসজিদের প্রতি দিকের পরিমাণ সাড়ে ১২ ফুট। কিন্তু দেয়ালের ঘনত্ব এত বেশি যে, গরমের দিনেও মসজিদের ভেতরে ঠাণ্ডা লাগে।[৬১০] মসজিদটি যদিও ছোট তথাপি অতীব সুন্দর। এতে শায়েস্তা খান একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে।[৬১১]

মসজিদের পূর্ব দেয়ালের প্রধান প্রবেশ পথের উপরে পূর্বে শিলালিপি ছিল। জনশ্রুতি রয়েছে যে ভাওয়ালের রাজা শিলালিপিটি বিগত শতাব্দীতে সরিয়ে ফেলেছেন। মসজিদের ভিতরের অংশ খুবই চমৎকার। মিহরাবটি খুবই হৃদয়গ্রাহী। মসজিদে একটি গম্বুজ রয়েছে। গম্বুজে রয়েছে খিলান। আর গম্বুজে শীর্ষে রয়েছে পদ্ম-পাপড়ির অলঙ্ককরণ। মসজিদটি বর্তমানে স্থানীয় লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।[৬১২] মসজিদের পশ্চিমের দেয়ালে আয়তাকার আকৃতির তিনটি মিহরাব সংযোজন করে দেয়ালটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করা হয়েছে। যদিও মসজিদের শিলালিপি হারিয়ে গেছে তথাপি এর অলঙ্করণ দেখে অনুমান করা যায় মসজিদটি শায়েস্থাখানের সময়কার।[৬১৩] Md. Abdul Bari বলেন, æThe best example of the type in Dhaka is undoubtedly the Allakuri mosque, In terms of design, the mosque appears to have been directly influeneed by the earlier mughal or sultanate examples of the land but

৬০৮. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬০

৬০৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬১

৬১০. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, op.cit., P.195-96

৬১১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫

৬১২. Dani, *Dacca*, op.cit., P.217

৬১৩. Dani, *Muslim Archictechre in Bengal*, op.cit., P.196

Dhaka University Institutional Repository

in elavation and other details it bears the stamp of the imperial mughal architecture of North India.[৬১৪]

আল্লাকুরীর মসজিদটি সম্প্রতিকালে সম্প্রসারণ করা হয়েছে মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে। তবে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, মূল মসজিদের কোন ক্ষতি না করেই এ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সম্প্রসারিত অংশের উপর টিনের চাল দেয়া হয়েছে। মসজিদের এরূপ সম্প্রসারণের ফলে বাহির থেকে মসজিদটি দৃষ্টিগোচর হয়না। কেবল মসজিদের উপরিভাগ দেখা যায়। অধুনা সমগ্র মসজিদ প্লাটফর্মের উপর বিভিন্ন রঙ করা হয়েছে। সমগ্র মসজিদের বহিরাবরণে সাদা রঙ দেয়া হয়েছে। প্রতি দিকের সংযুক্ত টারেটগুলোতে লাল রঙ ব্যবহার হয়েছে। প্যারাপেটের মার্লন অলঙ্করণের নীল ও সবুজ রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগেও বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে একটি জমকালো ভাব আনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।[৬১৫] মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করার ফলে মসজিদটি খানিকটা আড়াল হয়ে গেলেও মূল মসজিদের কাঠামো অক্ষুন্ন রয়েছে। অথচ ঢাকার অনেক পুরনো মসজিদ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সম্প্রসারণকালে মূল মসজিদের দেয়াল ভেঙে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যেমন বিন্ত বিবির মসজিদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মসজিদের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের দেয়াল ভেঙে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, স্থানীয় জনগণ পুরাকীর্তি রক্ষার প্রতি যতটা যত্নশীল ছিলেন, তার চেয়ে অধিক যত্নশীল ছিলেন তাঁদের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির প্রতি।[৬১৬]

মসজিদ এলাকাটি এখন জনবহুল হলেও প্রায় ৩০/৩৫ বছর পূর্বে তা জনবিরল ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বর্গাকৃতির এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি সম্ভবত একটি সমাধি সৌধ এমন ধারণা অনেকের মধ্যেই ছিল। ফলে আল্লাকুরী মসজিদে বেশি কেউ নামায পড়তে আসতেন না। নিকটবর্তী সাত গম্বজু মসজিদের গুরুত্বই ছিল বেশি। মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে এনে যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।[৬১৭] এজন্য সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। নতুবা ভবিষ্যতে মসজিদটি অসর্তকতার কারণে প্রাচীন ঐতিহ্য বিলীন হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে।

সাত গম্বুজ মসজিদ, (সপ্তদশ শতক-১৬৮০ খ্রি.)

মোগল বাংলার সম্মৃদ্ধির যুগে যখন ঢাকা শহর পূর্ব দিকে পোস্তগোলা এবং পশ্চিমে বুড়িগঙ্গার তীর ধরে জাফরাবাদ পর্যন্ত প্রায় দশ মাইল বিস্তৃত ছিল, তখন নওয়াব শায়েস্তা খার পুত্র বুযুর্গ উমেদ কর্তৃক জাফরাবাদ মৌজায় সাত গম্বুজ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। আসলে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের চার কোণায় টাওয়ারের উপর নির্মিত আরও ৪টি মিলিয়ে এতে মোট ৭টি গম্বুজ রয়েছে। এজন্য এ মসজিদকে সাত গম্বুজ মসজিদ বলে। ইংরেজ আমলে শহর সংকুচিত হওয়ার ফলে সাতগম্বুজ মসজিদটি মূল শহর

৬১৪. Md. Abdul Bari, Mughal Musques of Dhaka, Atypological study, ed., sharif uddin Ahmed, *Dhaka, past Present future*, op.cit., P.352

৬১৫. মুহাম্মদ র ুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৬

৬১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৬১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ৩/৪ মাইল দূরে জন-বিরল এলাকায় পড়ে।[৬১৮] ঢাকার নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ্ এই মসজিদটির ঐতিহাসিক ও সামাজিক ধর্মীয় গুরুত্ব উপলব্দি করতে সক্ষম হন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে নওয়াব বহু টাকা খরচ করে মসজিদটির সংস্কার ও মেরামত করেন। তাছাড়া তিনি সাত গম্বুজ মসজিদের জন্য একজন ইমাম কাম-মু'আযযিন নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর ভরণ-পোষণের জন্য প্রায় বার বিঘা জমির উপসত্ব দানসহ মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করেন। মসজিদটি পুনরায় সরব হয়ে উঠে এবং পাঁচ ওয়াক্ত 'আযান এবং সালাত আদায় হতে থাকে। মসজিদের আশে-পাশের ধর্ম প্রাণ মুসলমানগণ এতে অনেক উপকৃত হন। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ ও নওয়াব হাবীবুল্লাহ্ এর সময় উক্ত মসজিদের মু'আযযিনের বেতন-ভাতা যথারীতি চালু ছিল। নওয়াবের অর্থদানের তালিকা থেকে সাতগম্বুজ মসজিদ সংস্কারের জন্য ঢাকার নওয়াব একবার ১৬৯৯ টাকা দান করেছিলেন।[৬১৯]

এখানকার সাত মসজিদ রোড ধরে অগ্রসর হলে জাফরাবাদে দেখা যাবে সাত গম্বুজ মসজিদ। এক সময় বুড়িগঙ্গা বয়ে যেত এর পাশ দিয়ে। চার পাশে ছিল সবুজ অরণ্য। সব মিলিয়ে মনোরম নিখূঁত পরিবেশে নির্মিত হয়েছিল সাতগম্বুজ মসজিদটি। এখন নদী সরে গেছে দূরে, সবুজ অরণ্যও আর নেই। তবে মসজিদের পাশে সৃষ্টি হয়েছে জলাভূমি বর্ষায় যা ভরে উঠে। ধারণা করা হয় ১৬৮০ সালের দিকে শায়েস্তা খান নির্মাণ করেছিলেন সাত গম্বুজ মসজিদটি। এ অনুমানের কারণ মসজিদটি স্থাপত্যরীতি শায়েস্তাখানী। মসজিদটির দেয়াল চার ফুট পুরো।[৬২০] মসজিদটি বাইরের দৈর্ঘ্য ৫৮ ফুট এবং প্রস্থ ২৭ ফুট। মসজিদের বাইরের কুলঙ্গি পাঠান ও মোগল স্থাপত্যের অনুরূপ নির্মিত বলে তাইফুর মনে করেন। মসজিদে কোন শিলালিপি বিদ্যমান নেই। এজন্য কোন আমলের মসজিদ তা জানা খুবই কঠিন বলে মনে করেন তাইফুর। মসজিদের সামান্য দূরত্বে একগম্বুজ বিশিষ্ট একটি কবর রয়েছে। যা শায়েস্তা খানের কন্যার কবর বলে মনে করা হয়।[৬২১]

মসজিদটি দূর থেকে দেখলে মনে হবে সাত গম্বুজ বিশিষ্ট। কারণ সাতটি গম্বুজ সহজেই নজরে পড়ে। মূলত মসজিদটি সনাতনী তিনগম্বুজ বিশিষ্ট। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনার উপর নির্মিত।[৬২২] মূল মসজিদের চারকোণে আছে চারটি অষ্টভূজ মিনারের উপর বসানো চারটি ক্ষুদ্র গম্বুজ। সব মিলিয়ে সাত গম্বুজ, তাই সাত গম্বুজ নামে পরিচিত মসজিদটি।[৬২৩]

মসজিদের পূর্বদিকে ৩টি খিলান দরজা রয়েছে। কেন্দ্রীয় খিলান দরজাটি আকারে অন্য দুটি থেকে একটু বড়। কেন্দ্রীয় খিলান দরজাটি বহু খাঁজ বিশিষ্ট। খিলান পথের উভয় পাশেই সরু ও সুন্দর টারেট রয়েছে।[৬২৪] বাইরের দেয়ালগুলোর উপরিভাগ প্যানেল করা প্ল্যাষ্টারযুক্ত।[৬২৫] বৃহদাকার ও স্ফীত মূল

৬১৮. মোঃ আলমগীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৬১৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩
৬২০. মুনতাসির মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬২
৬২১. Taifur, op.cit., P.167
৬২২. আহমেদ মুস্তফা মামুন, সাত গম্বুজ মসজিদ, *মাসিক মুসলিম ডাইজেষ্ট*, ঢাকা: একাদশ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, আগষ্ট, ২০০৯ খ্রি., পৃ ৫০
৬২৩. মুনতাসির মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬২
৬২৪. Dr. Syed mahmudul Hasan, *Dhaka the city of Mosques*, op.cit., P.51

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের তিনটি গম্বুজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে এবং ড্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এর সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ড্রামের চারপাশে পদ্ম পাতার নকশা রয়েছে যাকে মার্লিন বলে। কোণার গম্বুজগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট। অভ্যন্তরে কিবলা প্রাচীরে তিনটি মিহরাব রয়েছে। খুৎবা পাঠ করার জন্য রয়েছে একটি মিম্বার। মসজিদের পূর্ব দিকে 'আযান দেয়ার জন্য একটি উঁচূ স্থান রয়েছে। মসজিদের সম্মুখ ভাগ প্যানাল ও কুলঙ্গি দ্বারা আবৃত। মসজিদটিকে শায়েস্তাখানী আমলের মসজিদ বলা যেতে পারে।[৬২৬] আহমেদ মুস্তফা মামুন বলেন, "মুসলিম স্থাপত্যের অনন্য সৌন্দর্যের প্রতীক সাত গম্বুজ মসজিদটি ঐতিহাসিকভাবে যেমনি দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ঠিক তেমনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার উৎস হয়ে আছে।[৬২৭] Dr. Nazimuddin Ahmed বলেন, "The Sat-Qumbad Mosque illustrates a fine example of provincial mughal style introduced in Bangladesh is the 17th century, probably erected by Governor Shaista khan (1663-78 and 1679-88), the monument stands in a romantic setting on a buttressed 15 foot high platform at the edge of and exstensive low, flood plain,"[৬২৮]

আদি মসজিদের নির্মাণ উপকরণ ছিল ইট। মসজিদটি নদীর তীরে হওয়ায় মসজিদটি দৃশ্যত খুবই চমৎকার। আদি কালের মসজিদের খিলান ও গম্বুজ প্রায় ধ্বংস প্রাপ্তই ছিল। তথাপি মসজিদের প্রধান স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করে যে দক্ষতা ও রুচিবোধের চমৎকার পরিচয় বহন করে। ভেনিস্কের কিছু ভবন যেমন আদ্রিয়াতিক সাগরের তীর ভূমি অলঙ্করণ করছে, সাত গম্বুজ মসজিদটিও অনুরূপভাবে নদীর অব্যবহিত তীর ভূমি থেকেই রাজকীয় মহিমায় উত্থিত হয়ে একটি অনির্বচনীয় আলেখ্যের সৃষ্টি করেছে।[৬২৯] বাংলাদেশের প্রাচীন নির্দশনাবলীর মধ্যে সাত গম্বুজ মসজিদটি অন্যতম। মসজিদের আট কৌণিক, বৃত্তাকার ও আয়তাকার বিভিন্ন অংশ বৈপরীত্যের বৈশিষ্ট্যতায় নির্মাতার প্রজ্ঞাময় সুরুচির পরিচায়ক বলে চার্লস ডাইলী তার গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন। মসজিদের পলেস্তরার আদি হালকা বর্ণের অনেকটা বুঝা যেত। কালের প্রবাহ ও চার পাশের ঝোপঝাড়, বর্ষার বারিধারা ও সূর্যালোক কেবল যে মসজিদের বর্ণ বৈচিত্র বাড়িয়েছে তা নয়। বরং বর্ণের উজ্জল্যে কমনীয়তা এনে দিয়েছে। এর ফলে সব কিছু মিলিয়ে ধর্মীয় আবহের একটি অতি শান্ত চরিত্র পরিবেশ রচিত হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় বুড়িগঙ্গা নদীও যেন তার পাশ দিয়ে সচেতন গর্বে প্রবাহিত হতে গিয়ে তার গতি মন্থর করে দিয়েছে এবং তার তীরদেশও ভারতীয় শিল্পকলাকে সম্মানিত করেছে যে স্থাপত্য, সেই স্থাপত্যের প্রতিবিম্ব নিজ বক্ষে ধারণ করে আসছে।[৬৩০] যাই হোক মসজিদটি ঢাকার অন্যান্য মোগল স্থাপত্য থেকে স্বতন্ত্র রূপ দান করেছে।

শাহগুজার (কুমিল্লা) মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

---

৬২৫. Dr. Nazimuddin Ahmed, *Discover the monuments of Bangladesh*, op.cit., P.175

৬২৬. ড. সৈয়দ মাহামুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৬২৭. আহমেদ মুস্ড়ফা মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

৬২৮. Dr. Nazimuddin Ahmed, *Islmic Heritage of Bangladesh*, op.cit., P. 53

৬২৯. চার্লস ডাইলী, শাহমুহাম্মদ নাজমুল আলম (অনূদীত) *ঢাকার প্রাচীন নির্দশন*, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রি., পৃ.২০

৬৩০. প্রাগুক্ত, পৃ.২০

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা শহরের শুজাগঞ্জ এলাকায় মুঘল আমলের চাকচিক্য বিশিষ্ট একটি স্থাপত্য কীর্তি দেখা যাবে। এই ইমারতটি শাহশুজার মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটি তিনটি ড্রামযুক্ত গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজের উপর কলস ধরনের চূড়া রয়েছে। সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে মসজিদটির আদি রূপ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

গুরাই (ময়মনসিংহ) মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

এগারসিন্ধুর ১৬ মাইল পূর্বে গুরাই গ্রাম অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এখানে একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়। মুঘল স্থাপত্যের সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ এই মসজিদে লক্ষ্য করা যায়।

কারতালাব খানের মসজিদ, ১৭০০-১৭০৪ খ্রি.

এ মসজিদটি অবস্থিত বেগম বাজার রোডে জেলখানার বা চক বাজারের দিক দিয়ে এ মসজিদে যাওয়া যায়। করতালাব খান হল মুর্শিদকুলি খানের উপাধি বা পদবি। তিনি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে (১৭০০-১৭০৪খ্রি.) মুর্শিদ কুলি খান এ মসজিদ নির্মাণ করেন। শায়েস্তাখানী আমলের পর যে স্থাপত্য শিল্পের অগ্রগতি ঘটে, তার ব্যাপক প্রকাশ ঘটে এ মসজিদের স্থাপত্য শিল্পে।[৬৩১] এ মসজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর উচুঁ তহখানা অর্থাৎ খিলান ও ভল্ট দ্বারা সৃষ্ট ও মজবুত করে নির্মিত ভিত্তিভূমি। তহখানার ব্যবহার পূর্বে ফিরোজপুরের (রাজশাহী) শাহ নিয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালীর সময়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা যাবে। পরবর্তীকালে খান মুহাম্মদ মির্ধা ও দেওয়ান বাজার মসজিদে এ রীতি প্রতিফলিত হয়। উল্লেখ্য যে দক্ষিণাত্যের মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাবে এ মসজিদে স্তর বিশিষ্ট কূপ নির্মিত হয়।[৬৩২]

এ আকর্ষণীয় মসজিদটি পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের পার্শ্বে উত্তর পূর্ব দিকে মুর্শির্দকুলিখানের নির্মিত বাউলি বয় ধাপযুক্ত কুপ রয়েছে। মসজিদটি দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট।[৬৩৩] মসজিদটি উত্তর দক্ষিণে ৩৩ মিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে ১৩.৪১ মিটার উচুঁ সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এতে খিলান ছাদবিশিষ্ট ভল্ট রয়েছে। যা দোকান বা মাদরাসার ছাত্রদের জন্য ব্যবহৃত হয়। মসজিদের চত্বরে যাওয়ার জন্য পূর্বদিক দিয়ে সিঁড়ি রয়েছে। প্লাটফর্মের উপর পশ্চিম দিকে মূল মসজিদের অবস্থান যার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ২৮.৬৫ মিটার এবং প্রস্থে ৮.২২ মিটার। ভিতরের পশ্চিমের দেয়ালে ৫টি মিহরাব শোভা পাচ্ছে। অলঙ্কৃত টারেট, কিয়স্ক, ক্ষুদ্র গম্বুজ প্রভৃতি স্থাপত্য কারুকার্য ব্যবহৃত হয়েছে।[৬৩৪] মসজিদে বর্তমানে একটি মিনারও রয়েছে।[৬৩৫] মসজিদের পূর্ব দিকে যে বারান্দাটি নির্মিত হয়েছে তা ১৯৬২ সালের।[৬৩৬]

Abdul Bari বলেন, "Kartalab Khan Mosque (1700-04) on the Begum Bazar Road is the lone example of the type, Which seems to be a development of the three doomed, style

৬৩১. ড. এ. এইচ. দানী, আবূ জাফর (অনূ), *কালের স্বাক্ষী ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯১

৬৩২. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮

৬৩৩. Dr. Nazimuddin Ahmed, *Islamic Heritage of Bangladesh*, op.cit., P.54

৬৩৪. Naziy Chowdhury, Babu Ahmed ed., Dr. enamul Haque, op.cit., P.64

৬৩৫. Dani, *Dacca*, op.cit., P.191

৬৩৬. Ibid., 192

Dhaka University Institutional Repository

set by the lalbagh fort mosque or khwaja Ambar Mosque."[৬৩৭] দানী বলেন, "On the back side of the west wall the mihrab projections are also bordered by minarets, the domes which rest on ornamented octagonal drams, are crowned with lotus finials. The interior hall is divided in to five bays, each having a decorated mihrab on the west and an ornamented domed ceiling."[৬৩৮]

মসজিদের উত্তর পার্শ্বে সংযুক্ত আছে একটি কামরা, যার ছাদ বাংলার ছাদের মত এর পঞ্চকোণী জোড়া দৃশ্যমানভাবে বাঁকা ও নিম্নমুখী ঠিক যেন বাংলা দো-চালা ঘরের ছাদের মত।[৬৩৯] মরহুম মির্জা গোলাম পীর নতুনভাবে এ মসজিদটি আবাদ করেন। মসজিদের কূপটিও মীর্জা সাহেব নতুন করে সংস্কার করেন। এটা জানা যায়নি যে এর শিলালিপি কি হল, তাই নির্মাণের তারিখ জানা সম্ভব হয়নি।[৬৪০] বর্তমানে কালেও মসজিদটি কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে।[৬৪১]

সামগ্রিকভবে বলা যায় পাঁচটি গম্বুজ উত্তরদিকে দোচালা কুঠিরের ন্যায় কক্ষ এবং নিকটবর্তী বাওলী এসব কিছু মিলিয়ে একসময় কারতালাব খানের মসজিদের প্রাধান্য ছিল অনেকখানি। মসজিদের নিকটবর্তী যে কূপ ছিল বর্তমানে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কূপটি যে স্থানে ছিল মাটি দিয়ে তা সম্পূর্ণ ভরাট করে দেয়া হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী জনৈক মজিদ মিয়ার দোকানের ভেতর থেকে কূপের আদি অংশ প্রবেশ পথের অংশ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। একটি খিলানের গঠন শৈলী বুঝা যায়। সুতরাং বলা যায় ঐতিহাসিক এই বাওলী এটাই একমাত্র চিহ্ন।[৬৪২]

খান মুহাম্মদ মির্ধার মসজিদ, ১৭০৬ খ্রি.

অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত খান মুহাম্মদ মির্ধার মসজিদটি লালবাগ দূর্গের একটু পশ্চিমে আতিশখানা মহল্লায় অবস্থিত। এ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি খান মুহাম্মদ মির্ধা নির্মাণ করেন। মসজিদটির প্লাটফর্মের উচ্চতা ১৭ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ১২৫ ফুট ও প্রস্থ ১০০ ফুট। মসজিদটি ঢাকার ডেপুটি সুবাদার, কাযী 'ইবাদুল্লাহ্ খানের নির্দেশে নির্মিত হয়।[৬৪৩]

মসজিদটি দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট। নীচে ছিল ছাত্রদের হোষ্টেল। মাসজিদের উত্তর দিকের আঙ্গিনায় চার দিকে খোলা হাওদার প্রশস্ত কামরাগুলো আজও মাদরাসা নামে বিদ্যমান এবং প্রসিদ্ধ রয়েছে।[৬৪৪] মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কক্ষের সমন্বয়ে একটি ভল্ট আকৃতির কাঠামো। মাদরাসা কক্ষে প্রবেশ করার

---

৬৩৭. Abdul Bari, op.cit., P.354

৬৩৮. Dani, *Dacca*, op.cit., P.192

৬৩৯. ড. এ. এইচ. দানী, আবূ জাফর, (অনূ), *কালের স্বাক্ষী ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২

৬৪০. মুনশী রহমান আলী তায়েশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৬৪১. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৮৩

৬৪২. মুহাম্মদ রহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫

৬৪৩. Taifur, op.cit., P.179-80

৬৪৪. আবুল হাসান নদভী, অনূ, গোলাম সোবহান সিদ্দীকী, *ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র*, ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., পৃ.৫৫-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

জন্য তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ মাদ্‌রাসাটি মুসলমানদের মাদ্‌রাসার যথার্থ পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়েছে। মিসরের আইয়ুব ও মামলুক শাসনামলে (১১-১৫শ খ্রি.) এ পরিকল্পনার ব্যাপক প্রচলন ছিল।[৬৪৫] মসজিদের পূর্বদিকের দেয়ালে ৩টি প্রবেশ পথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি তুলনামূলকভাবে অন্য দু'টি থেকে বড়। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথ অর্ধগম্বুজের নীচে রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অধিকতর বড়। মসজিদে ৩টি গম্বুজ রয়েছে। গম্বুজ খিলানে বৃহত্তাকার খিলান ব্যবহৃত হয়েছে।[৬৪৬] মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মাদ্‌রাসা পরিচালনার জন্য মুতাওয়াল্লী ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যথেষ্ট সহযোগিতা করে আসছেন। মাদরাসাটি তার পূর্ব গৌরবের স্বীকৃতি না পেলেও নিজ মহিমায় তখনকার গৌরব বহন করে চলছে।[৬৪৭]

মীর্জা খবীর বলেন, "১৯০৬ সাল নির্মিত মোগল স্থপতি খান মুহাম্মদ মির্ধার মসজিদটিও ঢাকার মসজিদসমূহের মধ্যে একটি অপূর্ব সংযোজন।[৬৪৮] তবে এ ক্ষুদ্র কক্ষগুলো মাদ্‌রাসা হিসেবেই ব্যবহৃত বলে মনে হয়।[৬৪৯]

যদি মসজিদ গৃহের এ কক্ষগুলো দোকান-পাট হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত তবে মসজিদটি একটি কোলাহলপূর্ণ স্থানে পরিণত হত। ফলে এগুলো ইমাম ও ধর্মীয় লোকদের শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হ'ত বলে মনে হয়। নীচ তলার এ কক্ষগুলো যেগুলোর দেয়ালে বই রাখার তাক রয়েছে সে সব কক্ষগুলো মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের আবাসস্থল হিসেবেই ব্যবহৃত হত। এ অর্থে ঢাকার এ রীতির সকল মোগল মসজিদকেই আবাসিক মাদ্‌রাসা-মসজিদ হিসেবেই অবহিত করা যায়।[৬৫০]

মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকার কারণে সামগ্রীকভাবে এর সংরক্ষণ ভালভাবেই হচ্ছে। ঢাকার এ রীতির যে কয়টি মসজিদ রয়েছে। তাঁর মধ্যে খান মুহাম্মদ মির্ধার মসজিদটি অন্যতম। এ মসজিদটির দিকে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মসজিদের উত্তর দিকে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মিত হয়েছে। মসজিদটিতে যে উচুঁ প্লাটফর্ম রয়েছে সেই প্লাটফর্মের মধ্যবর্তী স্থান ভরাট রয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয় জনমনে এর বন্ধ হওয়ার ও ভরাট করার ব্যাপার নিয়ে ব্যাপক কৌতুহল ও এটি গুপ্ত কুঠরী ছিল বলে কিংবদন্তী রয়েছে।

ফারুক শিয়ারের (মহস্থানগড়, বগুড়া) মসজিদ ১৭১৯ খ্রি.

বগড়ার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান মহাস্থানগড়ে ১৭১৯ খ্রি. ফারুখ শিয়ার একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য যে, মুঘল আমলে প্রতিষ্ঠিত হলেও সুলতানী আমলের বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের প্রভাব এই ইমারতে লক্ষ্য করা যায়।

---

৬৪৫. Dani, Dacca, op.cit., P.188-89

৬৪৬. Naziy Chowdhury, Babu Ahmed, op.cit., P. 66

৬৪৭. নাজির হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

৬৪৮. মীর্জা খবীর, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

৬৪৯. Catherihe B. Asher, Inventory of key Monuments, *The Islamci Heritage of Banglal*, op.cit., P.57

৬৫০. Md. Bari, op.cit., P.357

Dhaka University Institutional Repository

কদম মুবাররক (চট্টগ্রাম) মসজিদ, ১৭১৯ খ্রি.

চট্টগ্রাম শহরের রসূলনগর এলাকায় কদম মুবারক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। মুঘলশাসনকর্তা ইয়াসীন খান ১৭১৯ খ্রি. এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি রসূলে কারীম পদচিহ্নে (কদম মুবারক) উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্মৃতি সৌধের সংলগ্ন। আয়তাকার তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এই মসজিদটি মুঘল স্থাপত্যের একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

মূসা খানের মসজিদ-১৬৭৯ খ্রি.

মসজিদটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের চত্বরে অবস্থিত। মসজিদটি মাটি থেকে ৩.০৪ মিটার উঁচূ ভূমিতে সমতল ছাদ বিশিষ্ট উত্তর-দক্ষিণে ১৭.৩৬ মিটার এবং প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ১৪.০২ মিটার। মসজিদটিতে প্রবেশ করতে দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে একটি সিঁড়ি রয়েছে। মসজিদটি একটি আয়তাকার মসজিদ। যার দৈর্ঘ্য ১৪.৯৩ মিটার এবং প্রস্থ ৭.৬২ মিটার। মসজিদের চার কোণায় ৪টি অষ্টভূজ আকৃতির বুরুজ রয়েছে, যা ক্ষুদ্র গম্বুজ ও প্যারাপেট দিয়ে প্রলম্বিত।[৬৫১] যে স্থানে মসজিদটি অবস্থিত পূর্বে তা 'বাগ-ই-মূসা' নামে পরিচিত ছিল। তিনি মোগল সুবাদার ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপন করার অনুমতি লাভ করেন। মসজিদটি মূসা খান নির্মাণ করেন বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু মসজিদটিতে শায়েস্তাখানী স্থাপত্য বিদ্যমান। মনে হয় প্রকৃত পক্ষে মসজিদটির নির্মাতা মূসা খানের ছেলে মুনওয়ার খাঁ। সম্ভবত, তিনি শায়েস্তা খানের আমলে বা এর কিছু পরে মসজিদটি নির্মাণ করেন ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে।[৬৫২] মসজিদটি উঁচু প্লাটফর্মের উপর অবস্থিত। যার নীচে বসবাসের জন্য কক্ষ রয়েছে।[৬৫৩] Dr. Nazimuddin Ahmed বলেন, "Built on a high platform above a series of living cells, it closely resembles architeeturally the Mosque of Haji Khawaja Shahbaz near the old high court"[৬৫৪]

রফিকুল ইসলাম বলেন, "মসজিদটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি দোতলায় অবস্থিত এবং নীচের তলায় ঘরগুলি বসবাসের জন্য ব্যবহৃত। মসজিদটির উত্তর পূর্ব কোণে মূসা খানের কবর। এর পশ্চিম দিকে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কবর দেয়া হয়।"[৬৫৫]

হাকিম হাবীবুর রহমান মনে করেন মসজিদটি মূসা খার তৈরি কিন্তু মসজিদটি স্থাপত্য রীতি দেখে দানী মনে করেন, শায়েস্থা খানী রীতিতে নির্মিত মসজিদটি আসলে নির্মাণ করেছিলেন মূসা খার পুত্র মনোয়ার খাঁ। এতে দানীর মতই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।[৬৫৬] পূর্ব দিকের দেয়ালে অর্ধ গম্বুজের নীচে তিনটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ দ্বারটি পার্শ্বের দু'টি প্রবেশ দ্বার থেকে অধিকতর একটু বড়। প্রবেশ পথে

---

৬৫১. Naziy Chowdhury, Babu Ahmed, ed., Dr. Enamul Haque, op.cit., P.56

৬৫২. Dani, *Dacca*, op.cit., P.175

৬৫৩. Ibid., p. 175

৬৫৪. Dr. Nazimuddin Ahmed, *Discover the monuments of Bangladesh*, op.cit., P.177

৬৫৫. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৬৫৬. মুনতাসির মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

খিলানগুলি Four centred আকৃতির এবং অষ্টভূজ আকৃতির টারেট যুক্ত। ভিতরের তিনটি মিহরাবের মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবটি বহু খাঁজ কাটা এবং অন্য দু'টির চেয়ে আকারে বড়। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অভিক্ষিপ্ত (Projected) এবং এর প্রান্ত ভাগ ক্ষুদ্র বুরুজ বিশিষ্ট।[৬৫৭] মসজিদের ছাদে মার্লন নকশা খচিত অষ্টভূমি ড্রামের উপর তিনটি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। গম্বুজগুলোর শীর্ষে পদ্ম-পাপড়ির নকশায় কলস ফিনিয়াল রয়েছে। এ মসজিদে স্বল্প পরিমাণ পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। পাথরের ব্যবহার প্রধানত লক্ষ্য করা যায় মসজিদের চৌকাঠে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি অলঙ্করণ বর্জিত সাদা-মাটা ধরনের। মসজিদ কক্ষটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। মসজিদের তেমন কোন সম্প্রসারণ হয়নি। মসজিদের পূর্বদিকের প্লাটফর্ম উন্মুক্ত রয়েছে। কেবল উত্তর দিকে একটু ছোট ঘর করা হয়েছে। মু'আয্‌যিনের থাকার জন্য মসজিদের প্লাটফর্মের নীচে ভল্ট আকৃতির বেশ কয়েকটি কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলো প্লাটফর্মের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বিন্যস্ত রয়েছে। এই কক্ষগুলো অপরিসর এবং ছাদগুলো নীচু। এসব ঘরে লোকজন বসবাস করছে।[৬৫৮]

১৯৭৩ খ্রি. থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মসজিদটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে।[৬৫৯] মসজিদটি বর্তমানে অবহেলার শিকার। মসজিদটির ইট বেরিয়ে গেছে। মসজিদটি আশু সংস্কার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মসজিদটির আদি ঐতিহ্য ধরে রাখা সম্ভব। মসজিদের আলো তেমন চোখে পড়ে না। মসজিদটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিসীম। সরকারের উচিৎ মসজিদটি রক্ষা করার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পরবাজপুর (খুলনা) মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

খুলনার পরবাজপুর নামক স্থানে একটি বিশাল আয়তাকার মসজিদ নজরে পড়ে। মসজিদটি বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মুঘল স্থাপত্যের শেষভাগের একটি ইমারত। মুঘল স্থাপত্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এই মসজিদে বিদ্যমান।

বাজরা (নোয়াখালী) মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার (বর্তমান উপজেলা) ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বজরা নামক একটি স্থানে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি মসজিদ কালের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বজরা শব্দটি 'বাজরা' নৌকা থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। মসজিদের সম্মুখে রয়েছে একটি ছোট চত্বর। চত্বরের পূর্ব সীমানায় একটি সুদৃশ্য তোরণ সকলেল দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মুঘল স্থাপত্যশৈলীর ব্যাপক প্রতিফলন ঘটেছে এই মসজিদে।

মোগড়া পাড়া মসজিদ, ১৪৮৪ খ্রি.

মোগড়া পাড়াতে শেখ ইউসুফের কবরের পাশে একটি মসজিদ রয়েছে। শিলা লিপিতে রয়েছে ১৭০০ খ্রি.। জেমস ওয়াইজের নিরীক্ষায় দেখা গেছে ইহা পুরাতন মসজিদের উপর সংস্কার করা মসজিদ। মূল

৬৫৭. Naziy Chowdhury, bubu Ahmed, ed., Dr. enamul Haque, op.cit., P. 56

৬৫৮. মুহাম্মদ র ুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৯

৬৫৯. মোঃ আবদুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদটি ১৪৮৪ খ্রি. নির্মিত।[৬৬০] সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের আমলে (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.) মসজিদটি নির্মিত।[৬৬১] বর্তমানে মসজিদের যে শিলালিপি রয়েছে ১৭০০ খ্রি. এ সময় মসজিদটি প্রায় নতুন করেই নির্মাণ করা হয়েছিল। আদি পরিকল্পনা ও আদি প্রাচীরের উপরই এ মসজিদের নির্মাণ কাজ করা হয়েছিল।[৬৬২] সুলতান ফতেহ শাহ্-এর শাসনামল, মোয়াজ্জেমাবাদ লিখিত ছিল সোনার গাঁয়ের মোগড়া পাড়া মসজিদের দেয়ালে।[৬৬৩] স্বরুপচন্দ্র রায় বলেন, "শহর সোনারগায়েঁ খ্যাতনামা ফকির মুহাম্মদ ইউসুফের সমাধিস্থানের নিকটে যে মসজিদ বিদ্যমান আছে, ১৯৬৫ অব্দে সম্ভবত স্বয়ং খন্দকার সাহেব কর্তৃকই উহা বিনির্মিত হইয়া থাকিবে।"[৬৬৪] সম্ভবত, স্বরূপ চন্দ্র রায় মসজিদের দ্বিতীয় বারের কথা উল্লেখ করেছেন। একথাই আলোচনায় প্রতীয়মান হয়।

মসজিদে সরে-জমিনে গিয়ে দেখা গেছে মসজিদে মুসল্লীর সমাগম প্রচুর। পাশে ইবরাহীম দানিশমন্দের কবরের পাশে আরও অনেক কবর রয়েছে। ৩টি কবরের দেয়ালে লিখিত রয়েছে (১) হযরত সৈয়দ ইবরাহীম দানিশমন্দ (২) সৈয়দ হযরত মুহাম্মদ ইউসুফ (৩) শাহ সৈয়দ হযরত কামিল (র.)। আরও ছোট বড় অনেকগুলো কবর রয়েছে। কবরগুলো মসজিদের দক্ষিণ পাশে। মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে সোনারগাঁয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাসহ অনেক কবর রয়েছে।

'Sonargaon-Panam' গ্রন্থে আয়েশা বেগম মোগড়াপাড়া মসজিদের একটি শিলালিপির কথা উল্লেখ করেছেন যা আরবী ভাষায় লিখিত। তা নিম্নরূপ.

قال الله تعالى وان المساجد لله ـ فلا تدعوا مع الله احدًا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدًا بنى الله له سبعين قصرًا في الجنة ـ بنى المسجد في عهد سلطان الاعظم المظم جلال الدنيا والدين امير المظفر فتح شاه السلطان ابن محمود شاه سلطان ـ خلل الله ملكه وسلطنه ـ ياتى المسجد مقرب الدولة ملك الدين ـ الدين السلطانى جامدار غير محلى وسرلشكر وزير اقليم معظماباد ونير مشهور محموداباد سرلشكر قهانه لاور وكان ذلك في التاريخ من المحرم تسع وثمانين ثمانمائة.[৬৬৫]

অনুবাদ, "আল্লাহ্ বলেন, মসজিদসমূহ আল্লাহ্র জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্ তাঁর জন্য জান্নাতে সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছে সুলতানুদ-দুনিয়া-ওয়াদদীন-আবুল মুজাফফর ফতেহশাহ ইব্ন মাহমুদ শাহ-এর আমলে। আল্লাহ্ তার রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন। মুকাররাবুদ-দৌলা

৬৬০. Habiba Khatun; op.cit., P. 93

৬৬১. Perween Hasan. *Muslim architecture*, ed., A.B.M. Hosain, Sonargaon-Panam, op.cit., P. 68

৬৬২. Ahmad Hosoin Dani, *Muslim Architecture in Bangal,* op.cit., P.234-35

৬৬৩. A.K.M. Sahnawaz. op.cit., P.52

৬৬৪. শ্রী স্বরূপ চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৬৬৫. Ayesha Begum, inscriptions, ed., A.B.M. Hosain, *Sonargaon Panam*, op.cit., P.152

Dhaka University Institutional Repository

মুলকুদ-দীন সুলতানুল জামিদার মোয়াজ্জামাবাদের গর্ভনর ও উজির লাউর থানার সেনাপতি তারিখ মুহাররম ৮৮৯ হিজরী।"

এই শিলালিপিটি আলেকজান্ডার কানিংহাম কর্তৃক ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে অবিস্কৃত হয়। সম্ভবত শিলালিপিটি মসজিদের সামনের দেয়ালে ছিল পরে হয়ত তা স্থানান্তরিত হয়।[৬৬৬] তিনি সোনার গাঁয়ের ধ্বংসাবশেষ ও স্থাপত্যকলাসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি ঢাকাতে বিবি পরীর এবং বিক্রমপুরের বল্লাল সেনের বাড়ি ও বাবা আদম শহীদের কবর পরিদর্শন করেন। সোনার গাঁ থেকে বারটি উৎকীর্ণ লিপি উদ্ধার করেন।[৬৬৭]

বায়জিদ বোস্তামীর (চট্টগ্রাম) মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম পবিত্র স্থান কারণ এর মাটিতে যুগ যুগ ধরে সাধুপুরুষ, দরবেশ, ধর্মপ্রচারক এসে বসতি স্থাপন করেন। বার আওলিয়ার দেশ চট্টগ্রাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি অর্জন করে বায়জিদ বোস্তামীর মাজার ও মসজিদের জন্য। চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রণেতা হামিদউল্লাহ খান যথার্থই বলেন যে, মাজারটি আসল নয় কারণ বায়জিদ বোস্তামী পারশ্য দেশ থেকে বাংলাদেশে আসেন নি। সুতরাং সমাধিটি একটি স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সমাদৃত। এই দরগাহের সংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মিত হয়। স্থাপত্যশৈলী ও অলঙ্করণ পদ্ধতি দেখে মনে হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মসজিদটি স্থাপিত।

শাহজালের দরগাহ (শ্রীহট্ট) মসজিদ অষ্টাদশ শতাব্দী

ফিশারের ভাষায়, "শ্রীহট্টের ধর্মীয় কেন্দ্র হচ্ছে প্রখ্যাত শাহ্ জালালে সমাধি কাচারী থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি উঁচু ভূমির উপর ইহা স্থাপিত, যাতে সম্ভবত প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ থাকতে পারে। অসংখ্য ধাপ সম্বলিত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটি বড় চত্বরে পৌঁছতে হয়। সম্মুখে একটি প্রধান কক্ষ রয়েছে যার মধ্য দিয়ে মাজারে প্রবেশ করা যায়।" দানীর মতে, ১৭৪৪ খ্রি. ফৌজদার বাহরাম খান কর্তৃক আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট শাহজালালে সমাধি সংলগ্ন মসজিদটি নির্মিত হয়। এই ইমারতেও মুঘল স্থাপত্যরীতির বিকাশ ঘটেছে।

সিতারা বেগমের মসজিদ- ১৮১৯ খ্রি.

মসজিদটি জনৈক গোলাম মুহাম্মদের স্ত্রী সিতারা বেগম সিংটোলা এলাকায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্মাণ করেন। প্রবেশ দ্বারের উপরে প্রোথিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নির্মাণ করেন।[৬৬৮] বাল্ক ধরনের গম্বুজগুলো আটকোণা ড্রামের উপর স্থাপিত।[৬৬৯]

---

৬৬৬. Ibid., P.152

৬৬৭. Abu imam, *Sir Alexander Cunningham and the Beginning of indian Architecture*, Dacca:Asiatic society of pakistan, 1966, P. 123

৬৬৮. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১-৭২

৬৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

তারা মসজিদ (১৮শ শতাব্দী)

মসজিদ নগরী ঢাকার মসজিদসমূহের মধ্যে তারা মসজিদ সবচেয়ে আকর্ষণীয়। অত্যন্ত মনমুগ্ধকর জমকালো নকশা, অলঙ্কারে সমৃদ্ধ। এটি জনপ্রিয় মোজাইক নকশায় খচিত একটি স্বার্থক মসজিদ স্থাপত্যের নিদর্শন। পুরাতন ঢাকায় আরমানিটোলায় আবূল খায়রাত লেনে তারা মসজিদ অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মীর্জা গোলাম পীর এ মসজিদ নির্মাণ করেন। আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি ১৯২৬ সালে আলীজান ব্যাপারী কর্তৃক প্রস্থ এবং ১৯৮৭ সনে দৈর্ঘ্য সম্প্রসারিত হয়। পূর্ববর্তী তিনটি গম্বুজের সঙ্গে আরও দু'টি গম্বুজ সংযুক্ত হওয়ায় বর্তমানে মসজিদে গম্বুজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ-এ।[৬৭০]

স্থাপত্যশিল্পে অত্যন্ত নিখুঁত মোগল স্টাইলের এ মসজিদটির দেয়ালে শত শত ছোট বড় উজ্জল তারকাসহ পাঁচটি গম্বুজ রয়েছে। চীনা মাটির বাসনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোর সমন্নয়ে এবং দূর থেকে দেখলে মনে হয় ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ জ্বলমল করছে। এমনকি এর ভিতরভাগ বহিরভাগ অপেক্ষা অনেক সুন্দর। অত্যন্ত সুন্দর মোজাইকের মেঝ, দেয়ালে বসানো ফুল, আর পত্ররাজির দৃশ্যাবলী একটি পূর্ণাঙ্গ সমতানের সৃষ্টি করেছে।[৬৭১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর এ আদি মসজিদটি বর্তমানে সংস্কার করার ফলে চিহ্নিত করা দুস্কর। ১৯২৬ সনে আলী জান ব্যাপারী এর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। তিনি পূর্বদিকে একটি পঞ্চ খিলানযুক্ত বারান্দা নির্মাণ করেন। তাছাড়া জাপান থেকে চীনা মাটির ট্যালি সংগ্রহ করে মসজিদ আচ্ছাদন করা হয়। অসংখ্য টুকরো টুকরো রঙিন চীনা মাটির অংশ ও কাঁচ বসিয়ে অলঙ্কার করা হয়। এ অলঙ্করণ পদ্ধতিকে 'চিনি টিকরি' বলা হয়। পূর্বদিকের দেয়ালের মাঝখানে চীনা মাটির টুকরো দিয়ে অর্ধচন্দ্র ও তারা সৃষ্টি করা হয়েছে। গম্বুজেও অসংখ্য তারা রয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই মসজিদটির নাম হয় তারা মসজিদ।[৬৭২] মসজিদটি সম্প্রতিকালে সম্প্রসারিত করা হয়েছে ১৯৮৫ সনে।[৬৭৩]

মসজিদের ফাসাদে (Facade) পাঁচটি খিলানের প্রবেশ পথ। এ খিলানগুলো বহু খাঁজ বিশিষ্ট এবং চারটি অষ্টাভূজাকার স্তম্ভ হতে উৎসারিত। বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দু'টি করে এবং মূল নামায গৃহের উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে।[৬৭৪] জুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে ফুলদানী থেকে উত্থিত ফুলগাছ খিলান শীর্ষে, পানদানতিভের উপরে ও দেয়াল গাত্রে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। জাপানের বিখ্যাত ফুজিসান অর্থাৎ পর্বত-এর দৃশ্য সম্বলিত গ্রেঘ টাইল।[৬৭৫] ১৯৮৫ সনে একাশি লক্ষ টাকা ব্যয়ে মসজিদের কাজ হয়েছে। সংস্কারের কারণে মসজিদের কিছু অংশ ভেঙে ফেলা হয়। দু'টি নতুন গম্বুজ ও তিনটি

৬৭০. আয়শা বেগম, তারা মসজিদ; অতীত ও বর্তমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, দ্বাত্রিংশ সংখ্যা অক্টোবর, ১৯৮৮, পৃ.১৯৯৪-৯৬

৬৭১. Editor M.S. Hoque, *English for to day*, for class ix-x, Dhaka: National curriculum and text book Board, 2003, Reprinted, P.145

৬৭২. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশ মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭২

৬৭৩. মোঃ আবদুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৬৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

৬৭৫. Dr. Nazimuddin Ahmed, *Discover the Monuments of Bangladesh*, op.cit., P.182

Dhaka University Institutional Repository

মিহরাব তৈরি করতে নতুন নির্মাণ কাজ আড়াই বছর সময় লাগে। ১৯৮৭ সনে মসজিদের পূর্ণ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় দাড়ায় এককোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা।[৬৭৬] বৃহত্তর ঢাকা জেলায় মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে তারা মসজিদ উজ্জল ভাস্বর হয়ে থাকবে।

কসাইটুলি মসজিদ-১৯১৯ খ্রি.

কসাইটুলী মসজিদকে ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলঙ্করণ বলা হয়ে থাকে। কসাইপট্টিতে অবস্থিত এ মসজিদটি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'আবদুল বারী ব্যাপারী নির্মাণ করেন। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। গম্বুজ তিনটি তরমুজের মত খাঁজ কাটা এবং শীর্ষ দেশে কলস ধরনের চূড়া রয়েছে। যা পদ্ম ফুলের ভিতের উপর স্থাপিত। গম্বুজ তিনটি অর্ধগোলাকার ড্রামের উপর থেকে উঠে গেছে। ড্রামের উপরিভাগে পদ্ম পাতার নকশা বা মার্লন রয়েছে। এই অনুপম সৌন্দয্যের অধিকারী মসজিদটি গঠনশৈলী, ভারসাম্য ও অলঙ্কারিক বিন্যাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পূর্বদিকে তিনটি খাঁজকাটা খিলান পথ রয়েছে। চারকোণে চারটি ছোট আকারের আটকোণা বুরুজ ছাড়াও মধ্যভাগে এক জোড়া এবং দুই পাশে একটি করে দেয়াল সংলগ্ন টারেট রয়েছে। প্রত্যেকটি টারেট ও বুরুজ ছোট আকারের গম্বুজ ও চূড়া দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি করা হয়েছে।[৬৭৭]

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ-১৯৬০

ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম। প্রায় দেড়কোটি নাগরিক অধ্যুষিত ম্যাগা-সিটি ঢাকার এ কেন্দ্রীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণের আবেগ-অনুভূতির সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর সমন্বয় ঘটিয়ে। মূল ভবনের বর্হিদৃশ্য নির্মিত হয়েছে খানায়ে কা'বার আদলে, নামায কক্ষ নির্মিত হয়েছে কায়রো-কর্ডোভার মসজিদের আদলে, মসজিদের খোলা চত্বরটি নির্মিত হয়েছে স্পেনের মুসলিম স্থাপত্য পাতিয়ো-এর আদলে, এর মিহরাব তৈরি করা হয়েছে পারস্য ও উপমহাদেশীয় মোগল স্থাপত্য শৈলীর আদলে।[৬৭৮] এ মসজিদের ব্লুপ্রিন্ট ও স্থাপত্য নকশা তৈরি করেন সুবিখ্যাত স্থপতি এ.এইচ, থারিয়ানী, মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ২৭ শে জানুয়ারি ১৯৬০ সনে- যার প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন হাজী আবদুল লতীফ বাওয়ানী।[৬৭৯] লতীফ বাওয়ানীর অনুরোধে বায়তুল মুকাররম মসজিদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবদুল লতীফ বাওয়ানীর বাড়িতেই তৎকালীন পাকিস্তানের শিল্পপতিদের এক সভা ১৯৫৯ সনের ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জি. এ. মাদানী নতুন মসজিদের নাম 'বায়তুল

৬৭৬. মোঃ আবদুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫

৬৭৭. Bangladesh Directory, op.cit., P.29

৬৭৮. এম র ুল আমিন, প্রাগুক্ত, (প্রকাশকের কথা), পৃ.-৫

৬৭৯. Dr. Syed Mahmudul Hasan, *Dhaka the city of Masques*, op.cit., P.57

Dhaka University Institutional Repository

মুকাররম' প্রস্তাব করেন। তাঁর এ প্রস্তাব এ সভায় গৃহিত হয়। মাদানী সাহেব মসজিদের স্থানও নির্বাচন করেছিলেন।[৬৮০]

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান ২৭ শে জানুয়ারি ১৯৬০ সনে মহাড়ম্বরে বায়তুল মুকাররম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রেসিডেন্ট এই মসজিদের সার্বিক পরিকল্পনার জন্য বাওয়ানী পরিবারের ভূয়শী প্রশংসা করেন। মসজিদের উন্নয়ন, এর ব্যয়ভার নির্বাহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যে অর্থ সংগ্রহের একটি উপায় হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিষদ মসজিদের নীচ তলায় বাজার কমপ্লেক্স নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৬৮১] মসজিদের মূল ভবনটি নির্মিত হয়েছিল হিতাকাঙ্ক্ষী লোকদের প্রদত্ত চাঁদার টাকা থেকে। পরীবাগের পীর মাওলানা সায়্যিদ শাহ আবদুর রহীম সাহেব ১৩৭৯ হিজরীর ২৪ রমযান জুমা'আতুল বিদার (২৫ মার্চ ১৯৬০) নামাযে মিহরাবের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মসজিদে প্রথম সালাত অনুষ্ঠিত হয় ২৫ জানুয়ারি, ১৯৬৩, শুক্রবার। প্রথম তারাবীর নামায অনুষ্ঠিত হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৩। প্রথম নামায অনুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত এ কাজে ব্যয় হয় প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা।[৬৮২]

বায়তুল মুকাররম মসজিদের প্রথম খতীব ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম, মুজাদ্দিদ, ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসার হেড মাওলানা মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহ্‌সান। বায়তুল মুকাররম মসজিদ জমির পরিমাণ তিন একর এবং সম্পূর্ণ এলাকায় জমির পরিমাণ ৮.৩০ একর। সমগ্র মসজিদটি আট তলা বিশিষ্ট। তবে নামাযের জন্য ব্যবহৃত হয় সাধারণত ছয় তলা পর্যন্ত। নীচ তলায় প্রধান নামাযের স্থানটি এগার হাজার তেইশ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রশস্ত বারান্দা, ব্যালকনি যার আয়তন একহাজার ৮৫৬ বর্গফুট। নীচতলা সংলগ্ন পূর্বদিকে রয়েছে উনত্রিশ হাজার বর্গফুটের সুবিস্তৃত সাহান।[৬৮৩]

সাহানের দক্ষিণ পার্শ্বের আযূখানার আয়তন ৩.৬৭৬ বর্গফুট। এতে রয়েছে ১২০টি আসন ও ১২০টি টেপ, সাহানের উত্তর পার্শ্বেও রয়েছে একটি অযূখানা। এর আয়তন ৩,০৫৯ বর্গফুট। অযূর জন্য রয়েছে কৃত্রিম লেক। দক্ষিণ পার্শ্বের অযূখানার উপরে রয়েছে ৪,৫০২ বর্গফুট বিশিষ্ট মহিলাদের জন্য একটি 'নামায কক্ষ'। এখানে মহিলাদের ব্যবস্থা মহিলা খাদিম দ্বারাই হয়ে থাকে। দক্ষিণ পার্শ্বের মহিলা অযূখানার আয়তন ৬২৭ বর্গফুট এবং উত্তর পার্শ্বের আয়তন ২৫৬ বর্গফুট।[৬৮৪] অসংখ্য ধাপ বেয়ে এক গম্বুজ বিশিষ্ট পর্চে উঠতে হয়। দ্বিতলে মসজিদ নির্মিত হওয়ায় এ ইমারতের অনুপম সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান পর্চের উচ্চতা ৯০ ফুট এবং এখানে আল্লাহর নিরানব্বইটি গুণাবলী উৎকীর্ণ হয়েছে। প্রধান প্রার্থনা ঘরটি অসংখ্য গোলাকার স্তম্ভ দ্বারা সৃষ্ট। কিবলা প্রাচীরে একটি সুন্দর নকশাকৃত সমতল

৬৮০. এম.র ুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৬৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৬৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৬৮৩. সৈয়দ আখতার ইউসুফ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম, *দৈনিত ইত্তেফাক*, ঢাকা: ১৪ জুলাই, ২০০০ খ্রি., শুক্রবার, পৃ. ২৩

৬৮৪. এম. র ুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

Dhaka University Institutional Repository

মিহরাব ও মিনার আছে।[৬৮৫] মসজিদের তিন দিকেই বিস্তৃত বারান্দা। সূর্যের আলো আর বাতাস প্রবেশের প্রচূর সুবিধা রয়েছে। মসজিদের ভেতরের অংশটি মনমুগ্ধকর। ইসলামী স্থাপত্য ও আধুনিক স্থাপত্যের এক অপূর্ব সমন্বয়। সবকিছুই এর আপন মহিমায় উজ্জল। অতি অলঙ্করণ করে স্বাভাবিকতাকে খর্ব করার চেষ্টাও এখানে চোখে পড়ে না। অনাড়ম্বর অথচ সৌন্দর্যমণ্ডিত এরূপ মসজিদ ইসলামের অনাবিল স্থাপত্য কীর্তির পরিচায়ক। মসজিদটি আপন স্থাপত্যে কর্মে মহিমাময়।[৬৮৬]

মসজিদের সাথে রয়েছে বাংলাদেশের ইসলামী লাইব্রেরির জগতে একটি শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতে রয়েছে বহুমূল্যবান পাণ্ডুলিপি ও অসংখ্য গ্রন্থের এক অমূল্য ভাণ্ডার।[৬৮৭] বায়তুল মুকাররম মসজিদে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে হাজার হাজার মুসল্লীর সমাগম ঘটে। জুমু'আর দিন মসজিদের সাত তলাসহ উত্তর ও দক্ষিণ গেটের খালি জায়গা ভরে যায়। লাইলাতুল কদর, রমযান ও দুই 'ঈদের জামা'আতে লক্ষ লক্ষ মুসল্লীর সমাবেশ ঘটে এখানে। বায়তুল মুকাররম মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যাস্ত।[৬৮৮] রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এটি দেশের বৃহত্তম মসজিদ। ঐতিহ্যবাহী এ মসজিদটি শুধু আয়তনের বিশালতায় নয় ক্লাসিক স্থাপত্যেও স্থাপত্যশৈলীর বিচারে অতুলনীয়।[৬৮৯]

দক্ষিণ পাশের যে লেকটি ছিল সম্প্রতি তা ভরাট করে দ্বিতল ভবনের সমান করে বিশাল এলাকা জুড়ে নামায আদায়ের জায়গা করা হয়েছে। মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দক্ষিণের অংশে বিশাল একটি তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। দক্ষিণের দিক থেকে মসজিদে প্রবেশ করার জন্য একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। তোরণের পশ্চিম পার্শ্বে একটি সুউচ্চ মিনার সদৃশ টাউওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। এটি জাতীয় মসজিদের স্থাপত্য কর্মের পরিচয় বহন করে। টাউয়ারের শীর্ষ চূড়ার নীচে বাতি ঘর জায়গা ভরাট করার ফলে দক্ষিণ দিকের সিঁড়িগুলো এখন আর নেই। বায়তুল মুকাররম শুধু ঢাকা নয় গোটা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মসজিদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জামি' মসজিদ, ১৯৬৬ খ্রি.

ঢাকা শহরের অন্যতম আধুনিক এবং অন্যতম ঐতিহ্যবাহী মিনার সম্বলিত মসজিদ নির্মিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ১৯৬৬ সনে নির্মিত এ জামি' মসজিদটি একটি পূর্ণাঙ্গ মসজিদের সমস্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি ।[৬৯০]

মসজিদের পশ্চিম দিকে রয়েছে লিওয়ান। যার ছাদ সমান্তরাল অর্থাৎ গম্বুজ বিহীন। পশ্চিম দিকে সাহান বা খোলা চত্বর রয়েছে। চত্বরের তিনদিকে ছাদ বিশিষ্ট করিডোর বা নির্মিত দুটি গোলাকার সুউচ্চ মিনার।

৬৮৫. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৬৮৬. এম. রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৬৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮

৬৮৮. সৈয়দ আখতার ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

৬৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

৬৯০. Bangladesh Directory, op.cit., P.30

Dhaka University Institutional Repository

কিবলার দিকের দেয়ালে রয়েছে মিনার ও সমতল মিহরাব। মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে এ মসজিদটি একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত।[৬৯১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও বহিরাগত লোকজন এ মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমা'আর সালাত আদায় করে থাকেন।

৬৯১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ইসলামী সমাজে মসজিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মসজিদ হচ্ছে ইসলামের ভিত্তিগত সামষ্টিক কেন্দ্র। তা-ই হচ্ছে প্রশাসনিক ভবন, বিচারালয়, ইসলামী আইনের ঘোষণা কেন্দ্র, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার স্থান। সর্বোপরি মুসলিম জনগণের মিলনক্ষেত্র। অনুরূপভাবে যাঁরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে চায়, তাঁদের গড়ে উঠার কেন্দ্র। এখান থেকেই গতিশীলতা ও সক্রিয়তা সূচিত হবে ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য।[৬৯২] মসজিদ শুধু 'ইবাদতের স্থানই নয়, মুসলিম সমাজে মসজিদ একটি বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামের প্রথম যুগে মসজিদুন নববী থেকে শুধু সমাজ নয়, রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত। মুসলিম সমাজ তখন মসজিদ থেকেই পেত দৈনন্দিন চলার পথের দিশা। তাঁদের সব প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান হত মসজিদ চত্বরেই।[৬৯৩] হিদায়াতের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে মসজিদ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সকল অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজসহ বিবাহ-শাদি ও দৈনন্দিন সালাত আদায়ের সব কিছু এ মসজিদেই সম্পাদিত হত। তখনকার মসজিদগুলো ছিল জীবন ও কর্ম-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের সকল ক্ষেত্রে মসজিদের ভূমিকা ছিল অসমান্য।[৬৯৪] সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী বলেন, "দীন ও মসজিদ পরস্পর সংলগ্ন। বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থাদি বাদ দিলে শুধু গৃহটিকে যেমন বিদ্যালয় বলা চলে না। হাকীকি মসজিদ তৈরির শিক্ষা বাদ দিলে সেইরূপ মসজিদ গৃহকে মসজিদ বলাই চলে না।"[৬৯৫] আল্লামা যাফীরুদ্দীন তার 'ইসলাম কা নেযামে মাসজিদ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "ইসলামী কেন্দ্রের এ মসজিদটি শুধু ইট পাথরের একটি মোর্দা মসজিদ ছিল না, বরং ইহা একটি জীবন্ত মসজিদ এবং ইসলামের একটি অজেয় দূর্গ ছিল।"[৬৯৬]

মসজিদ পবিত্র ও শ্রেষ্ঠতম স্থান

ইসলামে মসজিদের অনেক বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে। মসজিদকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক উচ্চাসন প্রদান করেছেন। আর মসজিদ-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল্-কুর'আনে অনেক আয়াত বিদ্যমান।[৬৯৭] বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) বাতিল ধর্ম ও মতাদর্শের দুর্বিষহ অভিশাপ থেকে সমগ্র বিশ্ব-মানবসমাজকে মুক্ত করে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থানুযায়ী আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব-শান্তির পথ প্রশস্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই মদীনায় একটি আদর্শ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। মিথ্যা ও বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে সত্য ও হক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে মহাবিপ্লবের ডাক

---

৬৯২. মওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, *ইসলামী সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, কারকুনবাড়ী লেন, ১৯৯৭ খ্রি., ২য় প্রকাশ, পৃ. ৭

৬৯৩. মুহাম্মদ আবদুলণ্ঢাহ, *মসজিদের বিধানাবলী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ২৮

৬৯৪. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, প্রকাশকের কথা।

৬৯৫. সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী, *মসজিদ দর্শন*, ঢাকা: আসাদ বুক হাউস, বাংলা বাজার, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ২৬

৬৯৬. মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী, *মসজিদ ও জীবন্ড় মসজিদ* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, ঢাকা:আল-আশরাফ প্রকাশনা, বাংলাবাজার, ৫ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ২০

৬৯৭. আবূ মু'আয খালিদ বিন 'আবদুল আল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিলেন, এ মসজিদ ছিল তার পবিত্রতম প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আদর্শ মানুষের সমন্বয়ে একটি সুখী সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলার যে মহাপরিকল্পনা নিয়ে তিনি এক সার্বক্ষণিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে ছিলেন এ মসজিদ ছিল তার মূল প্রেরণাস্থল।[৬৯৮] তাই মসজিদের উদ্দেশ্য বর্হিভূত সকল কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রেখে মুসল্লীদের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত কর্তব্য।[৬৯৯] এ প্রসঙ্গে কুর'আনে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণে বাধা দেয় এবং মসজিদসমূহকে শুন্য করার চেষ্টা করে তার চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে?"[৭০০] অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমরা লক্ষ্য স্থির রেখে সর্বান্তকরণে দাঁড়াবে প্রত্যেক মসজিদে তোমরা তাঁকে বিশুদ্ধ চিত্তে আনুগত্যশীল হয়ে ডাকবে।"[৭০১] আরেকটি আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন,[৭০২] নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং গোটা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়। আর এ গৃহ হচ্ছে জনগণের জন্য পূর্ণমিলন কেন্দ্র ও শান্তি নিকেতন। এখানে অবস্থিত মাকামে ইব্রাহীমকে আল্লাহ্ মুসাল্লা বানিয়ে দিয়েছেন।[৭০৩]

অপরাপর উপাসনালয় থেকে মসজিদ একটু ভিন্ন ধরনের। ইসলামের বিধান অনুযায়ী যে কোন মুসলিম যে কোন সময় মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারেন। কিন্তু পুরোহিত ছাড়া গির্জা বা মন্দির অথবা অন্যান্য উপসানালয়ে গিয়ে যে কোন লোক, যে কোন সময় তাদের প্রার্থনা করতে পারে না। এতেই মসজিদের মর্যাদা ফুটে উঠে। অথচ মুসলমানগণ জামা'আতের সময়ও তাঁদের ইমামের পরিচালনায় সালাত আদায় করে থাকেন। ইসলামের এ উদারনীতির ফলেই বিশ্বে নির্মিত হয়েছে ছোট মসজিদ ও জুমু'আ মসজিদ।[৭০৪]

عن أبى قتادة الانصارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين ان يجلس.

মসজিদের এ মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার্থে যে কোন মুসলমান যখনই মসজিদে প্রবেশ করে তখনই তাঁকে মসজিদে বসার পূর্বে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতে হয়।[৭০৫]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سمع رجلا ينشد ماله في المسجد فليقل لا وردها الله عليك ـ فان المساجد لم تبن لهذا.

---

৬৯৮. কাজী মুহাম্মদ বুরহান উদ্দীন, *মসাজিদুন্নবীর আদর্শে মসজিদ আবাদ ও জীবন্ড় করার দিক নির্দেশনা*, ঢাকা: সার্চ কম্পিউটার, ফকিরাপুল, ২০০২, পৃ. ২০

৬৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৭০০. আল-কুর'আন, ০২:১১৪

৭০১. আল-কুর'আন, ০৭:২৯

৭০২. আল-কুর'আন, ০৩:৯৬

৭০৩. আল-কুর'আন, ০২:১২৫।

৭০৪. ড. মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশের মসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৭০৫. ইমাম মালিক বিন আনাস, *মুয়াত্তা*, আশরাফিয়া বুক ডিপো, ভারত: দেওবন্দ, তা. বি., পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে উচ্চস্বরে শোরগোল করতে নিষেধ করেছেন।[৭০৬] আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার ও যেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, সে গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা যাঁদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে, সালাত থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।"[৭০৭]

মুসলিম জাতি যত দিন মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখবে তত দিন সে গৌরব ও উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হতে থাকবে। কারণ এ মসজিদে ধনী-গরীব সকলেই এক সারিতে দাঁড়িয়ে একত্রে সালাত আদায় করে। সিজদা ও রুকূ'র সময় একজনের শরীর অন্য জনের সাথে মিলিত হয়। মসজিদের কাতারে কারও জন্য কোন স্থান নির্ধারিত থাকে না। কেউ ধাক্কা-ধাক্কি করে কারও আগে যায় না।[৭০৮] এ থেকেই মসজিদের মর্যাদা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠে। যখন কোন মানব হৃদয় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হবে, আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতের জন্য সে মসজিদে গমন করে সালাত, ই'তিকাফ এবং সালাত আদায়কারিগণের অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হবে তবেই হবে সে মসজিদের বাসিন্দা।[৭০৯] মসজিদে গমন করা, মসজিদের সঙ্গে অন্তর জুড়ে দেয়া এবং সালাত আদায় করার পর অন্য সালাতের জন্য মসজিদে অপেক্ষা করা পূর্ণ ঈমানদারের নির্দশন।[৭১০]

মসজিদের সম্মান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকেরই সম্মান। মসজিদকে অসম্মানী করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের অসম্মানী করা।[৭১১] মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী বলেছেন "ইসলাম ধর্মের মসজিদ একটি মন্দির বা গির্জা নহে। ইহা মোছলেম সমাজের একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই মোছলেম জাতির প্রাণ। এই প্রতিষ্ঠান যদি জীবন্ত থাকে তবে মোছলেম জাতিও জীবন্ত, আর এই প্রতিষ্ঠান যদি শুস্ক কাঠ বা ইট পাথরে পরিণত বা অন্যান্য জাতির পূজা গৃহের মত শুধু পূজাগৃহ হইয়া যায়– তবে মোছলেম জাতিও প্রাণহীন নির্জীব।"[৭১২] আয়না যেরূপ সূর্যের সম্মূখে ভাস্বর হয়ে উঠে, অনুরূপ মসজিদসমূহ আল্লাহর নূরের কেন্দ্র।[৭১৩] মসজিদ মুসলিম জাতির সর্গোদ্যান। এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এ দু'আটি " سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله الله اكبر. " পাঠ করলে

---

৭০৬. মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ ইব্ন মাযাহ্, প্রাগুক্ত, আবওয়াবুল মাসাজিদ, পৃ. ৬৫

৭০৭. *আল-কুর'আন*, ২৪: ৩৬-৩৭

৭০৮. 'আলণ্ঢামা শায়খ মুহাম্মদ সালিম বিহানী, উর্দূ অনু, ড. মুহাম্মদ হাবীবুলণ্ঢাহ মুখতার, *ইসলাহে মা'আশেরা আওর ইসলাম*, পাকিস্ড়ন: দার"ত তাসনীফ, জামি'আ 'উলূম ইসলামিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৮৯

৭০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৭১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

৭১১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *আদাবুল মাসাজিদ* (উর্দূ), চট্টগ্রাম: আশরাফিয়া কুতুবখানা, মাদ্রাসা রোড, হাটহাজারী, তা. বি., পৃ. ৪

৭১২. মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী, *মসজিদ ও জীবন্ড় মসজিদ*, ঢাকা:আল-আশরাফ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ২০০৩ খ্রি., ৫ম সংস্করণ, পৃ. ১৮

৭১৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৮শ খ", ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ.৪৫৮

Dhaka University Institutional Repository

জান্নাতের ফল ভক্ষণ করা হয়।[৭১৪] মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) 'আদাবুল মাসাজিদ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "যে ব্যক্তি মসজিদের নিকট থাকে, সে মসজিদের নৈকট্য দ্বারা বহু উপকৃত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পায়, আর যে ব্যক্তি মসজিদ হতে দূরে থাকে, সে মসজিদে গমন করলে পদক্ষেপের আধিক্য দ্বারা বেশি নেকি বর্ধনের সফলতা অর্জন করতে পারে। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার রহমতের অবারিত দ্বার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের জন্যই সতত উন্মুক্ত থাকে।"[৭১৫]

কোলাহল ও কোন্দল সৃষ্টি করার ও অন্য কাউকে উৎপীড়ন করার মানসিকতা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা কারও পক্ষেই সঙ্গত নয়। মসজিদে উপস্থিত হতে যদি কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে তাহলে আল্লাহর প্রশস্ত জমিনের যে কোন স্থানে সালাত আদায় করা যাবে।[৭১৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, عن النبيى صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة "গোসলখানা ও কবরস্থান ব্যতীত পৃথিবীর সকল স্থানই সিজদার স্থান।"[৭১৭] প্রশস্ত স্থান বলতে যে কয়টি স্থানে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ সে-কয়টি স্থান ব্যতীত অন্য স্থানসমূহকে বুঝায়। নিষিদ্ধ স্থানসমূহ যেমন আর্বজনার স্থান, কবরস্থান, উট বাঁধার স্থান, রাস্তার মাঝখান, কসাইখানা, গোসলখানা, কা'বা ঘরের ছাদ।[৭১৮] দেহ ও পোষাক পরিচ্ছদের যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র হয়ে এবং অন্তরকে কুফ্র, শির্ক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা-লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত।[৭১৯]

عن معاوية بن قرة عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى من هاتين الشجرتبن يعنى البصل والثوم ومن اكل هما فلا يقربن مسجدنا.

এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পিয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন।[৭২০] ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদ কোন সাধারণ বা অবাধে কিংবা অপ্রস্তুত মনোভাব নিয়ে যাওয়ার স্থান নহে। মসজিদের উপর রয়েছে পবিত্রতার একটা স্পষ্ট ছাপ। মসজিদের সম্পর্ক মহান 'আল্লাহ্র সাথে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত। আল্লাহ্ মাসজিদকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিয়েছেন। তাই মুমিন ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন অন্তরে পরম প্রশান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে। বস্তুত মসজিদ এক মহান উচ্চতর অধ্যাত্মিক পরিবেষ্টনী ইমানদার লোকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শান্তির নীড়।[৭২১] সদর উদ্দীন আহমদ

---

৭১৪. শাহ্ ওয়ালিয়ুলণ্ঢাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২; ওয়ালিয়ুদ্দীন মুহাম্মদ আত্-তাবরিযী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০; জালালুদ্দীন সূয়্যূতী, *আল-জামিউস সাগীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৭১৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *আদাবুল মাসাজিদ* (উর্দূ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৭১৬. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *কোরআন শরীফ* (বাংলা অনুবাদ ও তাফসীরসহ), ঢাকা:ঝিনুক পুস্ড়কা, মাঘ-১৩৮২ বাংলা, পৃ.৬১

৭১৭. সুলায়মান ইব্ন আশ'আস, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০

৭১৮. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৭১৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনু, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মা'আরিফুল কুর'আন, প্রাগুক্ত, প, ৬১

৭২০. ওয়ালিয়ুদ্দীন মুহাম্মদ আল-খতীব আত্-তাবরীযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, পৃ. ৭০

৭২১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

চিশতী বলেন, "সত্যিকারের মসজিদ মনের মধ্যে তৈরি করার উদ্দেশ্যেই জাহেরী মসজিদের প্রতি এমন সব আদব ও সম্মান প্রকাশ করিবার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যেন প্রকৃত মসজিদ তৈরির জন্য উহা সহায়ক হইয়া উঠে। এজন্যই মসজিদের আদব শিক্ষার প্রতি সচেতন থাকিতে হইবে।"[৭২২]

মসজিদ স্থাপন, এর সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক, সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে অবস্থান ইসলামের অন্যতম নির্দশন। কেননা মসজিদে অবস্থানকারী বান্দা আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যেই থাকে।[৭২৩] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزله من الجنة كلها غدا او راح.

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরি করেন।"[৭২৪] মসজিদের মর্যাদা রক্ষার্থে মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়তে হয় اللهم افتح لى ابواب رحمتك অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দাও। আর বের হওয়ার সময় পড়তে হয় اللهم انى اسئلك من فضلك অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে অনুকম্পা প্রার্থনা করছি।[৭২৫]

যে বা যাঁরা মসজিদ নির্মাণ কাজে বা মসজিদকে আবাদ রাখার স্বার্থে সহযোগিতা করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইহজগতে সম্মানিত করবেন, এমনকি সে যদি অমুসলিমও হয় তবুও এ জগতে তাঁর প্রাপ্য সম্মান সে পাবে। সমগ্র কুর'আনে মসজিদ শব্দটি ২৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারাই মসজিদের মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্দি করা যায়। মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর, শান্তির নীড়, ইসলামী জিন্দিগির প্রাণকেন্দ্র।[৭২৬] 'The Message of Tablig and Da-wah' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "An army is likely to face defeat, if the arms and ammunities already exhausted, cannot be replenished and if armory is empty, the armory of the muslims in the ideological battle, is the Mosque. If the Muslims weaken or innore the mosques, their spiritual energy will be replenished and their defeat is in evitable."[৭২৭] মসজিদের এ মর্যাদার কথা চিন্তা করে কাজী নজরুল আবেদন করেছিলেন,

"মসজিদের-ই-পাশে আমার কবর দিও ভাই,
যেন গোর থেকেও মুয়াযিযনের আযান শুনতে পাই।"[৭২৮]

---

৭২২. সদর উদ্দীন আহমদ চিশতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৭২৩. শাহ ওয়ালিয়ুলণ্ঢাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৯২

৭২৪. ওয়ালিয়ুদ্দীন মুহাম্মদ আল্‌খতীব আত-তাবরীযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, পৃ. ৬৮

৭২৫. ওয়ালিয়ুদ্দীন মুহাম্মদ আল-খাতীব আত-তাবরিযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, পৃ. ৬৮

৭২৬. মাওলানা আমিনুল ইসলাম, *তাফসীরে নুর‍ুল কুরআন*, ১ম খ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি., ২য় সংস্করণ, পৃ.৪৬৪

৭২৭. A.Z.M. Shamsul Alam, *The Message of Tableg and Da`wah*, Dhaka:Islamic Foundation Bangladesh. 1993, P.1042

৭২৮. আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজর‍ুল রচনাবলী*, (সঙ্গীতাঞ্জলী থেকে চয়িত) ৪র্থ খ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ খ্রি., ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪৮০

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব

মুসলিম উম্মাহর জাতীয় ঐক্য, সংহতি এবং সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের লক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণ করা অতীব প্রয়োজন। যার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত আদম (আ.) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময়ে ইহা পরিপূর্ণতা লাভ করে ব্যাপক হারে মসজিদ প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করে। এই ধরাবাহিকতার প্রেক্ষিতে গোটা বিশ্বে যেখানেই মুসলমানদের বসবাস সেখানেই মসজিদ নির্মিত হয়।[৭২৯] মসজিদকে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় মিলন ক্ষেত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে এবং মুসলিম ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মসজিদের অবদান নিঃসন্দেহে অপরিসীম।[৭৩০]

মক্কায় অবস্থানকালে মুসলমানগণ ছিলেন সংখ্যায় অল্প, পার্থিব শক্তি ছিল কম। তাঁরা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছেন, কোন প্রতিকার করতে পারেননি। মুসলমানদের অপরাধ ছিল আল্লাহর প্রতি 'ঈমান রাখা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- কে নবী বলে বিশ্বাস করা।[৭৩১] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ২৩ বছর নবুয়তের জীবনে (৬১০-৬৩২খ্রি.) ১৩ বছর মক্কায় (৬১০-৬২২খ্রি.) এবং ১০ বছর (৬২২-৬৩২খ্রি.) মদীনায় অবস্থান করেন। মাক্কী জীবনে তিনি মসজিদুল হারামের কর্তৃত্ব লাভ করতে পারেননি। সেখানে ছিল মুশরিকদের দখল। যে কা'বা গৃহ আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদতের জন্য তৈরি হয়েছিল, সেখানে কাফিররা ৩৬০টি দেবমূর্তি স্থাপন করে তাদের পূজা করত, তখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হননি।[৭৩২] মুসলমানগণ এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসী। তাঁরা একই মূলনীতির উপর অধিষ্ঠিত। আর মসজিদ হ'ল তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার মূলকেন্দ্র। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইসলামের দা'ওয়াত ও প্রসারের লক্ষ্যে, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করেছিলেন।[৭৩৩] মসজিদ মুসলিম মিল্লাতের সালাত, কিরা'আত, যিকর, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাষণ, রাজনীতি, 'আকীদা, জাগতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের স্থান। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করেছিলেন।[৭৩৪]

মসজিদ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ইউনিট। মসজিদ থেকেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দিক নির্দেশনা দিতে হবে। তাই মসজিদকে বহুমুখী ভূমিকা পালন করতে হয়। মসজিদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড থেকে শুন্য রাখলে তা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। ফলে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র-এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে।[৭৩৫] ইসলামী সমাজে মসজিদের এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত (৬২২খ্রি.) করার পর কুবা পল্লিতে তাকওয়ার ভিত্তিতে একটি মসজিদ নির্মাণ

---

৭২৯. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক, *মসজিদের ঐতিহাসকি গুর"ত্ব*, ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ২০২

৭৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৭৩১. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়াফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৭৩২. প্রাগুক্ত।

৭৩৩. শায়খ তোয়াহাল ওয়ালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৭৩৪. আবূ মু'আয খালিদ বিন 'আবদুল-'আল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭৩৫. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪, ২য় প্রকাশ, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

করেন (৬২২খ্রি.) এবং তাতে সালাত আদায় করেন। এটাই ছিল নবুয়তের পর সর্বপ্রথম মসজিদ।[৭৩৬] Muir যর্থাথই বলেছেন, "Here too he laid the foundation of the first house, of prayer for his people of Medina, which is how hered in the Quran by the title of the Mosque of Godlly fear."[৭৩৭]

সর্বোত্তম উপায়ে মসজিদে 'ইবাদত-বন্দেগি করার সুযোগ রয়েছে। মসজিদে দীনি ও নৈতিক পরিবেশের আধ্যাত্মিক স্পর্শে গভীর মনোযোগের সাথে আল্লাহর 'ইবাদত করা যায় যা অন্য কোন জায়গায় সম্ভব নয়। তাছাড়া ইসলামী জীবন বিধানের আওতায় ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা অত্যন্ত জরুরি। মসজিদ হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ কেন্দ্র। সমাজ থেকে যে সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত হবে তা অন্য সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সমাজ সংস্কার মসজিদের অন্যতম লক্ষ্য। মানব সমাজে মানুষের সৃষ্ট মতবাদ ও আমলের মাধ্যমে যে কুসংস্কার ও কু-প্রথা চালু হয় তা সমাজের গতিশীলতার জন্য বিরাট বাধা। সেই কুসংস্কারকে মোকাবিলা করতে না পারলে সমাজকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। মসজিদের শিক্ষার মাধ্যমে ঐ সকল কুসংস্কার দূর করে সমাজে প্রগতির ধারা সৃষ্টি করা হয়।[৭৩৮] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপলব্দি করেই আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে মসজিদ ভিত্তিক মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুবার মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর সেখানে ১৪ দিন অবস্থানের পর শুক্রবার সকালে সেখান থেকে মদীনার উদ্দ্যেশ্য যাত্রা করেন। বনূ সালিমের এলাকায় পৌঁছলে জুমু'আর ওয়াক্ত হয়ে যায়। হযরতের সঙ্গী সংখ্যা ছিল ১০০জন। সেখানে সবাই একত্রে জুমু'আর সালাত আদায় করেন। জুমু'আর সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় পৌঁছে সেখানে মসজিদুন নববী প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৩৯] 'An account of the rise and progress of Mohomatanism' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, "He also frequently preached to the people in the temple or Mosque."[৭৪০]

ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় মূল্যের ভিত্তিতে তিনটি স্থানের গুরুত্ব বিশেষভাবে নিহিত রয়েছে। একটি মক্কার মসজিদুল হারাম যার দিকে মুখ করে মুসলমানগণ আল্লাহর 'ইবাদত করে। সারা বিশ্বের মুসলমানগণ হজ্জের সময় ঐ স্থানে মিলিত হয়। একইভাবে মদীনার মসজিদ, যেখানে মুহাম্মদ (সা.) নতুন ইসলামী

---

৭৩৬. 'আলণ্ঢামা সফীউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম*, মিসর: দার"ল ওয়াফা, ২০০৫ খ্রি., ১৭ তম সংস্করণ, পৃ. ১৬১; মদীনা থেকে কুবা পলিণ্ঢর দূরত্ব ছিল ৩ মাইল। সেখানেই রাসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) ইসলামের প্রথম মসজিদের গোড়াপত্তন করেছিলেন। (Maulana Muhammad. Ali, *Mohammad the Prophet*, Lahore; Ahmadiyyah Anjuman'of Islam, 1972, Fourth ed, P. 101; Abdul Quyyum Natiq, *Sirat-E-Mostaqeem*, Al-Amin Publication's, Delhi: Rahman Building, 1992, P.207).

৭৩৭. Sir William Muir, *Mahomet and Islam*, the Religious tract Society, Schurchyard: 56 Paternoster Row, 63st. Paul. 1887, P.77

৭৩৮. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৭৩৯. ইব্ন কায়্যিম জাওযিয়াহ, প্রাগুক্ত, ১ম খ", পৃ. ৪৪

৭৪০. Dr. Henry Stube, *An account of the rise and progress of Mahomatanism*, London: Luzaceo, ub, Great Russell, street, 1911, p. 89

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। আর এ কারণেই এটি ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আরেকটি হল বায়তুল মুকাদ্দাস- যা পূর্ববর্তী নবীগণের আবাসস্থল এবং মুসলিম জাতির প্রথম কিবলা।[৭৪১]

মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ নির্মাণ অতীব জরুরি।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدًا لله ـ بنى الله له بيتا في الجنة.

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদ নির্মাণকে জান্নাতে বাসস্থান নির্মাণের সঙ্গে তুলনা করে মসজিদ নির্মাণে উৎসাহিত করেছেন।[৭৪২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وان ينظف و يطيب মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করে তাকে পুত-পবিত্র রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৪৩] এ থেকে অনুমিত হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর উম্মতকে প্রয়োজন মত ব্যাপকহারে মসজিদ নির্মাণে উৎসাহিত করেছেন।

সমাজ কল্যাণ মসজিদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ও লক্ষ্য। সমস্যাগ্রস্থ লোকদের সমস্যার সমাধান করে তাদেরকে সমাজে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করা জরুরি। মসজিদে রয়েছে এর অপূর্ব সুযোগ। সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকও মুসল্লীদের সমস্যার সম্মুখীন করার মাধ্যমে গোটা সমাজ সমস্যামুক্ত করা যায়।[৭৪৪] বিশেষ করে সালাত আদায়ের নির্দিষ্ট স্থান হ'ল মসজিদ এবং বায়তুল্লাহ নামে অভিহিত হওয়ার দূর্লভ সম্মান কেবল মসজিদেরই প্রাপ্য। কারণ আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদত- বন্দেগির জন্য মসজিদ নির্মিত। তাওহীদ ও একত্ববাদের চিরন্তন প্রতীক হল মসজিদ।[৭৪৫] তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসলিম জাতিকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। সাহাবীগণ (রা.)ও যেখানেই ইসলাম প্রচারের জন্য গমন করেছেন সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করেছন। ইসলামের প্রাথমিক মুসলিম বিজেতাগণও যেখানে দেশ জয় করেছেন সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এভাবে সারা বিশ্বেই অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনটি মসজিদের সম্মানার্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساجد ـ الكعبة ـ ومسجدى هذا ومسجد الاقصى. তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা বৈধ নয়। মসজিদুল হারাম, বায়তুল মুকাদ্দাস ও মসজিদুন নববী।[৭৪৬] যাঁরা আল্লাহ তা'আলার

---

৭৪১. Abdul Kader Tayob, op.cit., P.61-62

৭৪২. মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩; ওয়ালিয়ুদ্দীন আল্-খতীব আত্-তাবরিযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮; আবু 'ঈসা মুহাম্মদ বিন 'ঈসা, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৭৩; 'আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শু'আয়ব, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৮০

৭৪৩. ওয়ালিয়ুদ্দীন আল-খতীব আত্-তাবরিযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, পৃ. ৬৯; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, অনু; মাওলানা আহমদুলণ্ঢাহ রহমানী এবং মুহাম্মদ আবদুর রহমান, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৯৬; সুলায়মান বিন আশ'আস, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৬৬

৭৪৪. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১০

৭৪৫. মাওলানা আব্দুল খালেক, *নামায*, ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ২৩০

৭৪৬. আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ বিন 'ঈসা, প্রাগুক্ত, আবওয়াবুস সালাত, ১ম খ, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁরাই মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব উপলব্দি করতে সক্ষম হয়।[৭৪৭] আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে বান্দা তাঁর প্রভূর সাথে মিলিত হওয়ার উত্তম স্থান হচ্ছে মসজিদ। এ ঘরের কোন বিনাশ নেই, নেই কোন বিলুপ্তি। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে এটি হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করবে।[৭৪৮] কবি কাজী নজরুল ইসলাম (জ. ১৮৯৯-মৃ১৯৭৬খ্রি.) গেয়েছেন,

"কুর'আনেরই মধুর ধ্বনি বাজে বাজে
মসজিদেরই মিনারে।
একি মধুর খুশীর তরঙ্গ উঠল কেঁপে
প্রাণের কিনারে।"[৭৪৯]

পৃথিবীর বুকে শান্তিকামী ও শান্তিস্থাপনকারী আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান মসজিদ। আল্লাহ্-ভীতি আদর্শ চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এটাই। ইসলাম মানুষকে সুনিশ্চিত মুক্তির জন্য যে কালেমা ও শাশ্বত বিধান পেশ করেছেন মসজিদের সালাতকে কেন্দ্র করে তার বাস্তবায়ন শুরু হয়। তাই ইসলামে মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব সর্বাধিক। এজন্য হযরত আদম (আ.) পৃথিবীর বুকে আগমন করে সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।[৭৫০]

কোন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করতে হলে এর জমি, মসজিদ গৃহ, যাতায়াতের পথসহ মানবীয় অধিকার হতে সর্বোতভাবে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।[৭৫১] কারণ মসজিদসমূহে অবিমিশ্রভাবে শুধু আল্লাহর অধিকার সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক।[৭৫২] কোন মসজিদের কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ হলে এবং এর পেছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তি এবং পূর্বতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস প্রভৃতি অসৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তবে এতে মসজিদ নির্মাতা গুনাহগার হবে।[৭৫৩] এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদে যিরারকে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু এটি মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে নির্মিত। মসজিদে কুবার গুরুত্বকে হ্রাস করার জন্য।[৭৫৪] যেহেতু মসজিদ মুসলিম জাতির মিলন কেন্দ্র এবং আল্লাহর পবিত্র ঘর তাই মসজিদ নির্মাণে সততা অবলম্বন করা উচিত। শামসুল হক ফরিদপুরী (জ.১৮৯৫-মৃ.১৯৬৯ খ্রি.) বলেন, "আল্লাহর ঘর মসজিদ উত্থান-পতনের কেন্দ্র। যে কওমের মসজিদ আবাদ ও জীবন্ত সে কওম তত উন্নত। যে কওমের মসজিদ অনাবাদ, মোর্দা, সে কওমও জীবনহীন মোর্দা।"[৭৫৫] মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন, "বস্তুত পক্ষে মসজিদ

---

৭৪৭. আল-কুর'আন, ০৯:১৮

৭৪৮. আবূ হেনা, এম. এম. কামাল, প্রসঙ্গ, মসজিদ, *সাপ্তাহিক আরাফাত*, ৪৩ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ঢাকা: নওয়াবপুর রোড, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৯

৭৪৯. আবদুল কাদির, সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী*, যুলফিকার কাব্য গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ১১৩

৭৫০. আবূ হেনা এম. এম. কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৭৫১. আলণ্ঢামা আবদুলণ্ঢাহেল কাফী আল্-কুরাইশী, *ফাতাওয়া ও মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৭৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৭৫৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২-৯৩

৭৫৪. ইসমা'ঈল বিন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৫ম খণ্ড, মসির: মাকতাবাতুস সাফা, ২০০৩ খ্রি., পৃ.১৮-১৯

৭৫৫. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

একটি প্রাণময় নগর বা জনপদের মেরুদণ্ড। একটি বিবর্তনশীল সমাজের জন্ম ও বিকাশের স্নায়ুকেন্দ্র এবং একটি ক্রমবর্ধনশীল সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান।"[৭৫৬]

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ـ ائذنوا النساء بالليل الى المساجد.

মুসলিম মহিলাগণও ইচ্ছা করলে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতে পারবে।[৭৫৭]

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মসজিদ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আর এটি সালাতের জন্য বিশেষ স্থান। এ গুরুত্বের জন্যই একে মসজিদ বলা হয়েছে। এখানে সকলেই একই ইমামের পেছনে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে সালাত সম্পাদন করতে পারে। সকলেই একজন ইমামকে অনুসরণ করে। গরীব-ধনী, প্রভূ-ভূত্য সকলেই মহারাজা-ধীরাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়।[৭৫৮] মসজিদের প্রধান উদ্দেশ্য যদিও সালাত আদায় তথাপি ধর্মীয় সকল কাজের কেন্দ্রস্থল এ মসজিদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অনেক উদ্দেশ্যেই মসজিদকে ব্যবহার করতেন। তাই মসজিদ মুসলিম উম্মাহর কল্যাণমূলক কাজসহ সকল বিষয়ের ঘাঁটি। এজন্য মসজিদের গুরুত্ব অত্যধিক।[৭৫৯]

প্রশাসনিক ভবনরূপে মসজিদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্পর্ক মসজিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এর কারণ শুধু ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিকও বটে। 'ইবাদতের স্থান ছাড়াও মসজিদ গণ-প্রশাসন কেন্দ্র, বিচারালয়, কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও ব্যবহৃত হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং মসজিদে মামলা-মুকাদ্দমা মীমাংসা করতেন। প্রাথমিক যুগের মসজিদই ছিল শাসক ও জনগণের সাধারণ সভার স্থান। যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনাও মসজিদেই হত। শাসনকর্তাগণ প্রশাসন, যুদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে মসজিদেই বক্তব্য রাখতেন। বক্তাগণ এর পক্ষে শ্লোগান দিতে পারত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর (৬৩২ খ্রি.) পর এবং খিলাফতে রাশেদার (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) পর শাসকগণ শাসনকার্যকে নিজ নিজ স্বার্থের কারণে স্ব-স্ব প্রাসাদ চত্বরে নিয়ে আসে। মসজিদসমূহ তখন শুধু 'ইবাদতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে।[৭৬০]

মহল্লার মসজিদে প্রতিদিন জামা'আতের সালাত আদায় করার পর শুক্রবার সকল মহল্লার মুসলমানগণ জুমু'আর সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে শহরের জুমু'আ মসজিদে উপস্থিত হয়। নগরীর সকল প্রান্ত থেকে মুসলমানগণ উত্তম পোশাকে সজ্জিত হয়ে, নব-উদ্যমে, নতুন সাজে জুমু'আ মসজিদে উপস্থিত হয়। তাঁরা আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ এবং কর্তব্যের চেতনায় মসজিদে জমায়েত হয়। তাঁরা আল্লাহর গুণ-কীর্তনে ব্যস্ত থাকে। ভুলে যায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। ভালবাসা, বিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্ববোধের উদয় হয় সকলের

---

৭৫৬. মোহাম্মদ শামসুল হক, ইসলামী স্থাপত্য; তত্ব ও দর্শন, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, দ্বা-ত্রিংশ সংখ্যা, ঢাকা: অক্টোবর, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ১৬৫

৭৫৭. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জুমু'আ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩

৭৫৮. Mufti Zafeer uddin, *Mosque in Islam,* New Delhi: Qazi Publishers and distribnfors, 1996, P. 11

৭৫৯. Ibid., P. 87

৭৬০. হারুনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

মনে।[৭৬১] সকলেই মসজিদে ইসলামী আইন, ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেই মসজিদুন নববীতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে হযরত আবূ বকর (রা.) (মৃ. ৬৩৪ খি.) ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর (৬৩২ খ্রি.) পর খলীফাগণ ইমামতির দায়িত্ব পালন করেছেন।[৭৬২] প্রথম চার খলীফা (সময়কাল ৬৩২-৬৬১ খ্রি.) তাঁরা খুবই শক্তিশালী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আর তাঁদের সৈন্যবাহিনী এবং কর্মচারীবৃন্দ পৃথিবীর সকল অংশেই খলীফাগণের আনুগত্য করতেন– তাঁরা কোন অত্যাচারী ছিলেন না। খলীফাগণ মদীনাতে সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। খলীফাগণ মসজিদুন নববীতে জুমু'আর দিনে খুৎবাতে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ পেশ করতেন এবং রাষ্ট্রের সকল বিষয়ের ব্যাপারে মসজিদেই আলোচনা করতেন। যেকোন অভিযোগ ও ধর্মীয় কাজের হিসাব-নিকাশ মসজিদেই দিতেন।[৭৬৩]

জুম'আ মসজিদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় (মাদানী জীবন ৬২২-৬৩২খ্রি.) মদীনার দুই-তিন মাইল উপকণ্ঠ হতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদুন নববীতে এসে আদায় করতেন এবং জুমু'আর সালাতও মদীনার জামি' মসজিদেই আদায় করতেন। খুলাফা রাশিদীনের সময়ও এ নীতিই অনুসৃত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মুসলমানগণ বিজয়ী বেশে যে দেশ, শহরে বা নগরে প্রবেশ করতেন সেখানেই তাঁদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্থাপিত মদীনার মসজিদের অনুকরণে তাঁরা জামি' মসজিদ নির্মাণ করতেন। নির্মাণ কৌশল বা স্থাপত্যরীতির সাথে এগুলোর কিছুটা পার্থক্য থাকলেও মৌলিক আর্দশে কোন গরমিল ছিল না।[৭৬৪] প্রাথমিক যুগে মদীনার মসজিদ ছাড়াও কুফা (১ম নির্মাণ কাল ৬৩৭ খ্রি.), বসরা (৬৩৫ খ্রি.), ফুসতাত (৬৪১-৪২ খ্রি.), কায়রোয়ান (৬৭৪-৭৫ খ্রি.), দামিস্ক (৬৩৬ খ্রি.) প্রভৃতি মসজিদসমূহকে জামি' মসজিদের অন্তর্ভূক্ত করা যায়।[৭৬৫]

মসজিদ হচ্ছে মুসলমানদের দৈনিক সম্মেলন কেন্দ্র। দিন ও রাতে পাঁচবার সালাত আদায়ের জন্য তাঁরা মসজিদে মিলিত হন। অপরদিকে জুমু'আ বার হচ্ছে মুসলমানদের সাপ্তাহিক সম্মেলনের দিন। কেননা দৈনিক সম্মেলনের চেয়ে সাপ্তাহিক সম্মেলনের পরিসর অধিক বড় ও প্রশস্ত। সেদিন অপেক্ষাকৃত বেশি লোক এক স্থানে জমায়েত হয়।[৭৬৬] কারণ অনেক ছোট মসজিদেই জুমু'আর সালাত হয় না। তাই সবাই বড় মসজিদগুলোতে আসার কারণে সে সমাবেশটা অনেক বড় হয়। ইমাম সাহেব সকলের উদ্দেশ্যে সময় ও প্রয়োজনের দাবি অনুযায়ী খুৎবা বা বক্তৃতা করেন। এতে করে সবাই নেতা বা ইমামের নিকট থেকে সাপ্তাহিক উপদেশ শ্রবণের সুযোগ পান। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের বার্ষিক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন

---

৭৬১. Mufti Zaffer Uddin, Ibid., P. 12

৭৬২. Sir, Thomas w. Arnold, op.cit., P.35

৭৬৩. M.M. Picthal, *Cultural Side of Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1990, 3rd Ed., P.167

৭৬৪. ড. ইয়াকুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৭৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৭৬৬. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত হয় মক্কার মসজিদুল হারামকে কেন্দ্র করে। হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকন। সেই হজ্জ পালন করার উদ্দোশ্য মুসলমানগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসে আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফে।[৭৬৭] এভাবে মসজিদ পাড়া ও মহল্লা থেকে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে এবং শুধু জাতিগত ঐক্য নয়, বরং আন্তর্জাতিক মুসলিম ঐক্য ও সংহতির পয়গাম বিতরণ করে। এর ফলে মসজিদ বিশ্বের সকল মুসলমানকে একই পরিবার ভূক্ত করতে সক্ষম হয়।[৭৬৮] Mufti Zafeer uddin বলেন, æIn this weekly gatherihg there are men from all walks of life. Leading men in different fields, the scholars, the pious men, the trademen, the rich and the poor, all they would have their own views of their surroundings and their own ideas about the theirs that they could do or that are needed for the welfare development of society. Some would think of educating the People about their spiritual and material welfare."[৭৬৯] ড. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, "প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মসজিদে ইমাম সাহেব খুতবায় মুসলিম মিল্লাতের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিক নির্দেশনা দেন এবং পরে নামাযের ইমামতি করেন। এভাবে একত্রে এক ইমামের পিছনে নামায আদায় করে মুসলিম জনগণ তাঁদের ঐক্যের সাক্ষ্য প্রদান করে।"[৭৭০] ইব্ন কায়্যিম (মৃ. ১৩৫০ খ্রি.)-এর মতে, "ইসলামের ফরযসমূহের মধ্যে জুমু'আর সালাত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সমাবেশগুলোর মধ্যে এক মহাসমাবেশ। 'আরাফার সমাবেশ ব্যতীত এটিই সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করে। নিছক অবহেলা করে যে ব্যক্তি এ জুমু'আর সালাত বর্জন করে আল্লাহ তার অন্তরের দ্বার রুদ্ধ করে দেন।"[৭৭১]

শুক্রবারের জুমু'আর সালাত আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ইমামের প্রতি আনুগত্য ছাড়াও উম্মাহ্‌র ঐক্য ও শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে।[৭৭২] জুমু'আ শব্দের অর্থ সমবেত হওয়া। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়, "শুক্রবারে মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য সমাবেশ।" এ অর্থে এ ধরনের মসজিদকে জুমু'আ মসজিদ বলে। সপ্তাহের যে দিনটিতে সমাবেশ ঘটে সে দিনটিকে ইয়াওমুল জুমু'আ বা জুমু'আর দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাতে শুক্রবার। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সংক্রান্ত পটভূমিতে এ দিনটি পূর্ব থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ দিনে সকল সৃষ্টি কাজ সম্পন্ন হয়েছে।[৭৭৩] এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজকে মসজিদে গিয়ে জুমু'আর সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "হে মুমিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য 'আযান দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের জন্য ত্বরা কর এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর।"[৭৭৪]

---

৭৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৭৬৮. প্রাগুক্ত।

৭৬৯. Mofti Zafeor uddin Miftahi, op.cit., P. 43

৭৭০. ড. মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৭৭১. ইব্ন কায়্যিম আল-জওযিয়াহ, প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ১৬৫

৭৭২. মফিজুলণ্ঢাহ্ কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

৭৭৩. প্রফেসর মুহাম্মদ মনসূর-উর-রহমান, *সালাতে রাসূল (সা.)*, রংপুর: আযাদ প্রেস, স্টেশন রোড, ২০০৫ খ্রি., পৃ.৪২

৭৭৪. আল-কুর'আন, ৬২:০৯

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাবশ্যকীয় সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য পেয়ে থাকে। আর এ জুমু'আর সময়ে দু'আসমূহ কবূল হয়ে থাকে। কারণ মুসলমানগণের আনুগত্যসমূহ নৈকট্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। অন্তরের সুপ্ত বাসনাসমূহ আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়। অসংখ্য উপকার লাভ করা যায়। আর আল্লাহ্ তা'আলা এ সময়সমূহ পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহেই তাঁর বান্দাগণের নিকট আনয়ন করেন। এ সময় বান্দার জন্য জান্নাতের পথ সুগম হয়। এ নৈকট্য লাভের কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত সময়টি হল জুমু'আর দিন। যে দিনে অনেক কার্যাবলী সংঘটিত হয়েছে।[৭৭৫] সঠিক সময়ে আল্লাহ্র 'ইবাদতে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া এবং আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করা আনন্দ-বিনোদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অতি উত্তম।[৭৭৬] আর এ সঠিক সময়টি হল জুমু'আর সালাতের সময়। আর জামা'আতের কারণে এ সালাতের নাম হয়েছে 'সালাতুল জামা'আত'। এ সালাত জামা'আত ছাড়া বৈধ হবে না। এটি একটি সাপ্তাহিক সালাত-যা মুসলিম জাতিকে মসজিদে সমবেত করে। মুসল্লীরা সকলেই মনোযোগ সহকারে ইমামের খুৎবা শ্রবণ করে। দুনিয়া ও আখিরাতের প্রস্তুতি ও মুক্তির জন্য জুমু'আর সালাত একটি প্রস্তুতিমূলক ও শিক্ষামূলক 'ইবাদত।[৭৭৭]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء.

যে ব্যক্তি 'আযান শ্রবণ করে তার উপর জুমু'আর সালাত আদায় করা ফরয।[৭৭৮] জুমু'আর দিনে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকেরই গোসল করে মসজিদে গমন করা ওয়াজিব।[৭৭৯] হাদীস হলো:

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد إلى الله مساجدها وابغض البلاد إلى الله أسوقها.

কারণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান হ'ল মসজিদ।[৭৮০] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মসজিদুন নববীতে জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হয় বাহরায়নের জুয়াস নামক স্থানে অবস্থিত 'আবদুল কায়েস গোত্রের মসজিদে।[৭৮১]

ইসলাম প্রচারে মসজিদ

বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সোনালি যুগের সূচনা করে সমগ্র বিশ্বকে আলোক উদ্ভাসিত করে তুলেছেন, মসজিদই ছিল তার উৎসস্থান। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য-দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ভূতত্ব-নৃতত্ব

---

৭৭৫. শাহ্ ওয়ালিয়ুলণ্ঢাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮

৭৭৬. সায়্যিদ কুতুব, *ফি যিলালিল কুর'আন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বৈরূত: দারুশ শুরাফ, ২০০৪ খ্রি., ৩৪ তম সংস্করণ, পৃ. ৩৫৬৩

৭৭৭. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬৪

৭৭৮. সুলায়মান বিন আশ'আস, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুস সালাত, পৃ. ১৫১; ওয়ালিয়ুদ্দীন আল-খতীব আত-তাবরিযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, পৃ. ১২১

৭৭৯. 'আলণ্ঢামা ইব্ন কাসীর, *তাফসীর ইব্ন কাসীর*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

৭৮০. মুসলিম বিন হাজ্জাজ আলকুশায়রী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুস্ সালাত, পৃ. ২৩৬; ওয়ালিয়ুদ্দীন আল-খাতীব, আত্-তাবরীযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত, পৃ. ৬৮

৭৮১. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জুমু'আ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি শাস্ত্রে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এককালে যে সকল মুসলিম মনীষী, বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, পণ্ডিত, সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং বর্তমান পৃথিবীকে জ্ঞান-সাধনার ঋণজালে আবদ্ধ রেখেছেন, তাঁদের বুনিয়াদি জ্ঞানার্জন, প্রেরণা লাভ ও চরিত্র শিক্ষার ভিত্তি ছিল এ পবিত্র মসজিদ।[৭৮২] মসজিদের আছে গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য-এর রয়েছে বিপ্লবী ভূমিকা।[৭৮৩] ইসলামের কেন্দ্রস্থল এ মসজিদ শুধু আনুষ্ঠানিক মসজিদই ছিল না বরং মসজিদ ছিল একটি অপরাজেয় শক্তিশালী দূর্গ। এখানে দীন ও দুনিয়ার সকল আইন-কানূন এবং নির্দেশ তৈরি হত। এখান হতে সেনাবাহিনীকে জিহাদের কুচকাওয়াজ শিক্ষা দেয়া হত। এখান হতে সেনাবাহিনীকে জিহাদের জন্য প্রেরণ করা হত। বিদেশাগত প্রতিনিধিগণ মসজিদেই অবস্থান করতেন। মসজিদেই ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম শিক্ষালয়–আদর্শ দারুল 'উলূম। এখানে বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবার বসত। এখানেই অপরাধীদের জেল দেয়া হত। মোটকথা, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ স্থল, মুজাহিদগণের সেনানিবাস, বন্দিদের কারাগার, জ্ঞান-পিপাসুদের শিক্ষায়তন, প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা গৃহ। সব কিছুরই প্রধান কেন্দ্র ছিল আল্লাহর ঘর এ পবিত্র মসজিদ।[৭৮৪] মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন, "বস্তুতপক্ষে ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি পরাক্রমশালী মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত। এজন্য মসজিদের মত আর কোন ইমারত-ই ইসলামী স্থাপত্যের ইতিহাসে তত অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মসজিদ হল একটি ইসলাম।"[৭৮৫] মাওলানা আকরম খাঁ (জ ১৮৬৯-মৃ. ১৯৬৮খ্রি.) বলেন, "হিজরী প্রথম সন হইতে খলীফাগণের সুবর্ণ যুগের শেষ মুর্হূত পর্যন্ত এই মসজিদই ইসলামে সর্বপ্রধান, বরং একমাত্র কর্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য মুসলমানদিগের যে সম্মেলন হইত, তাহা ব্যতীত সকল প্রকার শাসন, বিচার, শালিস-পঞ্চায়েত, সমর ও সন্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ বিদেশে দূত প্রেরণ বা বৈদেশিক রাজদূতগণের সাথে দেখা সাক্ষাত, ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা, উপদেশ ও পরামর্শ এক কথায়, ব্যক্তিগত, ধর্মগত, দেশগত সকল প্রকার আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা পরামর্শ, এই আড়ম্বরহীন মসজিদ প্রাঙ্গন হইতে সম্পাদিত হইত।"[৭৮৬]

সত্যযুগে মসজিদগুলো ছিল জীবন্ত প্রাণবন্ত। তখন মসজিদ যেমন ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান কেন্দ্র তেমনি ছিল শিক্ষা কেন্দ্র, প্রচার কেন্দ্র। কেননা শিক্ষা ও প্রচার ছাড়া ইসলাম ধর্ম টিকে থাকতে পারে না। তদ্রূপ ইসলামের যারা শত্রু তাদের মোকাবেলায় টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন জিহাদের, ইসলামী জাগরণের। সুতরাং জিহাদ শিক্ষা ও ইসলামী জাগরণ মসজিদেই হয়েছে। জিহাদের জন্য, শিক্ষার জন্য ও প্রচারের জন্য যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাড়ি-ঘর যথা-সবর্স্ব ত্যাগ করেছেন, তাঁদের থাকা-খাওয়া মসজিদেই

---

৭৮২. অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, *মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৯-১০

৭৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৭৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৭৮৫. মোহাম্মদ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

৭৮৬. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মুস্তফা চরিত*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩৮৫-৮৬

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। তাঁদের মন-মস্তিস্কের উন্নতির খোরাক সাহিত্য-সাধনা, ইতিহাস আলোচনা মসজিদেই হয়েছে।[৭৮৭] মসজিদে দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচবার উপস্থিত হয়ে সকলে এক জামা'আতে পূর্ণ একতা ও পূর্ণ সহযোগিতার প্রদর্শনী সহকারে আল্লাহ্কে সিজদা করা প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক। আর এটাই হল জীবন্তযুগে জীবন্ত মুসলিম জাতির জীবন্ত মসজিদের নমুনা। যদি প্রত্যেকেই এ অনুসারে কাজ করতে সক্ষম হয়, তবে আবার মুসলিম মিল্লাত জীবন্ত হতে পারবে।[৭৮৮]

যাঁরা আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁরা বিজয়ী না হলে মসজিদ শুন্য হয়ে যাবে। পৃথিবীতে মানব বাসকে শান্তিময় করতে হলে, মসজিদ অপরিহার্য। পৃথিবীতে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর স্বরণ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে নিজেদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ হাসিল করতে চায়। তারা বিজয়ী হলে মসজিদ বিরান ও ধ্বংস হয়ে যাবে।[৭৮৯] আল্লাহর বলেন, "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্বরণ হতে বিমুখ হয়, তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। আর মসজিদসমূহ তো আল্লাহর জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে আহ্বান করো না। আর যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দাড়ান, তখন তাঁরা তাঁর পাশে ভিড় জমান।"[৭৯০]

মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান-ই এ মসজিদ। ইসলাম পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা। এতে রয়েছে দেহ, মন, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, জগত, পরকাল ইত্যাদি সকল দিকের নির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহর ঘরে বসে যেসব কাজ করেছেন, তাঁর উম্মতও সেখানে সেসব কাজ করবে। মসজিদে আসার জন্য যে 'আযান দেয়া হয় তাতে সালাতের সাথে ফালাহ বা কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ কল্যাণ দুনিয়া ও আখিরাতের, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের। আল্লাহর নির্দেশিত পথে এ কল্যাণ অর্জন করতে হবে। আর সে জন্যই মসজিদকে সম্মেলন কেন্দ্র বানানো হয়েছে।[৭৯১] বড়ই পরিতাপের বিষয় কালক্রমে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারা, পাপাচারের আপাত মধুর জলুস, স্বার্থ-শিকারের ঘৃণ্য-বিলাস ও আরাম-আয়েশের সীমাহীন উম্মাদনার ব্যাপক প্রভাব এবং অপরদিকে মসজিদের সঠিক কার্যক্রম হতে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব ও উদাসীনতা মুসলিম জাতিকে পঙ্গু, নিথর ও নিস্তব্ধ করে দিয়েছে।[৭৯২] বস্তুত সমাজ উন্নয়নে মসজিদ ব্যাপক ভূমিকা সাধন করতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়, হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ইত্যাদি সমাজ জীবনের স্থায়ী বিষ ফোঁড়ায় পরিণত হয়েছে। এ থেকে উত্তরণের একটাই পথ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ন্যায় মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন সৃষ্টি করা।[৭৯৩] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার সূচনা করে

---

৭৮৭. মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭৮৮. প্রাগুক্ত

৭৮৯. ড. মুস্ড়ফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৭৯০. আল-কুর'আন, ৭২:১৭-১৯

৭৯১. ড. মুহাম্মদ মুস্ড়ফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-২৯

৭৯২. অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৭৯৩. মুহাম্মদ র"হুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন ও অনাগত সমস্ত যুগের সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ম্লান করে দিয়েছেন এবং যে শিক্ষার ধারক বহু মুফাস্সির, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি সৃষ্টি করে বিশ্ববাসীকে চিরতরে ঋণী করে রেখেছেন–আল্লাহ্র ঘর মসজিদই হচ্ছে তার সর্বপ্রথম প্রেরণাস্থল।[৭৯৪]

মসজিদ হতে কুর'আন, সুন্নাহ ও ইসলাম সম্মত জ্ঞানের যে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হত–তা সমগ্র মুসলিম সমাজকে পথ প্রদর্শন করেছে। তাঁদেরকে বিশ্বের আদর্শ জাতিরূপে গড়ে তুলেছে এবং তাঁদের ইহলোকিক ও পারলৌকিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে। ইসলাম মানুষের সুনিশ্চিত মুক্তির যে মহান কালিমা ও শাশ্বত বিধান পেশ করে, মসজিদের সালাতকে কেন্দ্র করে তার বাস্তবায়ন শুরু হয়। একারণেই মসজিদের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক এবং এর অস্তিত্ব ইসলামের-ই সমসাময়িক।[৭৯৫]

সংস্কৃতি বিকাশে মসজিদ

ইসলামের মূলভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। এরূপে ইসলামের যত শিক্ষা সকল শিক্ষার মূলকেন্দ্র আল্লাহর একত্ববাদের দিকে। মসজিদ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিশ্বের সকল মুসলমানকে এক কেন্দ্রিক করা হয়েছে। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মসজিদ বিদ্যমান। সমস্ত মসজিদসমূহকে একই ধরনের, একই বাক্য উচ্চারণের দ্বারা দৈনিক পাঁচবার আহ্বান করা হচ্ছে। মানব জীবনের চরম মুক্তি ও উন্নতি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। একই ইমামের অধীন হয়ে শৃঙ্খলা সহকারে আল্লাহর 'ইবাদত করার এবং পরস্পর একে অন্যের খোঁজ-খবর রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৭৯৬] মসজিদই হচ্ছে এর অন্যতম কেন্দ্র।

মসজিদ যেমনি সালাত আদায়ের জন্য তেমনি ধর্ম শিক্ষার জন্যও। অতএব মসজিদে এমন লোক থাকা চাই যাঁরা ধর্ম শিক্ষা দিতে পারে। তা'লীম ও তাবলীগ উভয়ই শিক্ষা ও উভয়ই ধর্মপ্রচার।[৭৯৭] উভয়টির কেন্দ্রই মসজিদ। তাই প্রত্যেক মহল্লাতে প্রত্যেক পল্লিতে মসজিদ স্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক মসজিদে কুর'আন ও হাদীসের এমন বিজ্ঞ 'আলিম রাখতে হবে– যিনি নর-নারী সমস্ত লোককে তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে পারেন। যাতে পৃথিবীর কোন লোক মূর্খ না থাকে।[৭৯৮] কারণ বিদ্যার মর্যাদা ও অবদান অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ও জ্ঞানগর্ভ। যেমনিভাবে খিলাফত ও নেতৃত্ব উচ্চ মর্যাদাবান ও তেমনিভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।[৭৯৯]

শহর বা গ্রামে বসবাসরত সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যই মসজিদ একটি কেন্দ্রীয় আলোকবর্তিকা হিসেবে নির্মিত এবং মসজিদে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিতি তাঁদের স্থায়ী মুক্তির পয়গাম বহন করে।[৮০০] বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বাতিল ধর্ম ও মনগড়া মতার্দশের দূর্বিষহ অভিশাপ হতে সমগ্র পৃথিবীর মানব

---

৭৯৪. মুহাম্মদ আবদুলণ্ঢাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৭৯৫. মোঃ আব্দুর রশীদ, *ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৫৭

৭৯৬. মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৭৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৭৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৭৯৯. ইমাম গাজ্জালী, প্রাগুক্ত ২য় খ, পৃ. ১৩৩৮

৮০০. Ed., Martin Frish Man and hasan uddin Khan, The Mousque History architectural development and regional diversity, op.cit., P.268

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকে মুক্ত করে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তির পথ প্রশস্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই মদীনাতে একটি আদর্শ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। মিথ্যা ও বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে সত্য ও হক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মহা-বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, এ মসজিদ ছিল তার প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আদর্শ মানুষের সমন্বয়ে একটি সুখী সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলার যে মহাপরিকল্পনা নিয়ে তিনি সার্বক্ষণিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে ছিলেন, এ মসজিদ-ই ছিল তার মূল প্রেরণাস্থল।[৮০১] সোনালি যুগের মসজিদের এ বলিষ্ঠ ভূমিকাকে সম্মুখে রেখে যদি-এর মূল লক্ষ্য ও ভাবধারা অনুযায়ী মসজিদগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়– তবেই হবে মঙ্গল।[৮০২]

ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মসজিদ

মুসলমানদের জীবনে ঐক্য, সংহতি, মমত্ব এবং শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করতে মসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমবেতভাবে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে দৈনিক পাঁচবার এবং সপ্তাহে একবার আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ মসজিদ ইসলামের অনুসারিগণকে দান করেছে। এক মিল্লাতের সমাবেশের এমন উৎকৃষ্ট স্থান মসজিদ ব্যতীত আর অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। মসজিদে প্রবেশ করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নিকট ধনী-নির্ধন, বাদশাহ-ফকীর ও সাদা-কালোর বাঁধ ভেঙে সকলেই একসাথে আল্লাহর নিকট সাধারণ গোলাম হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রকৃত সাম্য, মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করার শপথ গ্রহণ করে।[৮০৩] আইন-শৃঙ্খলা প্রশিক্ষণের সুযোগ তাঁরা এখানে পায়। রাষ্ট্র বা সমাজের নেতার এক মিল্লাতের প্রত্যেকটি সদস্যের অভাব-অভিযোগ জানার এক বিরাট সুযোগ এখানে আছে। কারণ তাঁকে সালাত পরিচালনা করতে হয় এবং সবার অবস্থা অবগত হওয়ার উদ্যোগ নিতে হয়।[৮০৪] Philip K. Hitti বলেন, "মরুভূমির গর্বিত ও আত্মকেন্দ্রিক সন্তানদের কাছে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে এ ধর্মীয় উপাসনার বিরাট মূল্য ছিল। এ সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাঁদের মধ্যে সামাজিক সাম্য ও সংহতিবোধ গড়ে উঠে। মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মতত্ত্বগতভাবে ব্যক্তির সম্পর্কের পরিবর্তে যে ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা গড়ে তুলেছিলেন, এ ধর্মীয় সমাবেশের মাধ্যমে মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসিগণের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মসজিদ এভাবেই ইসলামের প্রথম 'ড্রিলের মাঠে' পরিণত হয়েছে।"[৮০৫] মসজিদ হচ্ছে মুসলিম জাতির তাঁর প্রভূর নিকট আকুতি-মিনতি, আবেদন-নিবেদনের কেন্দ্র। তাই কবি কাজী নজরুল ইসলাম (জ. ১৮৯৯-মৃ.১৯৭৬ খ্রি.) গেয়েছেন,

"কত দরবেশ ফকির-রে ভাই মসজিদের আঙ্গিনায়,
আল্লাহর নাম যিক্‌র করে লুকিয়ে গভীর রাতে।"[৮০৬]

---

৮০১. অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৮০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৮০৩. ড. এ. এম. ইয়াকূব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৮০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৮০৫. P.K Hitti, op.cit., P.132

৮০৬. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামের মসজিদের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক কল্যানে মসজিদ

মুসলিম সমাজে মসজিদ হচ্ছে দীনি, ঈমানী, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমাজ সংস্কারমূলক সমস্ত কর্মসূচী মসজিদের ভেতর থেকেই পরিচালনা করা হত। নবী (সা.)-এর যুগে সাহাবা, তাব্‘ঈগণের যুগে মসজিদ ছিল বহুমাত্রিক ভূমিকার অধিকারী। আহ্লুস্-সুফ্ফার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদেই ছিল। মসজিদ চত্বর ছিল সেনা ছাউনি, পার্লামেন্ট ভবন। ইতিহাসে মসজিদের মত এত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী পৃথিবীর অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নেই। মুসলিম উম্মাহ যতদিন মসজিদের এ গুরুত্ব স্বীকৃতি দিয়ে– মসজিদ থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে, তত দিন তাঁরা উন্নতির শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করেছিল, আর যখনই তাঁরা মসজিদ থেকে দূরে অবস্থান করেছে তখনই তাঁরা অধঃপতনের শিকার হয়েছে।[৮০৭]

দীন ইসলাম ও ইসলামী সমাজের প্রাণকেন্দ্র মসজিদ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের সকল কাজের সঙ্গেই ‘ইবাদতের সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই মসজিদকে কেবল ‘ইবাদতের কেন্দ্ররূপেই গড়ে তোলা হয়নি, বরং মানব জীবনের ও সমাজ পরিচালনার দিক নির্দেশনার প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্ররূপেই গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রম মসজিদ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যেখানেই কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেখানেই একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদুন নববী ছিল ইসলামের একটি অজেয় দূর্গ। তথা হতে দীন ও দুনিয়ার সকল বিধি-বিধান ও আইন-কানূনের বিন্যাস হয়েছিল। এখানে শিক্ষা দেয়া হত যুদ্ধ-নীতি, যুদ্ধের কলা-কৌশল এবং তথা হতে পরিচালিত হত সামরিক অভিযান। দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিগণ এখানেই উঠত। পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মসজিদুন নববীর এক প্রান্তে।[৮০৮] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিতরণ করতেন। মসজিদুন নববীর ছাত্রবৃন্দই মানব ইতিহাসের সর্বোত্তম জ্ঞানীরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। উট, ঘোড়া ও মেষপালকের রাখাল হতে এবং কেনা গোলাম ও বাদী হতে তাঁরা উন্নীত হয়েছিলেন, বিশেষজ্ঞ ‘আলিম, ফকীহ, বিশ্বখ্যাত সেনাপতি ও শাসনকর্তায়।[৮০৯]

মসজিদের হারানো আদর্শ পুরুদ্ধারের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ফিরে পেতে পারে তাঁদের হৃত গৌরব ও মর্যাদা। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সঠিক নেতৃত্ব ও চেতনাবোধ। তবেই মুসলিম জাতি হবে আবার প্রাণবন্ত এবং সূচনা হবে বিশ্বশান্তির। একথা ভুলে গেলে চলবে না ইসলামের স্বর্ণযুগ তথা মুহাম্মদ (সা.)-এবং খুলাফা রাশিদীনের শাসনামলে মসজিদ ছিল অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু। মসজিদ হতেই জনগণের সকল জাগতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিমূলক কর্মকাণ্ডসমূহ পরিচালনা করা হত। মসজিদ ছিল সকল কর্ম ও কোলাহলে প্রানবন্ত।[৮১০] দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ (জ. ১৯০৬-মৃ. ১৯৯৯খ্রি.) বলেন, “প্রকৃত পক্ষে হযরত রাসূল-ই-আকরম (সা.) ও খুলাফা রাশিদীনের

---

৮০৭. ‘আবদুস সালাম রাহমানী, *তুযায়্যেনে মাসাজিদ* (উর্দূ), দিলণ্টী: আদ্-দারুল ‘ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০, পৃ. ৩-৪

৮০৮. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সিরাত বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৩৬৯

৮০৯. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০

৮১০. দৈনিক ইনকিলাব, ৩০ শে মে, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

আমলে মসজিদ ছিল একাধারে পার্লামেন্ট, সুপ্রীমকোর্ট, গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়। মসজিদকে কেন্দ্রকরেই জীবন বিকাশের ধারাগুলো চালু ছিল।"[৮১১]

মসজিদ অল্লাহর ঘর। এটি মুসলমানদের 'ইবাদতের পবিত্রতম স্থান। এটি ইসলামী জিন্দিগির প্রাণকেন্দ্র। যেমনভাবে মসজিদ 'ইবাদতের কেন্দ্র তেমনিভাবে মুসলিম জগতের শিক্ষা-সভ্যতা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের সুতিকাগার। পৃথিবীর যেখানেই মুসলমান সেখানেই মসজিদের অবস্থান। কিন্তু বর্তমানে মসজিদ একটি ইমারত হিসেবেই দণ্ডায়মান। মসজিদে শুধু মুসলমানগণ সালাতই আদায় করেন। বর্তমান মসজিদ সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিলক্ষিত হয়না। যদি খুলাফা রাশিদীনের স্বর্ণযুগের মসজিদ ভিত্তিক নীতি-আদর্শ অনুসরণ করে চলা যায়, তবে মসজিদগুলো আবার সোনালি যুগের মসজিদের মত জীবন্ত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৮১১. দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রি., ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইমাম শব্দের অর্থ ও পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইমামতের প্রকার ও শর্তাবলী
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলী এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	কুর'আন হাদীসের আলোকে ইমামদের মর্যাদা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা ও ইমাম সমাজ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইমাম শব্দের অর্থ ও পরিচয়

ইমাম শব্দের শাব্দিক অর্থ

ইমাম امام শব্দটি ইমামত امامة মাসদার বা শব্দমূল থেকে নির্গত। ইমাম অর্থ নেতা, প্রশস্ত পথ, নমুনা, কোন কিছু তৈরি করার সময় তার লাইন সোজা রাখার সূতা ইত্যাদি। বহু বচন ايمة ও ائمة হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১]

আল মুনজিদ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন امام শব্দটি مذكر ও مؤنث উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। অর্থ من يؤتم او يقتدى به. যে নেতৃত্ব দেয় বা যাকে অনুসরণ করা হয়, খলীফা, অনুসরণ যোগ্য ব্যক্তি, নামাযে যিনি ইমামত করেন ইত্যাদি।[২] অর্থাৎ যাকে অনুসরণ করা হয় তিনিই হলেন ইমাম। এই অর্থেই বলা হয়, امام الصلاة এছাড়া শব্দটি খলীফা, সেনাপতি, সংশোধনকারী এবং শৃংখলা রক্ষাকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৩] ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুর'আন মাজিদে امام শব্দটি এক বচনে ছয়বার এবং বহুবচনে পাঁচবার এসেছে। ইমাম শব্দের অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, কিতাব, আদর্শ, পথ, নেতা ইত্যাদি।[৪]

ইমাম শব্দের অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে, অন্যান্য অর্থের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়া, রাজত্ব করা, শাসন কার্য পরিচালনা করা, নামাযের ইমামত করা। পবিত্র কুর'আনে উল্লিখিত ইমাম শব্দের কতিপয় ব্যবহার:

وَ اِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ[৫]

نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَ اٰثَارَهُمْ ۚ وَ كُلَّ شَیْءٍ اَحْصَیْنٰهُ فِیْۤ اِمَامٍ مُّبِیْنٍ[৬]

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَ یَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً[৭]

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۫ وَ اِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِیْنٍ[৮]

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً یَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ اِیْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِیْنَ[৯]

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً یَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ لَا یُنْصَرُوْنَ[১০]

وَ الَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا[১১]

হাদীস শরীফে ইমাম শব্দের ব্যবহার

---

১. *আল মুনজিদ* (বৈরূত: ১৯৫২ খ্রি. পৃ. ১৫), দ্র. *লিসানুল আরব*,
২. *মিসবাহুল লুগাত*, মাকতাবুল বুরহান, দিলণ্ডী, পৃ. ৪০; *আল-মুজামুল ওয়াসিত*, কুতুবখানা হুসাইনিয়া, দেওবন্দ, পৃ. ২৭
৩. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খ, পৃ. ১৭২
৪. প্রাগুক্ত, ১ম খ, পৃ. ৫১৮
৫. আল-কুর'আন, ২:১২৪
৬. আল-কুর'আন, ৩৬:১২
৭. আল-কুর'আন, ১৭:২২
৮. আল-কুর'আন, ১৫:৭৯
৯. আল-কুর'আন, ২১:৭৩
১০. আল-কুর'আন, ২৮:৪১
১১. আল-কুর'আন, ২৫:৭৪

Dhaka University Institutional Repository

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم او لا يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمارٍ أو يجعل الله صورته صورة حمارٍ.[১২]

عن عائشة ام المؤمنين انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته وهو شاكل فصلى جالسا وصلى وراء قوم قيامًا فاشار اليهم ان اجلسو فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا اذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلى جالسا.[১৩]

ইমাম শব্দের ব্যবহারিক অর্থ ও ইমামের পরিচয়

ইমাম শব্দটির অর্থের ব্যাপকতার কারণে এর ব্যবহারে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যবহারিত অর্থ তুলে ধরা হল,

১) পথ প্রদর্শক।

২) সোনপতি।

৩) ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা।

৪) শিয়াদের ইসনা আশারিয়্যা উপকুল ইমাম উপাধিকে হযরত আলী (রা) এবং তাঁর বংশধরদের মধ্য হতে প্রথম এগারজনের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করে থাকে।[১৪]

৫) তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, তাসাউফ, ইসলামী দর্শন, অভিধান ইত্যাদি বিষয়ের যে কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞকেও ইমাম নামে আখ্যায়িত করা হয়। তবে আমাদের সমাজে নামাযে নেতৃত্বদানকারীকেই আমরা সাধারণত ইমাম বলে জানি। এটি তার একটি সরল অর্থ। ইসলামী শরীয়াতে বা ইসলামী ইতিহাসে শব্দটি ব্যাপক ও সামগ্রীক কর্মকাণ্ডের পরিভাষার নাম।

ইমামের পরিচয়

সাধারণ অর্থে যারা মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতের দায়িত্ব পালন করে থাকেন তাদেরকেই ইমাম বলা হয়।

১২. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রি., ২য় খণ্ড, হাদীস ৬৫৮, পৃ. ৮০

১৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৫৪, পৃ. ৭৯

১৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ই.ফা.বা.১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৫১৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ইমামতের প্রকার ও শর্তাবলী

ইমামের প্রকার

জুমহুর উলামা ইমামতকে দু' ভাগে ভাগ করেছেন:

১) ইমামাতে সুগরা

২) ইমামাতে কুবরা

ইমামাতে সুগরাঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতসহ অন্যান্য সালাতের ইমামতকে ইমামতে সুগরা বলা হয়।

ইমামাতে কুবরাঃ জনসাধারণের উপর সাধারণভাবে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার অধিকারী হওয়াকে ইমামতে কুবরা বলে। অর্থ্যাৎ জাতির নেতৃত্ব দেয়া বা রাজ্য পরিচালনা করা।

ইমামতের শর্তাবলীঃ এখানে আলোচ্য বিষয় ইমামাতে সুগরা বা নামাযের ইমাম নিয়ে। সঙ্গত কারণেই আমরা নামাযের ইমামতের শর্তাবলী নিয়ে আলোকপাত করব।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়নের পর একজন মানুষের উপর যে ফরয কাজটি বর্তায় তা হ'ল, সালাত। ধনী-গরীব নির্বিশেষে বছরের প্রত্যেক দিন সকল বালিগের উপর নামায ফরয। তাই অন্য যে কোন ইবাদতের তুলনায় নামাযের গুরুত্ব আল্লাহর কাছে সর্বাধিক। তাই এই সালাতকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে আদায় করার নিমিত্তে আল্লাহ জামাতের সাথে নামায আদায় করাকে ওয়াজীব করেছেন। জামাতের সাথে নামায আদায় করার জন্য ইমাম অপরিহার্য। নিম্নে ইমামের প্রয়োজনীয় শর্তবলী তুলে ধরা হল।

ইমামের ইমামত সহীহ হওয়ার জন্য প্রধানত ছয়টি শর্ত রয়েছে,

১) মুসলমান হওয়া।

২) বালিগ হওয়া।

৩) সুস্থ স্বাভাবিক হওয়া।

৪) কিরাত সহীহ হওয়া।

৫) পুরুষ হওয়া।

৬) বিভিন্ন প্রকার ওযর অসুবিধা থেকে মুক্ত হওয়া, যেমন তোতলামী।

উপরোক্ত ছয়টি শর্ত ইমামাত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত অর্থাৎ যার মাঝে উল্লেখিত শর্তগুলো বিদ্যমান থাকবে তিনি ইমাম হতে পারেন। তবে একটি প্রশ্ন থাকে উপরের আলোচিত বিষয়গুলো যদি একাধিক ব্যক্তির মাঝে থাকে তখন কে ইমামাত করবেন। এমতাবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১) ইমামাতের সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবেন ঐ ব্যক্তি যিনি সালাতের হুকুম আহকাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

২) এরপর ইমামাতের দায়িত্ব পাবেন- যিনি সবচেয়ে সহীহ সুন্দরভাবে পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াত করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن ابى مسعود الانصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانو فى السنة سواءً فاقدمهم هجرة فان كانوا فى الحجرة سواء فاقدمهم سلمًا ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمة الا بإذنه.

আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি লোকদের ইমামত করবেন যিনি আল্লাহর কিতাব পাঠে সব চাইতে অভিজ্ঞ। কুর'আন পাঠে যদি সকলেই সমান হয় তবে যিনি তাঁদের মধ্যে সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ। তাতেও যদি সকলেই একরকম হয় তবে যিনি আগে হিজরত করেছেন। তাতেও যদি সকলেই সমান হয়, তবে যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারে ইমামতি করবেনা এবং অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে তার বিশেষ আসনে বসবে না।[১৫]

৩) যদি কিরাআতেও সমান হয়, তাদের মধ্যে বেশি পরহেযগার ব্যক্তি ইমামের অধিকযোগ্য।

৪) যদি পরহেযগারিতে সমান সমান হয়, তবে বয়সে বড় যিনি তিনি ইমাম হবেন।

৫) এরপর অপেক্ষাকৃত যার চরিত্র উত্তম।

৬) এরপর অপেক্ষাকৃত যার বংশ মর্যাদা বেশি।

৭) এক্ষেত্রেও সমান সমান হলে যিনি বেশি সুন্দর চেহারার অধিকারী।

৮) যিনি অধিক শরীফ বা ভদ্র তিনি অধিক যোগ্য।

৯) যার কণ্ঠস্বর অধিক ভাল।

১০)যার পোশাক ভাল।

১১)যার স্ত্রী অপেক্ষাকৃত সুন্দরী।

১২)যিনি অধিক সম্পদ বা বড় পদমর্যাদার অধিকারী।

১৩)মুসাফিরের তুলনায় মুকীম অগ্রগণ্য।

১৪)যিনি বংশানুক্রমে আযাদ।

১৫)ওযুর তায়াম্মুমকরী গোসলের তায়াম্মুমকারীর চেয়ে যোগ্য।

---

১৫. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে-১৯৯১ খ্রি., ২য় খ, হাদীস নং ১৪০৪, পৃ.৪৬৪

Dhaka University Institutional Repository

১৬)যার মধ্যে একাধিক গুন থাকবে তিনি একগুনের অধিকারী হতে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবেন। যদি দুই ব্যক্তির মাঝে এ ধরণের গুনাবলীর সমাবেশ ঘটে তবে লটারীর মাধ্যমে ইমাম নির্ধারণ করা হবে অথবা মুসল্লীদের ইখতিয়ারের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। এবং তারাই তাদের ইমাম নির্বাচন করে দিবে।[১৬] মোট কথা, ইমামের যোগ্যতা নির্ধারণের মৌলিক বিষয় হল তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবেন।

এ প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ সায়েব বলেন, ক) অপেক্ষাকৃত যিনি ভাল কুর'আন তিলাওয়াত করতে পারেন।

খ) এক্ষেত্রে সমপর্যায় হলে যিনি হাদীসে অপেক্ষাকৃত ভাল জ্ঞান রাখেন।

গ) এক্ষেত্রেও সমপর্যায়ের হলে, দেখতে হবে কে আগে হিজরত করেছেন।

ঘ) এক্ষেত্রে যদি সমান হয়, তবে দেখতে হবে কে বয়োজ্যেষ্ঠ।[১৭]

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.) আরও একটি বিষয় যুক্ত করেন তা হল বিবাহিত ব্যক্তি অবিবাহিত ব্যক্তি হতে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।[১৮]

যেহেতু নামাযের ইমামত একটি বিরাট দীনি মর্যাদা ও দায়িত্ব। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমও তিনি সে কারণে সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত এবং অধিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ইমাম নিযুক্ত করা মুসল্লীদের কর্তব্য।

১৬. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ই.ফা.বা.১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২১৪

১৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২০৪-২০৫

১৮. সাইয়েদ সাবির, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্‌হ, ১৯৯৭ খ্রি.) পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলী এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলী

ইমাম বা নেতা বলতে সমাজের আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিত্বকে বোঝায়। যিনি সুনির্বাচিত একজন ব্যক্তিত্ব হবেন এবং সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। এই সমাজকে নেতৃত্ব দিবেন। সালাত কায়েমের সাথে সাথে তার মুসল্লীদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় বিষয়ে পথ প্রদর্শন করবেন। সে জন্য সমাজের সকল ব্যক্তিই ইমামতের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না। সঙ্গত কারণেই সমাজের সর্বাধিক উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই ইমাম হিসেবে নির্বাচিত হবেন।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগ। এযুগে বিশ্ব ব্যবস্থায় দ্রুত আধুনিকরণের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈষয়িক উন্নতি আশাতীত হলেও মানবিক দিকটির অধগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই ক্রমেই মানুষ অশান্তি ও অস্বস্তির চরম বিভীষিকাময় অবস্থায় পতিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় একটি শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে একজন ইমাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর সে জন্য প্রয়োজন প্রতিটি মসজিদে একজন আদর্শ ইমাম। যুগ ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী একজন ইমামকে নূন্যতম যে সমস্ত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া জরুরি তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

১) ইমামতের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান।

২) আত্মিক উৎকর্ষ সাধন সম্পর্কিত জ্ঞান।

৩) সমকালীন বিশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞান।[১৯]

১) ইমামতের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান

বর্তমান সমাজে ইসলামের প্রতিকূল পরিবেশে মুসলমানদের আত্ম পরিচয় ও সমাজ জীবনের সঠিক পথ প্রদর্শন করে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য একজন ইমামকে হতে হবে জ্ঞানগত সমৃদ্ধ। কারণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়া একজন ইমাম তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পারবেন না। এইজন্য একজন ইমামকে নিম্নের বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ক) আল-কুর'আনের জ্ঞান

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল উৎস হল কুর'আন। কুর'আন হল মানব জীবনের পথ প্রদর্শক। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান বিবৃত হয়েছে পবিত্র কুর'আনে। পবিত্র কুর'আন হল সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না কিন্তু তারা তো তোমাদের মত এক একটি উম্মত। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে

১৯. ড. মীর মনজুর মাহমুদ, *বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে একত্র করা হবে।[২০] কুর'আনের জ্ঞান ছাড়া একজন মানুষ প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারে না। মহান আল্লাহ আরও বলেন, সেদিন আমি উত্থিত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদেরই মধ্য থেকে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমকে আমি আনবো স্বাক্ষীরূপে এদের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।[২১] তাই আদর্শ ইমাম হয়ে সামাজিক দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য আল-কুর'আনের এতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যাতে তিনি নিজে বিশুদ্ধভাবে কুর'আন তিলাওয়াত করতে পারেন। নিজে কুর'আন বুঝতে ও বুঝাতে পারেন। নতুবা ইমাম হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

খ) হাদীস বিষয়ক জ্ঞান

ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস হাদীস। হাদীস ছাড়া পবিত্র কুর'আন বুঝাও দুষ্কর। ইমামতের ক্ষেত্রে হাদীস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই একজন ইমামকে সচারুরূপে তার দায়িত্ব পালনে হাদীসের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কেননা সরাসরি কুর'আন থেকে কোন বিষয় উপলব্ধি করতে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা দেখা দিতে পারে। হাদীস সেক্ষেত্রে কার্যকর সহযোগিতা প্রদান করে। সে জন্য একজন ইমামকে সহীহ হাদীস গ্রন্থ সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখতে হবে। পাশাপাশি সমাজে প্রচলিত জাল হাদীস সম্পর্কেও একজন ইমামকে সচেতন থাকতে হবে। যাতে সমাজে বিদ'আত ও কুসংস্কার স্থান না পায়।

গ) ফিকহী জ্ঞান

কুর'আন ও হাদীসের পাশাপাশি ফিক্হ তথা মাস'আলা মাসায়েলের জ্ঞান থাকা একজন ইমামের অত্যাবশ্যক। কারণ বর্তমানে সমাজে মুসলমানদের জ্ঞান বিমুখতার কারনে ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতা চোখে পড়ার মত। তাই সমাজের বিদ্যমান নানাবিধ সমস্যায় ফিকহী সমাধান পাওয়ার জন্য তারা ইমামের কাছে ছুটে আসে। একজন সাধারণ মুসল্লীর পক্ষে কুর'আন-হাদীস থেকে মাস'আলা বের করে আমল করা সম্ভব নয়। তাই তারা ইমামের থেকে পাওয়া সমাধানই মেনে চলতে চেষ্টা করে। তাই প্রত্যেক ইমামের দায়িত্ব হল জুমু'আ বা বিশেষ দিনগুলোতে জরুরি মাস'আলা নিয়ে আলোচনা করা এবং সর্বদাই সেগুলো চর্চার মধ্যে রাখা। যাতে কেউ জানতে চাইলে তাকে বিশুদ্ধ মাস'আলাটি প্রদান করতে পারেন। এজন্য একজন ইমামকে ফিকহী মাস'আলা মাসায়েল সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের অধিকারী হওয়া জরুরি।

ঘ) সহীহ আকীদা সম্পর্কিত জ্ঞান

ইসলামের যাবতীয় আমল করা এবং তা থেকে সুফল পাওয়ার জন্য আকীদা সহীহ হওয়া অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আকীদা সহীহ না হলে যত আমলই করা হোকনা কেন। আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য

২০. আল-কুর'আন, ০৬:৩৮
২১ আল-কুর'আন, ১৬:৮৯

Dhaka University Institutional Repository

হবে না। ইমাম যেহেতু সমাজের নেতা, তাই মানুষ ইমামের আকীদা বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হবে, এজন্য ইমামকে অবশ্যই সহীহ আকীদা পোষণকারী হওয়া জরুরি।

ঙ) বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ সম্পর্কিত জ্ঞান

পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি আরও অসংখ্য ধর্ম ও মতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু আল্লাহর কাছে ঐসব ধর্ম বা মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ঐ সকল ধর্মের অসারতা মানুষের মাঝে তুলে ধরার জন্য তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

২. আত্মিক উৎকর্ষ সাধন সম্পর্কিত জ্ঞান

একজন ইমাম কুর'আন, হাদীস ফিক্‌হের জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে তাযকিয়াতুন নাফস সম্পর্কিত জ্ঞান ও অর্জন করবে। কারণ ইমাম হলেন সমাজের আধ্যাত্মিক গুরু। একজন ইমামকে সমাজের প্রতিটি মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধনেও সচেষ্ট থাকতে হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত আছে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল প্রেরণ করুন যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২২]

৩. সমকালীন বিশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞান

বর্তমান গ্লোবালাইজেশনের যুগ। মুহূর্তের মধ্যেই সারা দুনিয়া খবরাখবর জানা যায়। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের ফলে মানুষ এখন অনেক সচেতন, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী একজন ইমামকে সমকালীন বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া খুবই জরুরি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা একজন ইমামের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

একজন ইমাম হচ্ছেন একটি মহল্লা বা সমাজের ধর্মীয় গুরু। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামাতের দায়িত্ব ছাড়াও তাঁর রয়েছে একাধিক গুরুদায়িত্ব। তিনি যেমন নিয়িমিত অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতাকে দিন দিন বৃদ্ধি করবেন। পাশাপাশি তার যোগ্যতা অনুসারে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সাধ্যমত ভূমিকা পালন করবেন। এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সুকৌশলে বিতর্ক বহির্ভূত বিষয়গুলো সমাজে তুলে ধরবেন। সমাজের যাবতীয় দ্বিধা-বিভক্ত দূর করে পুরা সমাজকে একটি একতার প্লাটফর্মে স্থাপন করবেন। ইমাম সাহেব তার সুন্দর ব্যবহার ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে সমাজের সকলকে আপন করে নিবেন। কেননা একমাত্র ভালবাসা দিয়েই মানুষের মন জয় করা যায়। একজন ইমাম মুসল্লীদের যতবেশি আপন হতে পারবেন ততবেশি তিনি তার আদর্শ সমাজে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন। তাই একজন ইমামকে অত্যন্ত দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সুকৌশলে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে চেষ্টা করতে হবে।

---

২২. আল-কুর'আন ০২:১২৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ কুর'আন হাদীসের আলোকে ইমামদের মর্যাদা

আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন । তাকে ফেরেশ্তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞান ও সম্মান দান করেছেন। ফেরেশ্তাদেরকে তাঁর সেই প্রতিনিধিকে সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্র আদেশ মুতাবিক ইবলিস ছাড়া সকল ফেরেশ্তাগণ তাঁর প্রতিনিধিকে সম্মানসূচক সিজদা করেছেন। এভাবে মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানুষ তার মূল সত্তার দিক দিয়ে তুচ্ছ সৃষ্টি মাত্র। তবে সে যে ইজ্জত ও সম্মান লাভ করেছে, তা শুধু তার ভেতরে ফুঁকে দেয়া রূহ এবং দুনিয়ায় তাকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব দান করার কারণেই। এখন শয়তানের আনুগত্য না করে তার রুহকে কলুষিত না করা এবং নিজেকে প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করে বিদ্রোহের পর্যায়ে অবনমিত না করার উপরই তার এই সম্মানের হেফাজত নির্ভরশীল। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে তাদের সেই তুচ্ছ সৃষ্টিই থেকে যেতে হবে।

আল্লাহর প্রতিনিধি হবার কারণে মানুষের মর্যাদা হচ্ছে দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত। দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই তবে অধীন, তার ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত এবং আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় তা থেকে সে খেদমত গ্রহণ করার অধিকারী। এই সকল অধীনস্থ জিনিসের সামনে নত হলে সে নিজেই নিজের উপর যুলুম করে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হবে। কিন্তু এমন এক সত্ত্বা রয়েছেন যার সামনে নত হওয়া,যার আনুগত্য করা এবং যাকে সিজদা করার মধ্যেই নিহিত আছে এই প্রতিনিধির সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মান। তিনি হলেন আল্লাহ। একমাত্র সালাত বা সিজদার মাধ্যমেই বান্দার 'আবদ বা বান্দা হওয়ায় গৌরবটি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়। আর এই সালাতের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বটি বর্তায় একজন ইমামের উপর।

ইসলাম ইমামকে অনেক মর্যাদা দান করেছে। সালাতের মত এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাতে ইমামের অনুসরণ প্রত্যেক মুসল্লীর জন্য ফরয। সালাতের মধ্যে ইমামের পূর্ণ অনুসরণ করাকে সালাত শুদ্ধ হওয়ার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। সালাতে ইমামের অনুসরণের ক্ষেত্রে সামান্যতম ব্যত্যয় ঘটলে সালাত শুদ্ধ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা তোলে অথবা ঝোকায় তার কপাল শয়তানের হাতে।[২৩]

এ হাদীসের মাধ্যমে শরীয়ত প্রদত্ত ইমামের মর্যাদা প্রতীয়মান হয়। অপর এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম নির্বাচন করা হয় তাঁর ইকতিদা করার জন্য। কাজেই তিনি যখন রুকু করবেন তখন তোমরাও রুকু করবে এবং তিনি যখন মাথা উঠাবেন তখন তোমরাও মাথা উঠাবে।[২৪]

---

২৩. *মুয়াত্তা ইমাম মালেক*, সালাত অধ্যায় (ঢাকা: ই.ফা.বা.), হাদীস নং ২৫৯, পৃ. ১১২

২৪. *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আযান (ঢাকা: ই.ফাবা., ১৯৯৫ খ্রি.), হাদীস নং ৬৫৪

Dhaka University Institutional Repository

জামাতের সাথে সালাত আদায়কালে মুক্তাদিগণের সালাত অনেকাংশে ইমামের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। এমনকি সালাতের মধ্যে কিরাত পাঠ ফরয করা হলেও ইমামের কিরাতই মুকতাদির জন্য যথেষ্ট বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ফিক্হী ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কখন ইমামের পিছনে নামায পড়ে তখন ইমামের কিরাআতই তার জন্য যথেষ্ঠ।[২৫]

ইমামের প্রদত্ত সুন্নত খুৎবাকে মুসল্লীদের জন্য শোনা ওয়াজিব করে ইমামের মর্যাদাই বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ইমামের খুৎবা প্রদানকালে কেউ যদি (কাউকে) বলে চুপ করুন, তবে সেও অনর্থক কাজ করল।[২৬]

অপর এক হাদীস থেকেও ইমামের মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। উক্ত হাদীসে ইমামের খুৎবা দানকালে বসার আদব সম্পর্কে হযরত মুয়ায (রা) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوت يوم الجمعة والامام يخطب. "ইমামের খুৎবা দানকালে মুসল্লীদের ইহতিবা অবস্থায় বসতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন।"[২৭]

ইমামের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين. ইমাম হ'ল যামিনদার আর মুআযযিন হ'ল আমানতদার, হে আল্লাহ! ইমামকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আর মুআযযিনকে মাগফিরাত করুন।[২৮]

সর্বশেষ আহমদ ইব্নে হাম্বল (র) নিম্নোক্ত বাণী থেকে ইমামদের মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ হয়। তিনি বলেন, اذا ام بقوم رجل وخلفه من هو افضل منه لم يزالوا فى سفالٍ যখন কোন জাতির ইমামত এমন ব্যক্তিকে দান করা হয়, যার পিছনে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও যোগ্যতর ব্যক্তি রয়েছে, তখন সে জাতি সর্বদা অধঃপতিত ও পদদলিত থাকবে।[২৯]

২৫. *মুয়াত্তা ইমাম মালেক*, প্রাগুক্ত।
২৬. *তিরমিযী শরীফ*, সালাত অধ্যায়, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৪ খ্রি.), হাদীস নং ৫১২, পৃ. ৩০৪
২৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫১৪
২৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২০৭, পৃ. ২০০
২৯. আব্দুল খালেক, *বিশ্বনবী (সা.)-এর সংস্কার কর্মসূচি*, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা ও ইমাম সমাজ

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ১৯৭১ খ্রি.। যার আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে ও পশ্চিমে ভারত, পূর্বে ভারত ও মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০শতাংশ মুসলমান। তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ নানা ধর্মের মানুষ আমাদের সমাজে বসবাস করছে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করছে। আবহমান কাল থেকেই বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের বয়স চল্লিশ বছর ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বন্ধ হয়নি। গণতন্ত্রের সুষ্ঠু চর্চা আজও অনুপস্থিত। বর্তমানে দেশে গনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা চালু থাকলেও অতীতের মতই ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলসমূহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিচ্ছে। একই কারণে দেশের উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতেও সরকার ও বিরোধী দল মতৈক্যে পৌঁছাতে পারছে না। সুষ্ঠু ধারায় গণতন্ত্রের চর্চা না হওয়ায় সরকারী দল বিরোধী দলকে যথাযথ মূল্যায়ন করছে না অপরপক্ষে বিরোধী দলও সরকারকে কোন ধরণের সাহায্য সহযোগিতা করছেনা। সব ক্ষেত্রেই আস্থার সংকট বিরাজ করছে। ফলে কোন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হয়ে ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কারণে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। প্রতিপক্ষকে নাজেহাল করতে সকল প্রকার অসৎ পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। এর ফলে সমাজে গুম-খুন অপহরণের মত জগন্য ঘটনা বেড়েই চলছে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে অর্থনৈতিকভাবেও আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। বিদেশীরা আমাদের দেশে বিনিয়োগ নিরাপদ মনে করছে না। সেই সাথে দেশী বিনিয়োগকারীরাও নিরুৎসাহিত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমন্বয়ে খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে। দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদার তুলনায় আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় আমাদের সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ বেড়েই চলছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্দ্রে রন্দ্রে দুর্নীতি বিরাজ করছে।

আমরা বাঙালি জাতি। আমাদের আছে নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি। কিন্তু আজ আমরা আমাদের সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য আর ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণে প্রতিযোগিতায় নেমেছি। ফলে বেপর্দা-আর বেহায়াপনা আমাদের সমাজে সুনামীর মত সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। ধর্ষণ, খুন, অপহরণ সমাজের নিত্য নৈমিত্যিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পতিতাবৃত্তিকে পশ্চিমা সংস্কৃতির মত লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে। কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা পশ্চিমা ধাচে মাদক গ্রহণ করছে। মাদক গ্রহণকে স্মার্টনেস হিসেবে বিবেচনা করছে। ফলে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সর্বত্রই মাদকের ব্যাপক বিস্তার হচ্ছে। হাজার হাজার ছেলে মেয়ে আজ মাদকাসক্ত হয়ে পুরা জাতিকে ধ্বংসের দ্বারাপ্রান্তে ঠেলে দিচ্ছে। নীতি-নৈতিকতার চরম অবক্ষয় হচ্ছে। সন্তান তার পিতা-মাতাকে সম্মান করছে না। ছাত্র

Dhaka University Institutional Repository

উস্তাদকে মান্য করছে না। সমাজের সর্বত্রই যেন অশান্তির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সামগ্রীক অর্থে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে। একমাত্র মসজিদ কেন্দ্রীক সমাজ ব্যবস্থাই পারে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিকে উদ্ধার করতে। আর এক্ষেত্রে একজন ইমামের ভূমিকা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইমামের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বর্তমানে ইমাম শব্দটির সাথে সমাজের কর্তৃত্বশূন্য একজন খণ্ডিত ধর্মীয় নেতার রূপই আমাদের চোখে ভেসে উঠে। সমাজের লোকদের ধারণা কেবল যারা মাদ্‌রাসায় পড়াশুনা করে, বিশেষ এক ধরণের পোষাক পরিধান করে তাদের জন্যই হচ্ছে এই "মর্যাদাহীন" কাজটি। আমাদের সমাজে একথাও প্রচলিত আছে, যার নাই কোন গতি সেই করে ইমামতি। কিন্তু এই গুরুত্ব ও মর্যাদাহীন দায়িত্বটিও এতটাই নাজুক, যে কোন মুহূর্তে তা চলে যেতে পারে। কারণ, তাঁরই কোন মুসল্লীর পছন্দ-অপছন্দের উপর তাঁর থাকা না থাকা নির্ভরশীল। তাঁর খাবার একবেলা এক মুসল্লীর বাসায় অপর বেলায় অন্য মুসল্লীর বাসায়। তাঁর বেতনের পয়সা সিকি, আধুলি হয়ে ঘুরছে অজানা মুসল্লীর পকেটে। তাঁর স্ত্রী ঘর থেকে বেরুতে পারেনা পাছে কেউ দেখে সমালোচনা করে বসে কিনা। আমাদের দেশের অধিকাংশ ইমামদের বেতন খুবই অল্প। যা বর্তমান সময়ে তাদের কোন চাহিদাই মেটাতে সক্ষম নয়। তদুপরি তাদের এই নামমাত্র বেতন মাসের পর মাস বাকী থাকে। অনেক জায়গায় দেখা যায় ইমাম নিজেই মুষ্টি চাল বা অন্য কোন উপায়ে তার বেতনের টাকা তুলতে বাধ্য হন। আর্থিক এই করুন অসঙ্গতি সত্ত্বেও মসজিদ কমিটি কর্তৃক দুর্ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই ইমামদেরকে মারাত্মক বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। যে কোন মুহূর্তে তার চাকুরী চলে যেতে পারে। অধিকাংশ মসজিদের ইমামই পবিত্র কুর'আন-হাদীসের আলোকে সময়োপযোগী বক্তৃতা করতে পারেন না। কারণ তার ভাষণ সমাজের ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা সরকারের অপকর্মের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। আর তখনি তার রুজি রোজগারের একমাত্র মাধ্যমটি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মসজিদে তার ক্ষমতা কেবল দিনে কয়েক মিনিটের জন্যই মেহরাব এলাকায় কয়েকফুট জায়গার মধ্যে। সেখানে তিনি "আল্লাহু আকবার" বললে সবাই এক সাথে রুকু-সিজদার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করে। কিন্তু হায়! এই সময়ের বাইরে তিনি বড়ই অসহায়।

কিন্তু এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একজন ইমাম আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে অনেক মূল্যবান উপদেশ দান করেন। তাঁর সাধ্য অনুযায়ী সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইমামদের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইমামগণের ভূমিকা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইমামদের অবদান

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে মসজিদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংগঠন

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশ পরিচিতি

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশ অঞ্চলে দ্রাবিড় ও তিব্বতীয় বর্মী জনগোষ্ঠীর বসতি গড়ে উঠেছিল প্রায় ৪ হাজার বছর পূর্বে। জানা যায় আর্য জাতির আগমনের পর খ্রিস্টীয় ৪র্থ হতে ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত গুপ্ত রাজবংশ, এরপর শশাঙ্ক এবং পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজবংশ প্রায় চারশ (৪০০) বছর ধরে এ অঞ্চলে শাসন করে। এরপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন রাজবংশ ক্ষমতায় আসে। দ্বাদশ শতকে সূফি ধর্ম প্রচারকের মাধ্যমে বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সামরিক অভিযান এবং যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে মুসলিম শাসকবর্গ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১২০৩-১২০৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নামের একজন তুর্কী বংশোদ্ভূত সেনাপতি রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে সেন রাজবংশের পতন ঘটান।[১] ষোড়শ শতকে মোঘল বিজয়ের পর ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীর নগর।

বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা, বৃহত্তর ফরিদপুর ও বৃহত্তর যশোর জেলা নিয়ে গঠিত অঞ্চলের নাম ছিল বঙ্গ। তার দক্ষিণ অঞ্চল পরিচিত ছিল বাঙ্গাল নামে।[২] বঙ্গ, বঙ্গাল, বাঙ্গাল ও বাংলা শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মত পাওয়া যায়। রিয়াযুস সালাতীন গ্রন্থে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়: নূহ (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল 'হাম'। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বসবাস করতেন। হামের এক পুত্রের নাম ছিল 'হিন্দ' তার নামানুসারে হিন্দুস্থান এলাকার নামকরণ হয়। হিন্দের এক পুত্র 'বঙ' এর বসতি ছিল উপমহাদেশের পূর্বঞ্চলে। তাঁর বংশধরদের অবাসস্থলই 'বঙ্গ' নামে পরিচিত।[৩] আবুল ফজর তাঁর 'আইন-ই আকবরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'বঙ্গ' এর সাথে 'আল' যুক্ত হয়ে বঙ্গাল বা বাঙ্গাল হয়েছে।[৪] বাংলা ভাষায় 'আল' শব্দের অর্থ বাঁধ। এ দেশের লোকেরা জমিতে উঁচু উঁচু আল বেঁধে বন্যার পানি থেকে জমি রক্ষা করত- সময়ের ব্যবধানে 'আল' শব্দটি দেশের নামের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।[৫] আবার সেমেটিক ভাষায় আল শব্দের অর্থ আওলাদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। এ অর্থে (বং+আল) বঙ্গাল অর্থ বং এর আওলাদ বা সন্তান।[৬]

বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ড. এম.এ. রহীম ও অন্যান্যরা বলেন, মুসলমান শাসনামল থেকে বাংলা ভাষাভাষী দু'ভাগ বাংলা নামে পরিচিত হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে এর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল।

ইতিহাস আলোচনা করলে আরো দেখা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও 'বাংলা' নামে কোন দেশ ছিল না। খ্রিস্টীয় চৌদ্দ-পনের শতকে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি অঞ্চল একত্রিত হয়ে প্রথমবারের মত 'বাঙ্গালাহ'

---

১. মুহাম্মদ শামসুর রহমান, *উদ্ভিদ পরিবেশ তত্ত্ব ও উদ্ভিদ ভূগোল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ২৬

২. এ. কে. এম, নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৭

৩. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *বাংলা ভাষার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য*, অগ্রপথিক, ঢাকা: ই.ফা.বা. ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রি., পৃ. ২৭

৪. মোঃ শরীফ হোসাইন ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার সন্ধান*, *লোকপ্রশাসন সাময়িকী*, ঢাকা: সাভার, জুন ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ২

৫. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; এ.কে.এম. রইছউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

(পরে বঙ্গদেশ) নামে পরিচিতি হয়।[৭] ক্রমে আন্তর্জাতিক জগতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে বাংলার পরিচয় বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক আফিফ, সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌কে শা-ই বাঙ্গলীয়ান বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] মুগল ঐতিহাসিক আবুল ফজলের লেখায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত ৪শ মাইলকে সুবা-ই-বাংলা বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯]

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের আগমন ঘটে। ১৭৫৭ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে শাসন ক্ষমতা লাভ করে।[১০] ১৯০৫ খ্রি. থেকে ১৯১১ খ্রি. পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে পূর্ববঙ্গ আসামকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ ঘটিত হয়েছিল। যার রাজধানী ছিল ঢাকায়। পরবর্তীতে রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের তিব্রু বিরোধিতার কারণে ১৯১১ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। ১৯৪৭ খ্রি. ভারতীয় উপমহাদেশের দেশ ভাগের সময় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫২ খ্রি. ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের দু'অংশের পূর্ণ স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ৬ দফা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৯ মাস লড়াইয়ের পড় ১৯৭১ খ্রি. ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[১১]

বাংলাদেশ মানচিত্র

৭. মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী, *বাঙালী বাংলাদেশের সংস্কৃতি*, ঢাকা: সুন্দরম, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, মে-জুলাই, ২০০০ খ্রি., পৃ. ১৭

৮. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *গঙ্গাঋদি থেকে বাংলাদেশে*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ১৩

৯. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, *বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০০ খ্রি., পৃ. ১৭; আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৭০

১০. গোলাম মোস্তফা কিরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

১১. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১১*, ঢাকা: অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনু বিভাগ, জুন-২০১১ খ্রি., পৃ. xv.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, The Peoples Republic of Bangladesh বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হলো এর দাপ্তরিক নাম। ১৯৪৭ খ্রি. ব্রিটিশ ঔপনৈবেশিক শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে যে দেশটি সৃষ্টি হয়েছে, তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ খ্রি. স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০°.৩৪ থেকে ২৬°.৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°.০১ থেকে ৯২°.৪১ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ। প্রায় ১৫ কোটি মানুষের আবাস।[১২] বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশসমূহের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। কিন্তু আয়তনের হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯৩ তম। সে হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশসমূহের একটি। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯৯৩ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৬ শতাংশ।[১৩] জনসংখ্যার ৮৯.৭% মুসলিম, ৯.২% হিন্দু, ০.৭% বৌদ্ধ, ০.৩% খ্রিস্টান এবং ০.২% অন্যান্য ধর্মালম্বী। এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা।[১৪] বাংলাদেশের বর্তমানের সীমারেখা নির্ধারিত হয় ১৯৪৭ খ্রি. ভারত বিভাগের সময় নবগঠিত দেশ পাকিস্তানের পূর্ব অংশ (পূর্ব পাকিস্তান) হিসেবে। দেশটির উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম সীমানায় ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় মায়ানমার, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[১৫]

অর্থনৈতিক অবস্থা

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। যদিও শিল্পোন্নয়নে বিগত কয়েক দশক ধরে সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তথাপি দেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ এখনো কৃষিজীবি। দেশের প্রধান কৃষিজ ফসলের মধ্যে রয়েছে, ধান, পাট, চা, তামাক, গম ইত্যাদি। পাট যা বাংলাদেশের সোনালি আঁশ নামে পরিচিত। এক সময় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান উৎস চিল এবং সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত পাটের ৮০% ভাগ বাংলাদেশেরই উৎপাদিত হতো।[১৬]

বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ আসে রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাক থেকে এবং একই খাতের জন্য কাঁচামাল আমদানিতে অর্জিত মুদ্রার বেশির ভাগ ব্যয় হয়।[১৭] ২০১০-২০১১ অর্থবছরে তৈরি পোশাক থেকে এবং একই খাতের জন্য কাঁচামাল রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সারাদেশে কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের

---

১২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০১১ খ্রি., ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭

১৩. সি এম সিরাজুল ইসলাম, *নলেজপিডিয়া*, ঢাকা: ইউনিএইড, এপ্রিল, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৩০

১৪. www.banglapedia.org; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১৫. বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৩৮১

১৬. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগস্ট, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১৩

১৭. C. Baxter, *Froma Nationto astate,* London: west viewpress, 1997, Pp. 23-28

Dhaka University Institutional Repository

চালু হওয়া ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের জনগণের বর্তমান মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ৮১৮ মার্কিন ডলার।[১৮]

জুন ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭ এবং অনুমোদিত ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩১টি। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকের শাখা দাঁড়িয়েছে ৭৯৬১টি। তফসিলি ব্যাংকসমূহের মধ্যে ৪টি বাণিজ্যিক ও ৪টি বিশেষায়িতসহ রাষ্ট্রয়াত্ত খাতে ৮টি, বেসরকারি খাতে ৩০টি এবং ৯টি বিদেশি মালিকানাধীন ব্যাংক রয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে ৭টি ব্যাংক সম্পূর্ণ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে সুদমুক্ত ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও ১৬ বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং-এর পাশাপাশি সীমিত পর্যায়ের ইসলামী ধারায় ব্যাংকিং করেছে।[১৯]

স্বাধনিতা পরবর্তী দারিদ্র পীড়িত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে দূর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে। খরা, বন্যা, জলোচ্ছাস, প্রভৃতি দুর্যোগ এ দেশটিকে বিপর্যস্ত করেছে বার বার। এছাড়াও প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পুনঃ পৌনিক সামরিক অভ্যুত্থান এদেশের অগ্রগতিকে বাঁধাগ্রস্ত করেছে। যার ফলে এখনো দেশটি নিম্নে আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত এবং দেশটির প্রধান সমস্যা পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য। এছাড়াও বাংলাদেশ এখনো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে যার মধ্যে রয়েছে বিস্তৃত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রতলে উচ্চতা বৃদ্দির ফলশ্রুতিতে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা।

শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নতির পথে রয়েছে। দেশ থেকে নিরক্ষতা দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা অব্যাহত আছে। এদেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৫৬.৭ শতাংশ।[২০] এখানে সাধারণ ও মাদ্রাসা এ দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সারাদেশে সরকারী বেসরকারী মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮২৯৮২টি, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৯০৮৩টি, মাদ্রাসা ৯০৫১টি, কলেজ ২৩০০টি, বিশ্ববিদ্যালয় ৯৩টি (সরকারী ৩৪ টি এবং বেসরকারী ৫৯টি), মেডিকেল কলেজ ৫৩টি এবং ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা ১২টি।[২১]

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ছাত্রীদের স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক।[২২] বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা University Grant Commission (UGC) বিশেষ তদারকি করে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ১টি সরকারী ও ২টি বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশের নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

---

১৮. S. Burke, *The post war Diplomacy of the indo-pakistani war of 1971,* Dhaka: Aisan Survey 12 (2), 1971, Pp.1036-1049

১৯. বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

২০. Ronald, *B. Bangladesh Grarments Aim to Complete,* London: BBC 2005, p. 256

২১. গোলাম মোস্তফা কিরন, *নলেজ পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২২. *ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী*, ২০১১-১২, ঢাকা: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থমন্ত্রনালয়, জুলাই-২০১২খ্রি., পৃ. i

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ৪৯.৮৩; ৫০.১৭ যা সংশ্লিষ্ট অঙ্গনে সাফল্যের বার্তা বহন করে।[২৩]

যোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলাদেশ একটি নদী মাত্রিক দেশ। এদেশের প্রাচীনতম যাতায়াত হিসেবে নৌপথকে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে মোট ৮৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নৌ পথ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থায় নদীপথ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তবে বহির্বিশ্বের সাথে যাতায়াত ব্যবস্থার সমুদ্রপথ ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের প্রধান দুইটি সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং মংলা সমুদ্র বন্দর।[২৪] এছাড়া জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে ৩৫৩৮ কিলোমিটার। আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪২৭৬ কিলোমিটার। বিভিন্ন প্রকারের সংযোগ সড়ক (ফিডার রোড) রয়েছে ১৩৪৮৫ কিলোমিটার অর্থাৎ সড়ক পথের মোট দৈঘ্য ২১২৭২ কিলোমিটার। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের দৈর্ঘ্য ২৮৩৫ কিলোমিটার।[২৫] দেশের জিডিপিতে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে জিডিপির খাত ওয়ারি অবদানে যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে অবদান ছিল ১০.৯১ শতাংশ।[২৬]

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশের ৭টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগে রয়েছে অনেকগুলো জেলা। বাংলাদেশের মোট জেলা রয়েছে ৬৪টি। উপজেলা ৪৮৫টি এবং প্রশাসনিক থানা ৬১৬টি। উপজেলাগুলো ৪৪৮৪টি ইউনিয়ন ও ৮৭৩১৯টি গ্রামে বিভক্ত। এ দেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন, যা কয়েকটি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে প্রশাসনে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই কিন্তু ইউনিয়নগুলোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রয়েছে। ১৯৯৭ খ্রি. আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলদের জন্য ২৫% আসন সংরক্ষিত।[২৭] এছাড়া শহরগুলোতে ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩১৪টি পৌরসভা রয়েছে যার সবগুলোতেই জনগণের সরাসরি ভোটে মেয়র ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়।[২৮]

সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক। দেশটির রাজধানী ঢাকা তবে বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয় চট্টগ্রামকে। রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা। দেশটির সরকার পদ্ধতি হলো সংসদীয় পদ্ধতি। এককক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট-এর নাম 'জাতীয় সংসদ' জাতীয় সংসদে ৩০০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকে। চতুর্দশ সংশোধনী অনুযায়ী ৪৫টি সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যবস্থা করা হয়।[২৯]

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫
২৫. সি.এম. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
২৭. ড. শামসুল আলম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের পরিচয়*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, মাধ্যমিক ভূগোল, ২০১১ খ্রি., পৃ. ৩১
২৮. ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যবলী ২১১-১২, প্রাগুক্ত, পৃ. iv
২৯. *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২৩৪-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

জলবায়ু

বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে সারা বছরকে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এ ৬টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। এখানে বছরে গড় বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০-২৫০০ মিলিমিটার, দেশের পূর্ব সীমান্তের যার মাত্রা ৩৭৫০ মিলিমিটার অধিক। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৫.৭° সেলসিয়াস।[৩০]

এখানকার আবহাওয়াতে নিরক্ষীয় প্রভাব দেখা যায়। নভেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত হালকা শীল অনুভূত হয়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে কোন কোন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়, টর্নোডো ও জলোচ্ছাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই আঘাত হানে।[৩১]

৩০. প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ২৩-৪০

৩১. গোলাম মোস্তফা কিরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামী শিক্ষার বিস্তার

মক্তব ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু

প্রত্যেকটি মসজিদের সঙ্গে একটি মক্তব বা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মহল্লা বা এলাকাবাসী ইচ্ছা করলে মসজিদ সংলগ্ন একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালু করতে পারেন এবং অত্র এলাকার শিশু কিশোরদের আদর্শ শিক্ষা দান করতে পারেন। এ ব্যাপারে মসজিদের ইমাম সাহেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। জুম'আ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে ওয়াজ নসীহতে আদর্শ শিশু-শিক্ষার উপর জোরালো আলোচনা করে মুসল্লীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

রাসুলুল্লাহ (সা:) বয়স্কদের লেখাপড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার সাথে সাথে শিশু শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। এর ফলে অনেক শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অবশ্য রাসূলের সময়ে প্রতিটি ঘর ছিল এক একটি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের তত্ত্বধানে শিশুরা ঘরে বসেও লেখা-পড়ার সুযোগ পেত। মসজিদে নববীতে দিনের বেলায় প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু-কিশোরদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং দিনের অন্যান্য সময়ে তা বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত।[৩২]

শিশু শিক্ষার প্রতি পবিত্র কুর'আনের নিম্ন বর্ণিত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ইসা ইবনে মরিয়ম! তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি অনুগ্রহ স্মরন কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে ও পরিণত বয়সে এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ প্রগাঢ় জ্ঞান তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখির প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে ফলে তা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী ইসরাইলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে,অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা বলল-এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নয়।[৩৩] পবিত্র হাদীসেও শিশু-শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে- عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلواة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع. "আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা থেকে (তিনি তার) পিতা বা আমরের দাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন তোমাদের সন্তানেরা যখন সাত বৎসর বয়সে উপনীত হবে তখন তাদেরকে নামাজের আদেশ দাও, দশ বৎসর বয়সে নামাজ আদায়ে শিথিলতা প্রদর্শন করলে শারীরিকভাবে শাস্তি দাও এবং তাদের জন্য পৃথক বিছানার ব্যবস্থা কর।"[৩৪]

---

৩২. মাও. শামছুল হক ফরিদপুরী, *মসজিদ ও জীবন্ড় মসজিদ*, ঢাকা: আল-আশরাফ প্রকাশনী, পৃ.৪০-৪২

৩৩. আল-কুর'আন, ৫:১১০

৩৪. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআছ, *সুনানু আবী দাউদ*, ৫ম খ, ঢাকা: রশীদিয়া লাইব্রেরি, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

বদরের যুদ্ধবন্দীদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে আচরণ করেছিলেন তা থেকেও শিশুদের শিক্ষাদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রামাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বদরের বন্দীদেরকে মদীনার শিশু–কিশোরদেরকে পড়ালেখা শিখানোর মোকাবেলায় মুক্তি দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সংগঠক হিসেবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। রাসূল (সা.) তাকে এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ দান করেন।

মক্তব ও মসজিদকেন্দ্রীক শিশুদের শিক্ষাকার্যক্রম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ হতেই শুরু হয়েছিল। এখনও তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বজায় আছে। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)ও শিশুদের লেখাপড়া শিক্ষাদানের ব্যাপারে গভীর আগ্রহী ছিলেন। ইসলামের এই ঐতিহ্যকে আরো জোরালো ভাবে গ্রহণ করে আমাদের বর্তমান সময়ের ইমামগণ শিশু শিক্ষায় আরও ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে পারেন। কারণ আজ যদি মক্তবের শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া হয় তবে লাখ লাখ কোমলমতি ছেলে- মেয়েরা ধর্মীয় প্রাথমিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে। যা অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম সমাজে চরম দূর্দশা নিয়ে আসবে। কেননা আজ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় গ্রাম-থেকে নিয়ে শহরে সর্বত্রই কোচিং শিক্ষার নামে যে সুদূর প্রসারী ইসলামী শিক্ষা বিমুখ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে করে আমাদের ছেলে-মেয়েরা ধর্মীয় প্রথমিক জ্ঞান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হচ্ছে। কেবল মাত্র যারা মাদ্‌রাসায় পড়া শুনার সুযোগ পাবে তারাই কেবল কুর'আন সহীহ শুদ্ধ ভাবে শিখার সুযোগ লাভ করবে। আর অন্য ছেলে-মেয়েদের জন্য কখনোই সহীহ শুদ্ধ ভাবে কুর'আন শিক্ষার সুযোগ থাকবেনা। যার ভয়াবহ পরিণাম আমাদের সমাজে পড়তে শুরু করেছে। তাই একজন ইমামকেক অত্যন্ত সচেতনতায় সাথে মক্তবের শিক্ষা ব্যবস্থা ধরে রাখতে হবে। তিনি সকালে ফজরের পর অথবা যোহর বা মাগরিব যে কোন একটি সময় বেছে নিয়ে তার মহল্লার প্রত্যেক মুছল্লীকে তাদের বাচ্চাদেরকে মক্তবে পাঠানোর ব্যাপারে জোর তাগিদ প্রদান করতে হবে।

যদি মক্তবের মাধ্যমে কোমলমতি ছেলে মেয়েদেরকে সহীহ শুদ্ধ ভাবে কুর'আন শিক্ষাসহ ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়গুলো শেখানো যায় তবে পরবর্তী জীবনে ধর্ম কর্মের প্রতি আগ্রহ কম থাকলেও সে অন্তত নাস্তিক হবে না। পক্ষান্তরে যদি ছোট বেলায় ধর্মীয় মৌলিক বিষয়গুলো শেখানো না যায় তবে ঐ শিশু নাস্তিকতাকে গ্রহণ করার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই সম্মানিত ইমাম সাহেবদের অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে মক্তব ব্যবস্থাকে যে কোন মূল্যে চালু রাখতেই হবে।

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা জাতীয় জীবনের জন্য শুধু অভিশাপই নয় বরং অন্যতম মহাপাপ।আল্লাহর আদেশ অমান্যজনিত পাপ। কেননা ইসলামের প্রথম আদেশ ছিল "ইকরা" অথাৎ পড়। কিন্তু আমরা জাতিগতভাবে তা অমান্য করে চলেছি। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি অন্যতম সমস্যা। সাধারণ অর্থে স্বাক্ষর জ্ঞানহীন অবস্থাকে বলে নিরক্ষরতা আর জ্ঞনের অভাবকে বলে অজ্ঞতা। অন্যভাবে বলা যায়, যে কোন ভাষায় চিঠিপত্র লিখতে পড়তে পারেনা তারাই নিরক্ষর আর অজ্ঞতা হল এমন একটি অবাঞ্চিত অবস্থা যার ফলে কোন জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

কার্যাবলী সম্পাদনে স্বজ্ঞান ও সচেতন আচরণ করতে অক্ষম ও উদাসীন এবং অসেচতন জীবন যাপনে অভ্যস্ত।[৩৫]

বহু শতক ব্যাপী নিরক্ষরতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত একটি জাতি তথা মানব সমাজকে নৈতিক শিক্ষার পবিত্র স্পর্শে সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে যে মহামানব এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। মানব জাতিকে উন্নত ও সভ্য করার লক্ষ্যে ওহীভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণে উজ্জীবিত করে এবং মননের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের যুগে জীবন ও আলোকের পতাকা উত্তোলন করার প্রয়াসে তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।[৩৬]

শিক্ষা মনুষত্ব বিকাশের অন্যতম মাধ্যম,আত্মোপলব্ধির চাবি-কাঠি,আত্ন-বিশ্বাস ও জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের দিক দর্শন, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর করণের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।নিশ্চয়ই কেবল ওহী ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমেই কাঙ্খিত শান্তি ও প্রগতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যা আরবের বুকে প্রচলন করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। এই শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপম দৃষ্টান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবায়ে কেরাম।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইরশাদ,

عن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبى يقول من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين وانما انا قاسم والله يعطى ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى امر الله.

হযরত ‘আব্দুর রহমান (র) বলেন, আমি মুয়াবিয়া (রা.) কে বক্তব্যরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো কেবল বিতরণকারী আল্লাহই দানকারী। সর্বদাই এ উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরুদ্ধাবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[৩৮]

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه اشد على الشيطان من الف عابد.

হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, একজন ফকীহ শয়তানের উপর একহাজার আবেদের চেয়েও গুরুতর।[৩৯]

নারী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু

প্রত্যেকটি মসজিদের সাথে একটি আদর্শ নারী শিক্ষা কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। মুসলিম নারীদের জীবন ব্যবস্থা সুন্দর করতে হলে অবশ্যই তাদের ইসলামের আদর্শিক জ্ঞান থাকতে হবে। ইসলামের জীবন

---

৩৫. আতিকুর রহমান, *স্নাতক সমাজকল্যান* (ঢাকা: কুর'আন মহল, ১৯৯০), পৃ. ২৭৪

৩৬. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, অনু. মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুলাই ১৯৬৯), পৃ. ৩

৩৭. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, *হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা: ৩য় সংখ্যা, জানু-মার্চ, ১৯৮৮), পৃ. ৩১৬

৩৮. সম্পাদনা পরিষদ, বুখারী শরীফ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি., হাদীস নং ৭১, পৃ. ৫৮

৩৯. সম্পাদনা পরিষদ, তিরমিযী শরীফ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৬৪ খ্রি., হাদীস নং ২৬৮১, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে সে আলোকে তারা সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। মানব জাতির নতুন প্রজন্মকে আদর্শ মানুষরুপে গড়ে তোলার সুমহান কর্তব্য অর্পিত হয়েছে নারী জাতির উপর। তারা যেন তাদের এই কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সেজন্য তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা জরুরি। নারী জাতির নিকট ইসলামকে উপস্থাপন করার কাজ নারীদের দ্বারাই সম্ভব। নারীরা পারেন অপরাপর নারীর সাথে মিশতে, ঘনিষ্ঠ হতে এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে।

মহিলা শ্রোতাগণ একজন মহিলা আলোচককে নিঃসংকোচে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করে যে কোন বিষয়ে স্বচ্ছতা অর্জন করতে পারেন। তাই নারী শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুনিয়ায় যতদিন ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন পুরুষ ও নারী উভয়ে শিক্ষার আলোতে আলোকিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-"হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা এবং ব্যভিচার করবেনা, তাদের সন্তানদের হত্যা করবেনা, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপনি গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবেনা এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্য হবেনা। তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল"।[৪০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও শিক্ষা দিতেন। বুখারী শরীফের হাদীস থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবার মুবারক সব সময় লোকে লোকারন্য থাকত। শিক্ষা লাভে তাঁর কাছে মহিলাদের আগমনে এটা ছিল বড় বাধা। তাই মহিলা সাহাবাগণ শিক্ষা লাভের জন্য তাঁর কাছে পৃথক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে আবেদন জানায়।

মহিলাদের এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের জন্য একটি আলাদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সময়টিতে তিনি কেবল মহিলাদেরকে শিক্ষা দিতেন। শুধু নিজে মহিলাদেরকে শিক্ষা দিতেন তাই নয় বরং অন্যান্য শিক্ষিত মহিলাদেরকে তিনি এ কাজে উৎসাহিত করেছেন।

নারীদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি অভিভাবকদেরকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। শুধু আযাদ বা স্বাধীন মহিলারাই নয়, ঘরের দাসীকেও শিক্ষাদানের জন্য তাঁর উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়,যা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। তিনি ঘরের দাসীদের শিক্ষাদানে উৎসাহ প্রদান করে বলেন, তিন ধরণের লোকের জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে: (১) ঐ আহলে কিতাব যে তার নবীর উপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ (সা.) এর উপরও ঈমান এনেছে।(২) যে ক্রীতদাস মনিবের হক আদায় করার পাশাপাশি আল্লাহর হকও আদায় করে।(৩) ঐ ব্যক্তি যার একটি বাঁদী ছিল তার সাথে সে মিলিত হত তারপর তাকে আযাদ করে প্রয়োজনীয় আদব কায়দা শিক্ষা দেয়, অতঃপর বিয়ে করে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব।[৪১]

---

৪০. *আল-কুর'আন*-৬০:১২

৪১. মাও. শহীদুল ইসলাম, *মসজিদে নবুবী (সা.)-এর কার্যক্রম ও ইমামদের ভূমিকা*, ঢাকা: আল-কুর'আন গবেষণা সেন্টার, ২০০২ খ্রি., পৃ. ৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

এক আনসারীর বাড়িতে সমবেত মহিলাদেরকে দ্বীনি তালিম দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে পাঠান। তিনি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখেন।[৪২]

সাধারণভাবে সাহাবীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ ছিল তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনের নিকট যাও, তাদের মাঝে বসবাস কর, তাদেরকে শিক্ষা দাও এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে তাদেরকে নির্দেশ দাও।[৪৩]

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে বেশ কয়েকজন বিদুষী মহিলার দেখা পাওয়া যায়। এসব শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে হযরত আয়িশা (রা.)-এর নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি কুর'আন, হাদীস, ইসলামী আইন ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ঠ পারদর্শী ছিলেন। যে আটজন সাহাবী (রা.) সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন আয়িশা (রা.) তাদের মধ্যে অন্যতম। শিক্ষাদানের কাজে তাঁর অবদান ইতিহাসে স্বর্নাক্ষরে লিখা রয়েছে। তিনি নিজ গৃহে মহিলা সাহাবাদের পড়াতেন। তাঁর মজলিসে বহু সংখ্যক মহিলা সাহাবী (রা.) শিক্ষা লাভ করতেন বলে জানা যায়। অনেক পুরুষ সাহাবী (রা.) ও তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৪]

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর মতে হযরত আয়িশা (রা.) ২২১০ টি হাদীস বর্ণনা করেন।এর মধ্যে ৫৪ টি বুখারী, ৩৭টি মুসলিম এবং ১৯২০টি মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে স্থান পেয়েছে। হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মীতায় অসাধারণ। বাগ্মী হিসেবে হযরত আয়িশা (রা.)-এর সবিশেষ খ্যাতি রয়েছে। দেশ-বিদেশ হতে লোকজন তাঁর বাণী শোনার জন্য মদীনা আগমন করতেন। হযরত আয়িশা (রা.)-এর বাগ্মীতা সম্পর্কে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মন্তব্য করেছিলেন, আয়িশা অপেক্ষা বড় বাগ্মীর বাকচাতুর্য আমি কখনও শ্রবন করিনি।[৪৫]

হযরত যয়নব বিনতে আলী (রা.) ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক দর্শনের উপর শ্রুতিমধুর বক্তৃতা করতেন। হযরত ফাতিমা বিনতে আব্বাস (রা.) অত্যন্ত জ্ঞানী মহিলা ছিলেন।তিনি মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করে ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিকের উপর সুদীর্ঘ মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করতেন।[৪৬]

ইসলামের সেই হারানো গৌরব পূনরুদ্ধার করে বর্তমান যুগের মহিলাদেরকেও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। কারণ মহিলারা হল মায়ের জাতি। আর একটি শিশুর সবচেয়ে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল তার মা । কাজেই মা যদি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হন তবে সন্তানও তার মায়ের কাছে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা লাভে সক্ষম হবে। তাই মায়েদের

---

৪২. কাজী আবূ হুরায়রা, *মসজিদ পরিচালনা পদ্ধতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলদেশ, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২৬

৪৩. এ. জেড. এন. শামসুল আলম, *মসজিদ পাঠাগার*, ঢাকা: ইলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রি. পৃ.২৬

৪৪. মাহমুদ জামাল, *প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠন একটি প্রস্ড়বনা*, রাজশাহী, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ৪৭

৪৫. *Islam in Bangladesh through Ages*, Dhaka: Islamic Foundation of Bangladesh, Baitul Mukarram, July-1995. p.23

৪৬. কাজী আবু হুরায়রা প্রাগুপ্ত পৃ.২৭

Dhaka University Institutional Repository

জন্য ইসলামী শিক্ষা লাভ করা অনস্বীকার্য। সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ দৈনন্দিন ওয়াজ নসীয়তের মাধ্যমে মহিলাদের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে তাদেরকে উৎসাহী করে তুলতে পারেন। পাশাপাশি তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি মসজিদের পাশে কোন এক মুসল্লীর বা তার নিজ বাসায় নারীদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ ইমামদের স্ত্রী কিংবা মেয়ে আলিমা তিনি তাদের মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষা চালু করবেন, যিনি সেখানে শিক্ষাদান করবেন তারও একটি আর্থিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও হতে পারে। এভাবে তিন লক্ষ ইমাম যদি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন তবে আমাদের সমাজের বয়স্ক মা-বোনেরা দ্বীনি শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করবে।

মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

প্রত্যেকটি মসজিদে একটি পাঠাগার থাকা জরুরি। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, নবী-রাসূলগণের জীবনী, সাহাবা চরিত, মাস'আলা-মাসায়িল, নৈতিক চরিত্র গঠন প্রভৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ মসজিদ পাঠাগারে থাকা প্রয়োজন। এলাকার মুসল্লীগণ এ গ্রন্থসমূহ মসজিদ পাঠাগারে এসে পাঠ করবেন। প্রয়োজনে বই বাড়িতে নিয়ে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বইটি মসজিদ পাঠাগারে ফেরত দেবেন। এজন্য মসজিদ সংলগ্ন আলাদা কক্ষ থাকলে ভাল হয়। সেখানে পাঠকদের জন্য বসার সুযোগ-সুবিধা থাকবে। আর যদি তা না হয় তাহলে মসজিদের ভেতর আলমারিতে বই রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য একজন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দেয়া যেতে। ইমাম, মু'আযযিন, বা মহল্লার লোকদের মধ্য থেকে এ কাজটি করা যায়। এ পাঠাগারটি পরিচালনার জন্য একটি সাব-কমিটি করা যায়–তবে এ কমিটির মসজিদ কমিটির কাছে জাবাবদিহিতা থাকবে।

বাংলাদেশে প্রায় ৩ লক্ষ মসজিদ আছে। মুসলিম জনগণ স্বেচ্ছায় এ সকল মসজিদ নির্মাণ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ জায়গা সিজদা ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং খুলাফা রাশিদীন মসজিদে বসেই কাজ করতেন। একটি গ্রন্থাগারে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি থাকার দরকার হয়। মসজিদে বই-পড়ার অভ্যাস করলে চেয়ার-টিবিলের ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়।[৪৭] এভাবে সহজেই মহল্লার লোকজন মসজিদে এসে বই পড়তে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের ইসলামিক ফাউন্ডেশন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যেক মসজিদেই এর অনুকরণ করা যায়। আর যদি স্থান ছোট থাকে তবে ছোট করে লাইব্রেরি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজন ইমাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

৪৭. এ. জেড. এন. শামসুল আলম প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৯৮৩, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃ. (চার)।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইমামগণের ভূমিকা

সন্ত্রাস দমন

ইসলাম শান্তির ধর্ম। অন্ধকার যুগের ইতিহাসকে মুছে দিয়ে পৃথিবীর বুকে শান্তি ও নিরাপত্তার যে অধ্যায় প্রায় ১৫'শ বছর আগে ইসলাম রচনা করেছে। আজকের পৃথিবীতে তার আবেদন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। নিঃশেষ হয়নি তার বিমল আদর্শের প্রয়োজনীয়তা। কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বে তা কখনো হবেও না। সেজন্যই ইসলাম স্বীকৃতি পেয়েছে একটি সর্বকালীন ও সার্বজনীন ধর্ম হিসেবে। তাই সময়ের চাহিদা মেটাতে ও যুগ সমস্যার সমাধানের বিধান হিসেবে ইসলামের কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় সন্ত্রাস। সন্ত্রাসের ভয়াল থাবা আজ বিশ্বকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ফেলেছে। অন্যায়-অত্যাচারের প্রত্যক্ষ মদদকারী হিসেবেই সন্ত্রাসী শক্তি বিশ্ববুকে ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার নরক রাজ্য কায়েম করে চলেছে। নির্বিচারে হত্যা, রক্তারক্তি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা সহ বিশ্বে অস্থিরতার এমন কোন দিক নেই যা সন্ত্রাসী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত হচ্ছেনা। কোন জনকল্যাণ মূলক পদক্ষেপ বা মঙ্গলকামী কোন উদ্যোগ যখনই সন্ত্রাসবাদীদের স্বার্থে আঘাত হানছে তখনই সেসবের টুটি চেপে ধরতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করছেনা তারা। মুসলমানদের সন্ত্রাসী সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের চেষ্টারও কোন ত্রুটি নেই। অথচ ইসলাম কখনোই সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয়না। বরং ইসলামই সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করে মানব সমাজে শান্তি ও স্বস্তির হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে। ইসলামের অস্তিত্বের সাথেই শান্তির কথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তেমনি তা বিশ্বের শান্তি বজায় রাখতেও বদ্ধ পরিকর। সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্বগঠনে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম এমন এক ব্যাপক ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি স্থাপন করে যেখানে জাতি, গোষ্ঠী , বর্ণ বা সামাজিক পেশা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে। যেখানে পিতার প্রতি পুত্রের, পুত্রের প্রতি পিতার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, চাকরের প্রতি মনিবের, মনিবের প্রতি চাকরের, একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের যাবতীয় হক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করা হয়। অথাৎ কারো হক কারো দ্বারা লঙ্গিত হওয়ায় কোন সুযোগ নেই। নিজের শান্তি অজর্নের পাশাপাশি অন্যের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ঈমানী দায়িত্ব। সুতরাং এখানে কেউ তার নিজ স্বার্থের জন্য অন্যের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারবে না। প্রকৃত প্রস্তাবেই ইসলাম সন্ত্রাস নির্মূলে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সন্ত্রাস প্রতিরোধে পবিত্র কুর'আনের কতিপয় নির্দেশনা নিম্নে প্রদান করা হল:

দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তাঁহাকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।[৪৮]

৪৮. আল-কুর'আন, ৭:৫৬

Dhaka University Institutional Repository

যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।[৪৯]

মানুষের কতৃকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কার্মের শাস্তি তিনি ভোগ করান যাতে তারা ফিরে আসে।[৫০]

যখন সে ফিরে আসে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু ধ্বংসের চেষ্টা করে। আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।[৫১] এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল; অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত করলেন।[৫২]

তাদেরকে যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছে তোমরাও সেখান থেকে তাদেরকে বের করবে। ফিতনা হত্যর চেয়ে ঘৃণ্য। মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটাই কাফেরদের পরিণাম।[৫৩]

তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর যা শুধু যালিমদেরকেই আক্রান্ত করবে না, জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[৫৪] তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।[৫৫]

যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[৫৬]

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায় সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন কর, লোকদের তাদের প্রাপ্ত কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে না।[৫৭] একজন ইমাম পবিত্র কুর'আনের এ সকল আয়াতের শিক্ষা মানুষকে প্রদান করে সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তির বিলোপ সাধন

ইসলামে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য ও মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে স্থায়ীভাবে হারাম। কুর'আন ও সুন্নাহ ইসলামের এই দুটি উৎসই অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এই কথা ঘোষণা করেছে। এবং রাসূলে কারীমের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। কোন ইসলাম বিশেষজ্ঞই এক

৪৯. আল-কুর'আন, ১৩:২৫
৫০. আল-কুর'আন, ৩০:৪১
৫১. আল-কুর'আন, ০২:২০৫
৫২. আল-কুর'আন, ৮৯:১২-১৩
৫৩. আল-কুর'আন, ০২:১৯১
৫৪. আল-কুর'আন, ০৮:২৫
৫৫. আল-কুর'আন, ০২:১১
৫৬. আল-কুর'আন, ০২:২৭
৫৭. আল-কুর'আন, ১১:৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বিন্দু ভিন্নমত প্রকাশ করেননি। দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন মতভেদও সৃষ্টি হয়নি। মোট কথা, মাদক দ্রব্য মাত্রই হারাম । পবিত্র কুর'আন ও হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। আর কারণও সাথে সাথে বিবৃত হয়েছে। তা হচ্ছে ঐই নেশাকারী জিনিস যা মানুষের পরস্পর চরম শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকেও মানুষকে বিরত রাখে। অন্য কথায় নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে যেমন সাধারণভাবে আল্লাহকে স্মরণ করা বা স্মরণে রাখা সম্ভব হয়না। তেমনি স্মরণের বিশেষ অনুষ্ঠান যেমন সালাত তা রীতিমত আদায় করাও তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব থেকে যায়। অথচ তা কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারেনা। আল্লাহই যখন সমগ্র বিশ্বলোক ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র মাবুদ তখন সাধারণভাবে সব সময় তাকে স্মরণ করতে হবে। এবং তাকে স্মরণের জন্য যেসব অনুষ্ঠান তারই কর্তৃক নিধারিত তাও যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এ পথে কোন বাধা বাঞ্চনিয় নয়। এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কারী সব আড়াল উৎপাটিত করাই আল্লাহর বান্দাদের কর্তব্য। কিন্তু নেশা বা মাদকদ্রব্য এ কাজের প্রধান বাধা দানকারী। অতএব তার ব্যবহার সম্পুর্ণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সংশয় থাকতে পারে না।[৫৮]

এ সম্পর্কে কুর'আন মাজীদে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এর পাপ উপকার অপেক্ষা বেশি। লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যায় করবে? বল, যা অতিরিক্ত, এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান তোমাদের স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, যেন তোমরা চিন্তা কর।[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। যতক্ষণনা তোমরা যা বল তা বুঝতে পার। যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয় যে পর্যন্ত না গোসল কর। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আস অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হও, এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে, তথা মুখমণ্ডল ও হাত মাছাহ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।[৬০]

মহান আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেন, হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর– যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দিয়ে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না।[৬১]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. সকল নেশার জিনিসই মাদক এবং সকল নেশার জিনিসই হারাম।[৬২]

---

৫৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জুন ১৯৯১, পৃ-২৩৯

৫৯. আল-কুর'আন, ০২:২১৯

৬০. আল-কুর'আন, ০৪:৪৩

৬১. আল-কুর'আন, ০৫: ৯০-৯১

৬২. *নাসায়ী*, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন- নবী (সা.) বলেছেন, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما اسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. সব নেশার জিনিসই হারাম। আর যার সামান্য পরিমাণ ও মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।[৬৩]

মাদক সম্পর্কে হযরত উসমান (রা.) বলেছেন, اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. তেমরা সর্ব প্রকারের মাদক পরিহার কর। কেননা তা হচ্ছে সর্ব প্রকার পাপ কাজের উৎস।

জনৈক আরব কবি মাদক দ্রব্যর ক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, شربت الخمر حتى ضل علقلى، كذلك الخمر تفعل بالعقول. আমি মাদক দ্রব্য পান করেছি ফলে আমার বিবেক বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে। আর মাদকদ্রব্য মানেই বিবেক বুদ্ধির সাথে এরূপ আচরণই করে থাকে।

ইসলাম শুধু যে মদ্যপান হারাম করেছে তাই নয়, মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসায় তথা মদ্যকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হয় বা করার প্রয়োজন হয়, তার সব কিছুকেই সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। হযরত ইবনে উমর (রা.) রাসূলে কারীম (সা.)-এর এই হাদীসটির বর্ণনা পেশ করেছেন, তিনি বলেন- لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وباعيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها الحمولة اليها. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন-মদের উপর 'মদ্যপায়ীর উপর, মদ্য পরিবেশনকারীর উপর, তার ক্রয়কারীর উপর, তার বিক্রেতার উপর, তার উৎপাদন কাজের উপর, তার উৎপাদন যে করায় তার উপর, তার বহনকারীর উপর এবং তা যার জন্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার উপর।[৬৪]

ইমাম কুরতবী বলেছেন- মদ্যপায়ী বুদ্ধিমান লোকদের জন্য হাস্যরসের পাত্র হয়। সে মাতাল হয়ে স্বীয় মলমূত্র নিয়ে খেলা করে। তা নিজের চোখে মুখে মাখে। অনেক সময় মূত্র মুখে মাখতে গিয়ে সে ওযু করছে মনে করে ওযুর দোয়া পড়তে শুরু করে। কুকুরও তার মুখ চাটে কখনও ,আর সে কুকুরের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তোমাকে সম্মান দান করুন। মদ্যপানে যেমন বিবেক বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়, তেমনি স্বাস্থ্যও নষ্ট হয়ে যায়।[৬৫]

মদ্যপায়ীর শাস্তি

মদ্যপান ইসলমী শরীয়াতের দৃষ্টিতে একটি কঠিন গুনাহ এবং ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য। এজন্য শরীয়ত অনুযায়ী শাস্তি দান একান্তই কর্তব্য। কিন্তু কুর'আন মাজীদে এর কোন শাস্তির উল্লেখ নেই। তবে ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, মদ্যপায়ীর শাস্তি হচ্ছে দোররা। দোররার সংখ্যা কয়টি হবে তা নিয়ে ইমামদের মাঝে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে হানাফী মাযহাব অনুসারে এর সংখ্যা হবে আশিটি। এ ব্যাপারে তাদের দলীল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস হলো:

عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم ضرب فى الخمر بالجرير والنعال وجلده أبو بكر اربعين.

৬৩. *আবূ দাউদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫
৬৪. *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২
৬৫. *আল-জামিয় লি আহকামিল কুর'আন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২

Dhaka University Institutional Repository

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শরাব পান করার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত এবং জুতা মেরেছেন। আর আবূ বকর (রা.) চল্লিশটি করে বেত্রাঘাত করেছেন।[৬৬]

عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم انه اتى برجل قد شرب الخمر فصربه بجريدتين نحو الاربعين وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحود ثمانين فامربه عمر.

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল। সে মদ পান করেছিল। তখন তিনি তাকে দুইটি খেজুর ডাল দিয়ে চল্লিশ ঘা মারেন। পরবর্তীতে আবু বকর (রা.)ও তা করেন। 'উমর (রা.) যখন খলীফা হলেন তখন এই বিষয়ে তিনি লোকদের সাথে পরামর্শ করেন। 'আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ বলেন, সর্বনিম্ন দুররা হল আশি দুররা মারা। তখন 'উমর (রা.) এ সংখ্যক হদ কার্যকর করেন।[৬৭]

পরে হযরত উমর (রা.) এই দণ্ডই কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করলেন। বর্তমানে আমাদের সমাজে মাদক দ্রব্যর যে প্রার্দুভাব লক্ষ্য করা যায় তা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ তাই যা হযরত উমর (রা.) করেছিলেন। তাই আমাদের মসজিদসমূহের সম্মানিত ঈমামগণের দায়িত্ব হল মানুষকে মাদক দ্রব্যের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করা এবং এর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা মুসল্লীদের সাথে নিয়ে গ্রহণ করা।

যৌতুক প্রথার বিস্তার রোধ

মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা, বংশ বৃদ্ধি এবং পারিবারিক জীবন বিনির্মাণে নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবন অপরিহার্য। এই দাম্পত্য জীবনকে সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ এবং বংশধারার যথাযথ হেফাজত ও সংরক্ষনের জন্য বিবাহ বন্ধন অপরিহার্য। বিবাহ প্রথা মানব জাতির মতই সুপ্রাচীন। আদি পিতা হযরত আদম এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া (আঃ) এর মধ্যে মহান আল্লাহ জান্নাতে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করে ছিলেন তারাই ছিলেন আদি মানব দম্পতি। তখন থেকে অদ্যাবধি এই বিবাহ প্রথা চালু আছে।[৬৮]

যুগ-যামানা, জাতি-বর্ণ ভেদে বিবাহের মধ্যে বিভিন্ন কু-প্রথা চালু ছিল এবং বর্তমানেও আছে। বিবাহের মধ্যে যেসব কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এর মধ্যে যৌতুক প্রথা হচ্ছে অন্যতম। মূলত যৌতুক হল "কন্যার পিতামাতা, অভিভাবক বা আত্মীয় স্বজনের নিকট হতে বিবাহের বিনিময়ে শর্ত করে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ , গাড়ী-বাড়ী, রেডিও টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি কোন কিছু আদায় করা।"

২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন আনুযায়ী যৌতুকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "বিয়ে উপলক্ষে বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছ থেকে বিয়ের আগে, বিয়ের সময় বা বিয়ের পরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শর্তারোপ বা দাবী করে যেসব অর্থ-সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ বা অন্য কিছু আদায় করে তাকেই যৌতুক বলে।"

---

৬৬. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, ১০ম খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি., হাদীস নং ৬৩১৬, পৃ. ২০৮

৬৭. সম্পাদনা পরিষদ, *তিরমিযী শরীফ*, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি., হাদীস নং ১৪৪৯, পৃ. ৮৬

৬৮. মুহাম্মদ সিরাজুল হক সম্পাদিত, *যৌতুক ও ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট ২০০৪, পৃ-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত এভাবে শর্তারোপ করে কনে পক্ষের নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত ও হারাম। কেননা কুর'আন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস তথা শরীয়াতের দলীলসমূহের কোথাও এর বৈধতার প্রমাণ বিদ্যমান নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় নিজের চার কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন এবং বহু সাহাবী ও সাহাবিয়ার বিবাহ তাঁর উপস্থিতিতে সম্পাদিত হয়েছে। কোথাও যৌতুকের লেন-দেন হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনিভাবে খুলাফায়ে রাশিদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগেও এই কুপ্রভাবের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। চার মাযহাবের ইমামগণের কারো থেকেই এরূপ করার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৬৯]

যৌতুকের এই কুপ্রথা বর্তমানে আমাদের সমাজে একটি মারাত্মক আর্থ-সামাজিক ব্যাধিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজ দেহের জন্য এটি একটি মারাত্মক ক্যানসার। এমনিভাবে এটি একটি সামাজিক অভিশাপও বটে। প্রকৃতভাবে যৌতুক হচ্ছে যুলম ও শোষণের হাতিয়ার। কেননা যৌতুক প্রদানের অসমর্থতার কারণে অনেক সময় বিবাহ প্রদান অসম্ভব হতে পারে। যৌতুকের দাবীতে নিরীহ মহিলাদের উপরে অমানবিক ও অকথ্য নির্যাতনের স্টীমরোলারও চালানো হয়ে থাকে। এমনকি হত্যাকান্ড পর্যন্তও ঘটার সংবাদ অহরহ শোনা যায় এই অভিশপ্ত যৌতুক আদায়ের অক্ষমতার কারণে। অথচ যুলুম সম্পর্কে কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে- "তোমরা যুলুম করবেনা এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবেনা।"[৭০]

মূলত টাকা পয়সা ধন-দৌলত, সোনা গহনা কখনো বিবাহ শাদীর উদ্দেশ্য নয়। বিবাহ শাদীর মূল উদ্দেশ্য হল, কোন সতী-সাধ্বী দীনদার মহিলার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার হতে নিজেকে রক্ষা করা। ঈমানদার সন্তান লাভ করা, মানব বংশধারা সংরক্ষণ করা এবং ঘর-সংসার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. সাধারণত চারটি বিষয় বিবেচনা করে কোন নারীকে বিবাহ করা হয়।

(১)তার অর্থ সম্পদ
(২)তার বংশ মর্যাদা
(৩)তার রূপ সৌন্দর্য ও
(৪)তার দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়।

সুতরাং তোমরা দীনদার মহিলাকে বিবাহ করার চেষ্টা করবে। তোমর উভয় হাত ধূলায় ধুসরিত থাক (যদি তুমি ভিন্ন কোন কিছু কামনা কর)।[৭১]

যে বিবাহে খরচ কম হয় সে বিবাহকে বরকতময় আখ্যায়িত করা হয়েছে, ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة. অর্থাৎ "সর্বাপেক্ষা বরকতময় হল ঐ বিবাহ যা কম খরচে নির্বাহ করা হয়।"

---

৬৯. প্রাগুক্ত পৃ-৭৭
৭০. আল-কুর'আন, ২:২৭৯
৭১. আলণ্ঢামা ওলীউদ্দীন, *মিশকাত শরীফ*, অনু. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৭, হাদীস নং ২৯৪৮

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুক লোভী স্বামীর সংসারে কখনো শান্তি আসেনা। একবার যৌতুক পাওয়ার পর বারবার তা পাওয়ার জন্য সে পাগলের মত উদ্ভট আচরণ করতে থাকে। এতে সোনার সংসার নরককুণ্ডে পরিণত হয়ে যায়। এ জাতীয় সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে যৌতুক নেওয়া দেওয়া সবই হারাম। এতে দীন-দুনিয়া ধ্বংসের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক অনেক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। কাজেই শর্তারোপের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে কোন কিছুই গ্রহণ করা কোন মুসলমানের জন্যই জায়েজ নয়। তাই এর থেকে সকলেরই পরহেয করা উচিৎ। তাই আমাদের মসজিদ সমূহের সম্মানিত ঈমামগণের দায়িত্ব হল মানুষকে যৌতুকের এই কুপ্রথার ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করা এবং এর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা মুসল্লীদেরকে নিয়ে গ্রহণ করা।

বিবাহ বিচ্ছেদ রোধ

মানুষ সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত। তাই মানুষের জীবন প্রণালী, চাল-চলন, আচার ব্যবহার, জ্ঞান-বুদ্ধিও অন্যান্য জীবের চেয়ে সেরা ও উন্নত। মানুষের আছে পরিবার পরিজন যা অন্য জীবের নেই। আর মানুষের এই পরিবার গঠন করতে দরকার হয় বিবাহ। বিবাহ হচ্ছে ইসলাম ধর্মে একটি অতি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ পুণ্যের কাজ ও পবিত্র বন্ধন। ইসলাম এই পবিত্র বন্ধনকে অটুট ও চিরস্থায়ী রাখার পক্ষপাতী। যদিও প্রয়োজনে ইসলাম তালাকের অনুমতি প্রদান করে কিন্তু তা খুবই গর্হিত কাজ বলে মনে করে এবং এটাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। এই জন্য ইসলাম বিবাহপূর্ব ও বিবাহোত্তর এমন কতগুলো বিধিবিধান ও রীতি-নীতি চালু করেছে যা বিবাহ বন্ধনকে চির অটুট রাখতে সহায়তা করে।

ইসলাম বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় কুফু তথা ধর্ম, বংশ, অর্থ-বিত্ত, সামাজিক মান মর্যাদা,খ্যাতি, পেশা, শিক্ষা-দীক্ষা, দীনদারী, চিন্তা-চেতনা,কৃষ্টি-কালচার, গোত্রধর্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রে যাতে পরস্পর সমপর্যায়ের হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে উৎসাহিত করেছে। কারণ বিবাহোত্তর দাম্পত্য জীবন সুখী ও শান্তিময় করার জন্য পাত্র-পাত্রীর সমতা খুবই জরুরি। পাত্র-পাত্রীর সমতা দাম্পত্য জীবনে অনাবিল প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রেম-ভালবাসা ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস এবং মিলই পারে দাম্পত্য জীবন তথা বিবাহ বন্ধনকে অটুট রাখতে, চিরস্থায়ী করতে।

ইসলাম বিবাহ বিচ্ছেদকে একটি অপছন্দনীয় এবং ঘৃণিত কাজ মনে করে। তবে এর প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে অস্বীকার করেনা। মানুষের মন সব সময় একই আচরণ করেনা। মাঝে মধ্যে এমন সব আচরণ করে, যা শত চেষ্টা করেও নিবৃত বা নিয়ন্ত্রন করা যায় না। কোন কারণ ছাড়াই কারো প্রতি অধিক অনুরাগও বিরাগ হতে থাকে। এসব কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা যায় দ্বন্ধ ও সংঘাত; হয়ে উঠে ত্যক্ত-বিরক্ত, সৃষ্টি হয় বিষাক্ত পরিবেশ, দাম্পত্য জীবনে মিল-মিশের সব ধরণের চেষ্টা-তদবীর যখন ব্যর্থ হয় তখনই কেবল নিরুপায়ের উপায় হিসেবে তালাককে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق.

মুহারিব (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে তালাকের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কোন বিষয় নেই।[৭২]

عن ابى عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق.

ইব্ন উমর নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় তালাক।[৭৩]

তালাক চাই তা ধনীর মধ্যে হোক কিংবা দরিদ্রের মধ্যে, শিক্ষিতের মধ্যে কিংবা মূর্খের মধ্যে প্রথমেই এর অভিশাপ গিয়ে পড়ে সেই দম্পতির সন্তানদের উপর। আর এই সন্তানরা যদি হয় ছোট ও গরিব তবে তার পরিণতি হয় ভয়াবহ ও নির্মম।

অন্যদিকে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ ধনী বা স্বাবলম্বী হলেও তাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। তালাকপ্রাপ্তা নারীরা আশ্রয় নেয় পিতা-মাতা, ভাই বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের নিকট। এই ধরণের আশ্রয়ের কারণে তারা আশ্রয়দাতার নিকট বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আশ্রয়প্রার্থী দরিদ্র শ্রেণীর হলেতো এর পরিণাম হয় আরো ভয়াবহ। এতে বৃদ্ধি পায় লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও সামাজিক অনাচারের মত জগণ্যতম অবস্থা।

তাই একজন ইমামই পারেন বিবাহ বিচ্ছেদের এই ভয়াবহ পরিণামের কথা তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করে তুলতে এবং প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্ধ নিরসনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। যার ফলশ্রুতিতে সমাজ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের মত ভয়াবহ জগণ্যতম কাজটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

দারিদ্র সমস্যা ও তার সমাধান

ইসলামের দৃষ্টিতে সাহেবে নিসাব নয়, এমন সকল ব্যক্তিই দরিদ্র। ইসলাম স্বীকৃত মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম ব্যক্তিগণই দরিদ্র। ইসলাম দরিদ্রতাকে পছন্দ করে না। দারিদ্রের ভয়াবহ পরিণাম উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "দারিদ্র্য অন্তরকে কঠোর করে দেয়।"[৭৪]

দারিদ্র্যের অপকারিতা বর্ণনা করে রাসূল বলেন, "দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের পর্যায়ে নিয়ে যায়।"

কুর'আনের আয়াত ও হাদীসে নববীর মাধ্যমে দারির্দ্র সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা পাওয়া গেল তাতে দারিদ্র্য থেকে বেঁচে থাকা সকল মুসলমানের জন্যই জরুরি।

দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মসজিদের একজন ইমামের পক্ষে সমাজকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করা অমূলক না হলেও অবাস্তব বিষয়। তিনি দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত করা ছাড়া খুব সামান্যই অবদান রাখতে পারবেন। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশের প্রায়

---

৭২. সম্পাদনা পরিষদ, *আবূ দাউদ*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হাদীস নং ২১৭৪, পৃ. ১৭১

৭৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২১৭৫, পৃ. ১৭১

৭৪. আল-কুর'আন, ৬:৪৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধেকেরও বেশী মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন। মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে ইসলাম প্রদর্শিত পথেই কেবল দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব। তাই এদেশের দারিদ্র বিমোচনে নিম্নোক্ত তিনটি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। যথা- (ক) যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করা।

(খ) বাধ্যতামূলক সাদাকাহ ও ঐচ্ছিক দানের যথাযথ ব্যবহার।

(গ) সহায়ক কতিপয় পদক্ষেপ বাস্তবায়ন।

ক. যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার চালু

যাকাত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদাত। পবিত্র কুর'আনে বিরাশি বার বলা হয়েছে নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। যাকাত হল ধনীদের ধন-সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন এবং আল্লাহর রহমতের আশায় দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দারিদ্র্য দূরীকরণের চেষ্টা করা হয় ।

যাকাত একটি শরীয়তভূক্ত কর। পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াতেই যাকাত প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। বিখ্যাত অভিধান রচিয়তা রাগীব বলেন, যাকাত হচ্ছে ধনীর নিকট হতে সংগৃহীত দরিদ্রকে প্রদত্ত অর্থ। ধর্মপ্রাণ সুলতান ফিরোজ তুঘলক যাকাতকে নিয়মিত কর হিসেবে গণ্য করেন। তিনি যাকাত-রাজস্ব পৃথক কোষাগারে জমা রাখতেন।

যাকাত একদিকে মানুষের ধনসম্পদের প্রতি লোভ, স্বার্থপরতা ও সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রবৃত্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে অন্যদিকে সমাজের অক্ষম ও বিত্তহীনদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বিত্তবানদের সচেতন করে। যাকাতের মাধ্যমে সমাজের সামগ্রীক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন হয় এবং নিঃস্ব ও দরিদ্রদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। যাকাত অর্থনৈতিক দুর্দশায় নিপতিত ব্যক্তিদের জন্য একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় গরীব দুঃখিরা দরিদ্র্যতার কষাঘাত থেকে অনেকটা মুক্তি পায়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে।[৭৫]

যাকাতের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হতে না দেয়া। ইসলাম সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যকে শুধু অপছন্দই করেনা বরং তা নির্মূল করার কথাও বলে। তাই একটি সুখী ,সুন্দর ও উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিশ্বের মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটি অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দুর্দশা মোচনের জন্য ব্যয় করতে হবে। এর ফলে শুধু অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার কল্যান হবেনা, বরং সমাজে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে ও বৈষম্য হ্রাস পাবে।

খ. বাধ্যতামূলক সাদাকাহ ও ঐচ্ছিক দানের ব্যবহার

সমাজের দরিদ্র জনগণের উন্নয়নের জন্য কেবল যাকাতই একমাত্র ব্যবস্থা নয়, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার সাদাকাহ এ তহবিলকে শক্তিশালী করতে পারে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঈদুল ফিতরের সময়ে ফিতরা প্রদান, ঈদুল আযহার সময়ে কুরবানীর পশুর চামড়া বা তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ

৭৫. আল-কুর'আন, ৫৯:০৭

Dhaka University Institutional Repository

দান, বিভিন্ন ধরণের মানতের অর্থ প্রদান ইত্যাদি। এছাড়া প্রত্যেক মুসলমান সেচ্ছায় বিভিন্ন ধরণের দান অনুদান করতে পারেন।

দরিদ্রের হক এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে তাদের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা উচিত।

গ. সহায়ক পদক্ষেপসমূহ:
আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক। এ দেশে দারিদ্র সমস্যা অত্যন্ত প্রকট রূপ ধারণ করেছে। তাই এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকারকে আরো কিছু সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হল-

- ইসলামী মীরাসী আইনের কঠোর প্রয়োগ।
- ওয়াকফ্ সম্পত্তির যথাযথ তদারকি ও তার যত্ন গ্রহণ।
- করযে হাসানা প্রদানে মানুষকে উৎসাহ দান।
- সুদবিহীন সরকারী ঋণের প্রবর্তন।
- সামাজিক ভাবে সুদের মূলোৎপাটন।
- আত্মীয় স্বজনের হক আদায়।
- প্রতিবেশীর হক আদায়।
- পতিত ভূমি আবাদ করনের সুযোগ।
- কৃষির উন্নয়ন।
- প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার।
- অপচয় রোধ।
- ভোগবিলাসের অপনোদন।
- অনিয়ম দুর্নীতির উচ্ছেদ।
- দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন।

মসজিদের একজন ইমামের দায়িত্ব হল সমাজকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার জন্য তাঁর অবস্থান থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা । আর দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত করার মাধ্যমে মানুষকে এ কাজে অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করা ।

বেকার সমস্যা দূরীকরণের প্রচেষ্টা

উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে বেকারত্ব কম বেশি সব দেশেরই সমস্যা। বাংলাদেশে বেকারত্বের সমস্যা প্রকট। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে (পাল্লা) প্রতিযোগিতা করে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণত কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের অভাবকে বেকারত্ব বলা হয় আর ব্যক্তিটিকে বলা হয় বেকার। বেকারত্বের

Dhaka University Institutional Repository

সংজ্ঞায় অধ্যাপক এ.সি পিগুর বলেন,"যখন কোন দেশে কর্মক্ষম লোক প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে রাজি থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতানুসারে কাজ পায়না তখন এই অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়।[৭৬]

Everyman's Dictionary of Economics এর সজ্ঞানুযায়ী– "Unemployment is involuntary idleness of a person willing to work prevailing rate of pay but unable to find it."

অর্থাৎ বেকারত্ব হল একজন ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত অবসর যিনি প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে চান। কিন্তু কাজ পান না।[৭৭]

এক কথায় বেকারত্ব বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝায়, যখন কর্মক্ষম ব্যক্তিগণ প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু যোগ্যতানুসারে কাজ পায়না।

বেকার সমস্য সমাধানে ইসলামী নীতি

বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এ দেশে বেকার সমস্যা সমাধানে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত পদক্ষেপসমূহ সঠিক বাস্তবায়ন একান্ত আবশ্যক। নিম্নে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা নিরসনের কতিপয় দিক তুলে ধরা হল:

ক. যাকাতভিত্তিক সুদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। যাকাত হল ইসলামী অর্থনীতির মেরুদণ্ড। ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষের অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে যাকাতের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। যাকাত ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হল আর্ত মানবতার সেবা আর দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। যাকাতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগীতার মনোভাবকে উৎসাহিত করা হয়। যাকাত ব্যবস্থা সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিধান করে যাতে কাউকে ক্ষুধার্ত , অনাহারে বা অর্ধাহারে জীবন যাপন করতে না হয়। যাকাতের মাধ্যমে ধনী ও গরীবের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। যাকাত ব্যবস্থা অর্থকে সমাজের কতিপয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হতে বাধা প্রদান করে। সম্পদের এই আবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে দরিদ্রের মাঝে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। তাই আমরা বলতে পারি, যাকাত সামাজিক বৈষম্য দূর করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করে এবং ইসলামের সাম্য ও মৈত্রী আদর্শ সমাজে বাস্তবায়ন করে। এর ফলে সমাজ থেকে বেকারত্বের হার ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

খ. কতিপয় সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানে যাকাতভিত্তিক সুদমুক্ত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বিকল্প নেই। তবে এর পাশাপাশি আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

❖ ছদ্মবেশী ভিক্ষুকদের উচ্ছেদ করা।

---

৭৬. প্রফেসর মুহাম্মদ মনজুর আলী খান,আ. স.ম সালাহ উদ্দীন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের অর্থনীতি* ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ২০০১ খ্রি., পৃ-৮০

৭৭. প্রাগুক্ত, ৮০

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।
- ❖ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন ঘটানো।
- ❖ বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহ সৃষ্টি করা।
- ❖ ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন ঘটানো।
- ❖ দেশীয় বিনিয়োগে উৎসাহ সৃষ্টি করা।
- ❖ শ্রমশক্তি রপ্তানী করা।
- ❖ তৈরি পোশাক শিল্পকে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- ❖ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পর উন্নতি সাধন করা।
- ❖ কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন করা।
- ❖ অনাবাদী ও খাস জমি বণ্টন করা।
- ❖ শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করা।
- ❖ সুদমুক্ত কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা ।
- ❖ সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- ❖ প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা।
- ❖ ইসলামী রীতিতে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।[৭৮]

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর উপর আমাদের সরকার ও সাধারণ জনসাধারণকে সচেতন করার মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ বেকারত্ব দূরীকরণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

দুর্নীতি প্রতিরোধ জনসচেতনতা সৃষ্টি

সমাজ ও রাষ্ট্র প্রশাসন যন্ত্র আজ দুর্নীতির কারণে দুর্দশাগ্রস্ত। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কল্পে গৃহীত সকল কর্মসূচী ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছেনা দুর্নীতি পরায়ন এক শ্রেণির মানুষের জন্য। দুর্নীতি দেশের অর্থনীতিসহ উন্নয়নের সকল পথকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। বিদেশী সাহায্য, বিনিয়োগসহ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত করছে।

দুর্নীতি একটি ব্যাপক ও জটিল প্রত্যয়। এর ধরণ, গতি ও প্রকৃতি বহুমুখী এবং বিভিন্ন ধরনের তাই এর সঙ্গা নিরূপণ জটিল কাজ। রামানাথ শর্মার মতে, "অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্বে ইচ্ছাকৃত অবহেলাই দুর্নীতি।[৭৯]

অন্যভাবে বলা যায়, দুর্নীতি হল দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ। স্ব-স্ব পেশার মাধ্যমে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যকৃত অপরাধমূলক আচরণই হল দুর্নীতি।

---

৭৮. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, আদর্শ সমাজগঠনে ইসলাম, *প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, (পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ), পৃ. ২৭৫-২৮০

৭৯. Ramanath Sarma, "Indian Social Problem's Media Promoters Put LTD. Bombay, 1982, p. 101

Dhaka University Institutional Repository

দূর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি হিসেবে অনেক মহৎ গুণের অধিকারী কিন্তু মানুষ তা স্বত্ত্বেও নিজের অন্তর্নিহিত কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় নানারকম অন্যায় ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে দুর্নীতিবাজরূপেও চিহ্নিত করে। এরফলে তার অন্যান্য মানবিক মর্যাদাই শুধু ভুলুণ্ঠিত হয় না, সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বহু ক্ষেত্রে বিপন্ন হয়ে পড়ে। একারণেই ব্যক্তি ও সমাজকে অপরাধ মুক্ত করার লক্ষ্যে যুগে যুগে ও দেশে দেশে জ্ঞানী-গুণী মনীষী, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, মহাপুরুষগণ নানা পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। দুর্ণীতিবাজকে কঠিন শাস্তি প্রদান করার মতও কঠোর আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। বরং দুর্নীতি দমন করার জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে দিনদিন যেন তা বহুগুণে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এ ব্যর্থতা শুধু বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোই বরণ করছে না বরং পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর অবস্থাও একইরকম।

পক্ষান্তরে ইসলাম গ্যারান্টি সহকারে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিরোধই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা তাই ইসলাম দুর্নীতি সংঘটনের পরই কেবল তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয় না বরং দুর্নীতির মন-মানসিকতার সুযোগ ও সম্ভাবনাকে অংকূরেই বিনষ্ট করে। এ লক্ষ্যে মানুষের জৈবিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যেমন যথাযথভাবে পূরণ করে তেমনি ব্যাপক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধ করণের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের কঠোর মনোভাব গড়ে তোলে। একদিকে যেমন দুর্নীতি দূরীকরণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে অপরদিকে দূর্নীতিবাজদের জন্য ইহকাল ও পরকালে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থাও রেখেছে। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি চিরতরে নির্বাসিত হয়েছে। এক্ষেত্রে একজন ইমামের গুরু দায়িত্ব হল দুর্নীতি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সকলের সামনে তুলে ধরা এবং এর অপরাধীর ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে সকলকে সজাগ করা। এতে আশা করা যায় সমাজ থেকে দুর্নীতির বিলোপ সাধন হবে।

বোমাবাজী ও জঙ্গী তৎপরতা প্রতিরোধ

বাংলাদেশের বিগত এক দশক জুড়ে বোমাবাজীর ব্যাপক উত্থান ঘটে। বিগত কয়েক বছর থেকে সুপরিকল্পিতভাবে জঙ্গিদের নামে বোমাবাজী শুরু হয়। জাতি চরমভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এমনি এক সংকট সন্ধিক্ষণে দেশের নেতৃস্থানীয় ইমামগণ সমগ্র দেশের ইমাম সমাজকে বোমাবাজদের প্রতিরোধের ডাক দেন। ৯ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে, সারাদেশের সকল মসজিদে একযোগে খুতবা দান ও ইমামদের নেতৃত্বে প্রায় প্রতিটি মসজিদ থেকে মিছিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। শুধু তাই নয় দেশব্যাপী পরবর্তী তিন মাস যাবৎ অব্যাহতভাবে সন্ত্রাস প্রতিরোধ মূলক খুতবা প্রদান, ওয়াজ, আলোচনা, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে এ ধারা অব্যাহত থাকে। সরকার এর মাধ্যমে সাহস সঞ্চার করে। জে এমবি নামক বোমাবাজদের পতন শুরু হয়। দেশ ও জাতি মুক্ত হয় এ মহাসংকট থেকে। সকল মহল নতুন করে ভাবতে শুরু করে যে, ইমাম সমাজ এক বিরাট সহায়ক শক্তি।[৮০]

৮০. ইমামদের ক্ষমতায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতন বন্ধে অবদান

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার দিক থেকে অসম সম্পর্ক বিদ্যমান। সেখানে পুরুষ কর্ণধার এবং নারী তার আজ্ঞাবাহী বলে বিবেচিত, যার ফলে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতন পরিবার ও সমাজের কাছে দৃষ্টিকটু বা অন্যায় বলে বিবেচিত নয়।[৮১]

পরিবারে যে নির্যাতন হয় তার মধ্যে রয়েছে যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, জোরপূর্বক বিবাহ দান, বাল্য বিবাহ, নিকট আত্মীয় দ্বারা যৌন আক্রমণের শিকার হওয়া, স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সদস্য কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিবারে নারীর উপর যে নির্যাতন হয় তা অন্যসব ক্ষেত্রের নির্যাতনের তুলনায় মারাত্মক। পরিবারের মধ্যে একত্রে বসবাসের কারণে নির্যাতন বারবার সংঘটিত হতে থাকে। যৌথ পরিবারে অনেক সময় স্বামী যখন স্ত্রীকে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করে তখন স্বামীর পরিবারে লোকজন তাতে মদদ যোগায়। বিভিন্ন আইন সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী পরিবারে সংঘটিত নির্যাতনের মধ্যে বিবাহিত মহিলারা বেশি নির্যাতনের শিকার। দারিদ্র পরিবারে যৌতুকের জন্য স্ত্রীর উপর নির্যাতনের ঘটনা বেশি দেখা যায়। জন্ম থেকেই মেয়ে সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। গোড়াতেই তাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল করে ফেলা হয়। নারী নির্যাতন বন্ধে ইসলাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিম্নে কতিপয় ব্যবস্থা তুলে ধরা হল।

- ❖ ইসলামী শিক্ষার বিস্তার।
- ❖ নারীকে ইসলাম প্রদত্ত অধিকারসমূহ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- ❖ ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে তা বাস্তবায়ন করা।
- ❖ যৌতুক প্রথা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।
- ❖ মোহরানা প্রদান বাধ্যতামূলক করা।
- ❖ উপযুক্ত পরিবেশে নারীকে অর্থোপার্জনের সুযোগ করে দেয়া।
- ❖ জীবন সঙ্গী বাছাইয়ে নারীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া।
- ❖ শরীয়ত সম্মত কারণে নারীকে তালাক প্রদানের অধিকার প্রদান করা।
- ❖ নারী ও পুরুষ কর্তৃক পর্দার বিধানকে যথাযথভাবে মান্য করা।
- ❖ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিধিবিধান পুরোপুরিভাবে মেনে চলা।
- ❖ নারী নির্যাতন বন্ধে ইসলামের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করা।
- ❖ অশ্লীলতা প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ❖ নারী পাচারকারীদের কঠিন শাস্তি প্রদান করা।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় ইসলাম নারী নির্যাতনের প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক সব ধরণের ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে। এখন একজন ইমামের দায়িত্ব হল প্রথম মানুষকে নারী নির্যাতনের

---

৮১. Taslima Mansoor, *Form Patriarchy to Gender Equity*, Dhaka: The Unversity Press Limited, 1999, P.34

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায় সম্পর্কে সচেতন করা। সেই সাথে মসজিদের মুসল্লীদের নিয়ে নারী নির্যাতন বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধ

সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নৃশংস অন্যায় হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ। সমাজে এসিড নিক্ষেপেরে দ্বারা ঝলসে দেয়া হচ্ছে একজন মানুষের সুন্দর মুখমণ্ডল, বিকৃত করে দেয়া হচ্ছে তার চেহারার আকৃতি, পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তার সারা দেহ। ধূকে ধূকে প্রাণ দিতে হচ্ছে হাসপাতালের বেডে। এধরণের করুণ পরিণতি বরণ করতে হচ্ছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে। তবে সাধারণত এসিড নিক্ষেপের প্রধান শিকার– কিশোরী, যুবতী ও গৃহবধুরা। ক্ষেত্রেবিশেষ পুরুষরাও নির্মমতার শিকার হচ্ছে। এসিড নিক্ষেপের শিকার যেই হোক না কেন দেশের সর্বত্রই জগণ্য অপরাধটি বেড়েই চলছে। কখনও প্রেম নিবেদনে সাড়া না পেয়ে আবার কখনও বিয়ের প্রস্তাবে প্রত্যাখাত হয়ে এসিড নিক্ষেপ করছে। আবার কোথাও যৌতুকের জন্য স্বামী স্ত্রীকে এসিড মারছে। এছাড়াও স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে অনুমতি না দেয়ায়ও এসিড নিক্ষেপের মত ঘটনা ঘটছে। মাঝে মাঝে পারিবারিক কলহ দু'টি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া, গোষ্ঠীগত বিবাদ, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ, প্রভৃতি কারণেও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এসিড নিক্ষেপের শিকার হতে দেখা যায়। একজন ইমামের দায়িত্ব হল এসিড নিক্ষেপের মত জগণ্যতম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা।

নারী ও শিশু পাচার রোধ

বলপূর্বক বাধ্য করে বা প্রতারণামূলক উপায়ে প্রলুব্ধ করে বহু সংখ্যক নারী ও শিশু বিদেশে পাচার হচ্ছে প্রতি বছর। মোট কত নর-নারী বা শিশু পাচার হয় তার সঠিক তথ্য হয়ত কখনই জানা সম্ভব নয়। মূলত: উদ্ধারের সংখ্যা থেকে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটাকেই নারী ও শিশু পাচারের সংখ্যা হিসেবে ধরা হয়। পাচারকারীদের কবল থেকে কেউ সৌভাগ্যক্রমে পালিয়ে আসলে তার গণনাই কেবল সংখ্যায় রূপ নেয়। সত্যিই এ সংখ্যা পাচার হওয়া নারী শিশুর সঠিক সংখ্যা নির্দেশ করেনা। এর বাস্তব সংখ্যা আরও অনেক বেশি। এ সকল ক্ষেত্রে একজন ইমামের দায়িত্ব হল পাচার করার মত জগণ্যতম পাপ সম্পর্কে মানুষকে বুঝানো এবং এর প্রতিকারে স্থানীয় সরকারী প্রতিনিধি ও সমাজের গণ্যমান্য মানুষের সহযোগিতায় যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইমামদের অবদান

বৃক্ষ রোপন

বর্তমান বিশ্বে বন-বৃক্ষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। কারণ উৎপাদনের চেয়ে প্রয়োজনের পরিমাণ অনেক বেশি। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সংগে সংগে তার প্রয়োজনও বাড়বে, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সুতরাং উৎপাদন না বাড়ালে অদূর ভবিষ্যতে যে মানব গোষ্ঠীকে এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে বিশ্বনবী (সা.) পূর্বেই সচেতন ছিলেন। বিশ্ব আজ বৃক্ষ রোপন অভিযানে জোরদার হয়ে উঠছে। মূলত এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রায় পনের'শ বছর আগে। এর প্রয়োজনীয়তা তিনি তখনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন "যখন কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপন বা বীজ বপন করে এবং মানুষ ও পশু তা হতে আহার গ্রহণ করে তবে তা তার জন্য সদকা।" এতে বোঝা যায় মানুষ ও পশুর কল্যাণ হতে পারে এমন সদুদ্দেশ্যে যদি কেউ বৃক্ষরোপন করে, তবে তা পূণ্য কাজ বলে গণ্য হবে।[৮২]

এ পৃথিবী পৃষ্ঠে ৭২% অংশ জুড়ে আছে পানি এবং ২৮% অংশ স্থলভূমি। একমাত্র শুস্ক মরুভূমি, তুষারাচ্ছাদিত মেরু বা সুউচ্চ পাহাড়ী অঞ্চল বাদ দিলে এ স্থলভূমির প্রায় সব জায়গাতে চোখে পড়ে কোন না কোন সবুজ গাছপালার আচ্ছাদন।[৮৩]এ সবুজ গাছপালার উপরই নির্ভর করে আছে মানুষসহ সকল প্রাণী জগৎ। কারণ একমাত্র এ সবুজ গাছ-পালাই সালোক- সংশ্লেষণ দ্বারা খাদ্য তৈরি করতে সক্ষম সেজন্য সবরকম জীব তাদের বেঁচে থাকার জন্য ওদের উপরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। শুধু যে তারা খাদ্য প্রস্তুতেই সাহায্য করে তাইনা, সাংলোক সংশ্লেষণের সময় তারা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন বের করে দেয় যার ফলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পায়। গাছের বেঁচে থাকার জন্য নাইট্রোজেনরও প্রয়োজন। তবে গাছপালা সরাসরি তা বাতাস থেকে নিতে পারে না। কিন্তু ব্যাকটোরিয়া ও লীলাভ সবুজ শৈবাল মাটিতে ও পানিতে নাইট্রোজেন সংবদ্ধ করতে সাহায্য করে, যার মাধ্যমে অন্য গাছপালা তা গ্রহণ করতে পারে।[৮৪]

বন সংরক্ষণ এবং গাছ আজ একটি পৃথক বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। বন ও গাছপালার উপকারিতা অপরিসীম। বন জঙ্গল থেকে আমরা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করি। এর লতাপাতা ও ফলমূল আমাদের এবং পশুদের আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গাছপালা প্রকৃতির শোভাবর্ধক এবং মানুষের প্রতি মহান স্রষ্টার এক বিরাট অবদান।[৮৫]

আল্লাহ তা'আলা আপন সৃষ্টি বৈচিত্রের নিদর্শন স্বরূপ কুর'আনের বিভিন্ন জায়গায় গাছপালার উল্লেখ করেছেন, যেমন আল্লাহ বলেন, "তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেন এবং

---

৮২. নূর-ল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, *পরিবেশ সংরক্ষণে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)*। ঢাকা: বৃক্ষ রোপন ও ইসলাম, এ. কে. এম. ইয়াকুব হোসাইন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৭

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৮৪. প্রাগুক্ত।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা তা থেকে প্রজ্বলিত কর।"[৮৬]

মহান আল্লাহ অন্যত্র আরও বলেন, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে চলার পথ করে দিয়েছেন, তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।[৮৭]

পবিত্র কুর'আনে অন্য জায়গায় আছে, মানুষ তার খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি। তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; আঙ্গুর, শাক-সবজি, যায়তুন, খেজুর এবং বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য, এটা তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশু ভোগের জন্য।[৮৮]

কুর'আনে উদ্ভিদ এবং গাছপালার বৈজ্ঞানিক আলোচনাও রয়েছে। উদ্ভিদেরও যে পুরুষ ও স্ত্রীভেদ আছে তা মাত্র পাঁচশ বছর পূর্বে বিশ্ববাসীর জানা ছিল না। অথচ কুর'আন পনের'শ বছর আগেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এ তত্ত্বটি প্রকাশ করে দিয়েছে।[৮৯]

আল্লাহ তা'আলা বৃক্ষের দ্বারা কালিমা তাইয়েবা (সৎ বাক্য) এবং কালিমা খাবীসার (অসাধু বাক্য) উপমা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।[৯০]

বনের গাছপালা থেকে শুধু কাঠ, রাবার, ঔষধ কিংবা ফলমূলই সংগ্রহ করা হয় না, এগুলো থেকে বিভিন্ন ধরণের সুগন্দিদ্রব্য এবং তেলও পাওয়া যায়। বৃক্ষের পরিশুদ্ধ তেল দ্বারা প্রজ্জলিত প্রদীপের সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূরের উপমা দিয়েছেন। মানুষ চেষ্টা গবেষণা করলে বনের বৃক্ষ থেকেও যে উৎকৃষ্ট ধরণের তেল আহরণ করতে পারে এ উপমা নিঃসন্দেহে সে তত্ত্বেরও ইঙ্গিত বহন করছে।[৯১] এ সম্পর্কে আল কুর'আনে বর্ণিত আছে, সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, তাতে উৎপন্ন হয় তেল এবং আহারকারীদের জন্য যায়তুন।[৯২]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; এটা প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যায়তূন বৃক্ষের দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৯৩]

---

৮৬. আল-কুর'আন, ৩৬: ৮০
৮৭. আল-কুর'আন, ২০: ৫৩-৫৪
৮৮. আল-কুর'আন, ৮০: ২৪-৩২
৮৯. আল-কুর'আন, ২০: ৫৩
৯০. আল-কুর'আন, ১৪: ২৪-২৬
৯১. নূরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৯২. *আল-কুর'আন*, ২৩: ২০
৯৩. আল-কুর'আন, ২৪: ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

যায়তুন তেল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যায়তুন তেল খাও এবং শরীরে মালিশ কর। কেননা এটা কল্যাণময় বৃক্ষ। এক কথায় বলতে গেলে জঙ্গলেই মানুষের যাবতীয় মঙ্গল। নবী আউলিয়া ও সাধু সজ্জনেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বন-জঙ্গলের কোন নিভৃত স্থানে বসেই আল্লাহর সম্পর্কে চিন্তা করতেন। বন-জঙ্গল আয়মন উপত্যকার একটি বৃক্ষের মধ্য হতেই হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ওহী নাযিল হয়।[৯৪]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন মূসা আগুনের নিকট পৌঁছল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পাশে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক থেকে তাকে আহ্বান করে বলা হল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক।[৯৫]

পরকালে মুমিনদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা ঘন গাছপালা ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয় বলে কুর'আন সাক্ষ্য দেয়। অন্যান্য উপকার ছাড়াও বন এবং গাছপালা ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। এগুলোর দ্বারা প্রকৃতির শোভা ও বর্ধিত হয়।[৯৬]

এ সম্পর্কে পবিত্র হাদীসেও বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسًا ويزرع زرعًا فيأكل منه طير او انسان او بهية الا كان له صدقة.

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কোন মুসলমান যদি গাছ লাগায় কিংবা ফসল উৎপন্ন করে আর তা থেকে পাখি কিংবা মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু কিছু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে দান স্বরূপ হবে।[৯৭]

وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسًا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه احد الا كان له صدقة.

হযরত জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ লাগাবে, তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্য দান স্বরূপ, যা কিছু চুরি হয় তাও দান স্বরূপ, বন্য জন্তু যা খায় তাও দান স্বরূপ, পাখি যা খায় তাও দান স্বরূপ, আর কেউ অন্যের কিছু নিয়ে গেলে তাও তার জন্য দান স্বরূপ।[৯৮]

বন এবং বন্য পশু পাখি প্রকৃতির শোভাবর্ধক। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এগুলোর সংরক্ষণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মক্কা এবং মদীনার এক একটি বিশেষ এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করেছিলেন। এসব এলাকার গাছপালা কাটা এবং সেখানে বন্য পশু-পাখির শিকার করা আজও নিষিদ্ধ।[৯৯]

---

৯৪. নূর-ল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৯৫. আল-কুর'আন, ২৮: ৩০

৯৬. নূর-ল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত।

৯৭. সম্পাদনা পরিষদ, সহীহ মুসলিম, ৫ম খ-, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি., হাদীস নং ৩৮২৯, পৃ. ৩৮৩

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. হাদীস নং ৩৮২৪, পৃ. ৩৮০

৯৯. নূর-ল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ভিদ সংরক্ষণ সম্পর্কে কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।[১০০]

আল্লাহর যমীনের মধ্যে যে বরকত নিহিত রেখেছেন তা কখনও শেষ হবার নয়। আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে যমীনের ব্যবহার করলে এর অফুরন্ত নিয়ামত থেকে চিরকালই উপকৃত হতে পারব।

আজকাল নির্বিচারে বৃক্ষনিধন চলছে। ফলে উদ্ভিদ বিরল প্রজাতিতে পরিণত হচ্ছে। এ অবস্থা বেশিদিন চলতে থাকলে শ্যামল প্রকৃতি মরুভূমিতে পরিণত হবে। তাই আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেবদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, গাছপালার উপকারিতা এবং সেগুলোর নিধনের অপকারিত সম্পর্কে সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করা এবং সুন্দর একটি পৃথিবী গড়ার জন্য মসজিদের আঙ্গিনায় নিজেও গাছ লাগানো এবং তার মুসল্লীদেরকে সর্বত্রই বেশি বেশি গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করা।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ

বর্তমান বিশ্ব প্রধান প্রধান যেসব সমস্যায় আক্রান্ত তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল 'পরিবেশ দূষণ' সমস্যা। একটি নির্দিষ্ট এলাকার চারপাশে বিরাজমান নানা উপাদানে গড়ে উঠা সকল কিছুই ঐ এলাকার পরিবেশ। এরমধ্যে যেমন রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, তেমনি রয়েছে নির্দিষ্ট এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই পরিবেশ। চারপাশের অবস্থা, প্রতিবেশ পরিবেষ্টন, পরিমণ্ডলসহ আকাশ, বাতাস, আলো, মাটি পানি গাছপালা সম্প্রসারিত দিগন্ত সবই আমাদের পরিবেশ।[১০১]

ড. মুহাম্মদ সালেহ আল-আদেলী বলেন, মানব মণ্ডলীকে বেষ্টন করে আল্লাহ তা'আলার যে সমগ্র সৃষ্টি জগত তাকেই পরিবেশ বলে।[১০২]

অসংখ্য কারণে পরিবেশ দূষিত হতে পারে। তবে পরিবেশ দুষণের প্রাথমিক ও প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

ক) ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

খ) ভোক্তার চাহিদা বৃদ্ধি।

গ) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন।

ঘ) প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে অনিয়ন্তিত হস্তক্ষেপ।

মানুষ তার নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিবেশের উপর-বিরূপ প্রভাব ফেলেই চলছে। খাদ্য, পোশাক, পরিচ্ছেদ ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য অসংখ্য দ্রব্য সামগ্রীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। পুরনো জিনিস ফেলে নতুনের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। তাতে অপচয়ের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে ব্যবহৃত তরল ও কঠিন বর্জের পরিমাণও বাড়ছে। নানা রাসায়নিক পদার্থ, বিষাক্ত দ্রব্যও জ্বালানীর ব্যবহার বেড়েই চলছে।

---

১০০. আল-কুর'আন, ২:২২

১০১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৩৩৭

১০২. ড. মুহাম্মদ সালেহ আল আদেলী, *আল ইসলাম ওয়াল বিয়া'* (সৌদি আরব: আধুনিক ফিকহী গবেষণা পত্রিকা, রিয়াদ, অক্টো-নভে: ১৯৯৪), পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

এরসাথে ইচ্ছামাফিক অযাচিতভাবে পাহাড় কাটা থেকে শুরু করে প্রকৃতির সকল কিছুতেই মানুষ হস্তক্ষেপ করছে। সব মিলিয়ে পরিবেশকে ক্রমাগত দূষণ করে চলেছে এসব কর্মকাণ্ড।

সাধারণত পরিবেশ দুষণের প্রধান চারটি ধরণ রয়েছে-

ক) বায়ু দূষণ

খ) পানি দূষণ

গ) শব্দ দূষণ

ঘ) কঠিন বর্জ্য থেকে দূষণ

কোন পরিবেশের বায়ু যখন প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক বেঁচে থাকার অনুপযোগী হয়ে পড়ে, তখন ঐ পরিবেশের বায়ু দূষিত হয়েছে বলা যায়।[১০৩] বায়ুতে মিথেন, ক্লোরোপুরো, কার্বন, ওজোন, সালফার ডক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, সিসা ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলত বায়ু দূষিত হয়।[১০৪]

পানিতে যখন অক্সিজেনের পরিমাণ নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন সেই পানি বর্জ্য পরিশোধনে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় Biochemical Oxygen Demand (BOD). অর্থাৎ পানিতে BOD-এর মাত্রা বেড়ে গেলে পানি দূষিত হয়ে পড়ে তা জলজ উদ্ভিদ ও মাছসহ অন্যান্য প্রাণীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই পানি কৃষি কাজসহ মানুষের অন্যান্যকাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হয়ে পড়ে অনুপযোগী।[১০৫]

গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি শব্দই হল শব্দ দূষণ। শব্দের উৎস থেকে আধা মিটার দূরে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা হল ১০০ ডেসিবেল। এই মাত্রা থেকে বেশি মাত্রার শব্দ মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণের পাশাপাশি কঠিন বর্জ্য ও নানাভাবে পরিবেশ দূষণ করে থাকে। ইসলাম মানুষকে সীমিত পর্যায়ে পরিবেশের উপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। তাই মানুষ ইচ্ছা করলেই সব কিছু করতে পারবে না। কারণ ইসলামে কেবল মানুষের অধিকারে কথাই বলা হয়নি বরং মানুষের সাথে জীব জন্তু, পশু পাখিসহ সকল সৃষ্টিকূলের কথাও বলা হয়েছে। তাই একজন ইমামের দায়িত্ব হল পরিবেশ সম্পর্কে ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মাঝে তুলে ধরা। পরিবেশ সংকট সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টি ভঙ্গির প্রচার প্রসার করা, পরিবেশ দূষণ থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যেবোধের আলোকে সকলকে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহণ

প্রশিক্ষণ নেয়ার পর একজন ইমাম আয়বর্ধক আত্মকর্মসংস্থান মূলক বিনিয়োগে আত্ম নিয়োগ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ইমামের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা থাকলে তিনি দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। তিনি নিজে স্বাবলম্বী হলে এটি মুসল্লীদের জন্য একটি

---

১০৩. Raymond E Glos, Richard D. Steade and James R Lowry, op.cit, P.29

১০৪. U.S Enviromnental Proteetion Agency National Emessions Report, U.S.A May-1976, P.1

১০৫. মলয় কুমার ভৌমিক, *বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ, ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব* (প্রবন্ধ) আই.বি.এস. জার্নাল ১৪০৪: ৫, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ হিসেবে কাজ করবে। তা ছাড়া তার প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানোর জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিৎ।[১০৬]

সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম চালু

সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতা অর্জন করে কল্যাণমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'। এই ফর্মূলায় সমবায় ভিত্তিক যৌথ কারবার কার্যক্রম গ্রহণ করে আর্থিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করা যায়। আর এক্ষেত্রে ইমাম সাহেব নেতৃত্ব প্রদান করতে পারেন এবং মূল উদ্যোগীর ভূমিকাও তিনি নিতে পারেন। কারণ একজন ইমাম সমাজে সবার কাছে বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি।[১০৭]

খামার ও ডেইরী ফার্ম প্রতিষ্ঠায়

আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে স্থানীয় লোকদের সাথে সমন্বয় করে খামার ও ডেইরী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সমাজে অনেক লোক আছে যাদের অর্থ অলস বসে আছে তাদেরকে সাথে নিয়ে ইমাম সাহেব এটা শুরু করতে পারেন। কাউকে না পেলে তিনি একক প্রচেষ্টাই ছোট্ট করে হলেও শুরু করতে পারেন। এতে করে ইমাম সাহেব নিজে যেমনিভাবে উপকৃত হবেন সেই সাথে সমাজের অন্য লোকদের জন্য আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হবে। পর্যায়ক্রমে বড় হলে অন্যদের জন্য কর্ম সংস্থানও হতে পারে।[১০৮]

কারিগরি প্রশিক্ষণ চালু

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে যুগোপযোগী নয়। অনেককেই দেখা যায় বি.এ সম্মান বা এম.এ. সমাপ্ত করেও বেকার বসে আছে। একদিকে তারা কোন চাকুরীও পাচ্ছেনা। অপরদিকে কোন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে পারছে না। কারণ তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে না। এমতাবস্থায় সম্মানিত ইমামগণ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি থেকে বহুমুখী প্রশিক্ষণ লাভ করে স্থানীয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছেলেদেরকে নিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে প্রশিক্ষণ হতে হবে অবশ্যই কর্মসংস্থান ভিত্তিক। যাতে তারা প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান দ্বারা ক্ষুদ্র বিনিয়োগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। প্রয়োজনে ইমাম সাহেব স্থানীয় লোকদের মধ্যে যারা সময়োপযোগী বিষয় সম্পর্কে পারদর্শী তাদেরকেও তিনি একাজে আহ্বান করতে পারেন। এতে বেকার যুবকদের দক্ষতা ও সামর্থ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।[১০৯]

মৎস চাষ প্রকল্প গ্রহণ

মাছ চাষ বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা ও আভ্যন্তরীন বাজারে এর চাহিদার প্রেক্ষিতে খুবই লাভজনক। কীভাবে এর সফল চাষ করা যায় তা না জানার কারণে এই খাত থেকে অনেকেই

---

১০৬. ড. মীর মানজুর মাহমুদ, *বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম* (ঢাকা: ই.ফা.বা., অক্টোবর, ২০০৪), পৃ.৯৬

১০৭. প্রাগুক্ত।

১০৮. প্রাগুক্ত।

১০৯. প্রাগুক্ত, মুহাম্ম আতাউর রহমান, ড. আব্দুলণ্ঢাহ আল মা'রূফ, কাজী আবু হোরায়রা, ইমামদের ক্ষমতায়ন, প্রকাশক ডা. আলমগীর মতি, প্রকাশকাল, এপ্রিল, ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না। তবে বর্তমানে সরকার যে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এর মাধ্যমে সব ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যায়। উন্নত পোনা খাদ্য ও রোগ বালাইয়ের ঔষুধ সর্বোপরি এর জন্য ঋণ ও অন্যান্য সহায়ক সুবিধা বর্তমান অপ্রতুল। বর্তমানে মৎস চাষে সরকার যেহেতু আগ্রহী এবং সরকারী সহায়তাও পাওয়া যায় তাই একজন ইমাম তাঁর আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মৎস চাষকে বেছে নিতে পারেন। নিজের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে সমাজেরও চাহিদা মেটাতে পারেন। এটি ব্যবসার সাথে সাথে একটি সেবামূলক সামাজিক কার্যক্রমও বটে। মানুষের শরীরে শক্তি বর্ধন, পুষ্টি সাধন, আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব পুরণ, শরীরে ক্ষয় রোধ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা,মেধাশক্তি বৃদ্ধিসহ সঠিক স্বাস্থ্য রক্ষায় মৎস অপরিহার্য। তাছাড়া মানুষের জীবিকা নির্বাহে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে অল্লাহ বলেন, "দুটি দরিয়া একরকম নয়, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয় অপরটির পানি নোনা। প্রত্যেকটি থেকে মৎস আহার কর।[১১০]

আধুনিক চাষাবাদের প্রচলন

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। ২০১১-১২ অর্থ বছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ১৯.২৯ শতাংশ।[১১১] অথচ কৃষকদের অধিকাংশ নিরক্ষর বা আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে কৃষকরা হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও কাঙ্খিতমানে ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ। প্রতি বছর দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষির উন্নতির বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যে ইমামগণ মৌসুম অনুযায়ী কৃষকদের মাঝে চাষাবাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন।

মহান আল্লাহ চাষাবাদ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেন– আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি। তাদ্বারা উৎপন্ন করি শস্য উদ্ভিদ ও পাতাঘন উদ্যান।[১১২]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন- তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীর এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ।[১১৩] এ সমস্ত কুর'আনের আয়াত উদ্বৃতির মাধ্যমে ইমামগণ মুসল্লীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে।

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

আমাদের দেশের অধিকাংশ ইমাম আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্খিতরূপে অবদান রাখতে পারছেন না। এ সমস্যা সমাধানে শিক্ষা ও ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের একটি পদ সৃষ্টি হলে এবং তাতে আমাদের দেশের তিন লক্ষ ইমামকে নিয়োগ দান করলে একদিকে তাদের জন্য একটি নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে অপর দিকে বর্তমান সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের বেহাল দশারও উন্নতি ঘটবে। তাতে করে ইমাম সাহেব নিজে আর্থিক স্বাবলম্বি হওয়ার পাশাপাশি সমাজেরও উপকার সাধিত হবে। প্রাথমিক

১১০. আল-কুর'আন, ৩৫: ১২
১১১. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা, জুন, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৭৭
১১২. আল-কুর'আন, ৭৮: ১৪-১৫
১১৩. আল-কুর'আন, ১৬: ১০

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের প্রথম থেকেই ধর্মীয় শিক্ষার অনুরাগী করে গড়ে তুলতে বিরাট সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে। এভাবেও তিনি আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে পারেন।[১১৪]

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন

বাংলাদেশ একাধারে কৃষি প্রধান এবং গ্রাম প্রধান দেশ। কৃষি ও গ্রামের উন্নয়ন সাধনের উপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। কৃষি এখনো বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বৃহৎ অংশ এবং আগামী শতাব্দীর বেশি সময় জুড়ে তাই থাকবে। জিডিপিতে কৃষির অংশ ১৯.২৯%[১১৫] তুলনায় প্রায় দিগুণ। তবে শিল্পখাতেও আরও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে কৃষি খাতের এই প্রাধান্য হ্রাস পাবে। কিন্তু বাংলাদেশেরর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক (৮৭%)। গ্রাম এলাকায়বাস করে এবং তাদের অর্ধেকেরও বেশি দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। তাই কৃষি খাতের উন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের জন্য কোন প্রবৃদ্ধি বা দারিদ্র বিমোচন কৌশল সফল হবে না। একটি গতিশীল কৃষি খাতের জন্য একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের প্রয়োজন প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তা অর্জনের জন্য একটি নীতি নির্ধারণ করা।[১১৬] আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে জুমার আলোচনার মাধ্যমে সরকারী নীতি নির্ধারকদের সচেতন করতে পারেন। এবং তিনি তার অবস্থান থেকে এ দুয়ের উন্নয়নে যুপোযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। তাই পল্লী উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে মানুষকেই এবং উন্নয়ন ঘটাবে মানুষই। অতএব দেশে যত রকমের সম্পদএবং সম্ভাবনা থাকুক না কেন যতক্ষণ মানুষ এ সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহার উপযোগী করতে না পারবে ততক্ষণ আমরা এ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকবো। তাই দেশের জনসংখ্যাকে জন সম্পদে পরিণত করতে হবে। স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, শিক্ষিত সচেতন জনগোষ্ঠীই সম্পদ। তাই জনশক্তি ও কর্মদক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। দেশের মানুষকে সাক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে জীবনমুখী করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।[১১৭]

এখন প্রশ্ন হল মানব সম্পদ বলতে কি বুঝায়? UNDP-এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মানব সন্তান সুনির্দিষ্ট কিছু সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে সকলেই তাদের যোগ্যতার প্রসার ঘটাতে পারে এবং বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষেরই যে জীবনের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্মগত অধিকার আছে তার সর্বজনীয় স্বীকৃতিই হল মানব সম্পদ উন্নয়নের

---

১১৪. ড. মীর মনজুর মাহমুদ, *বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম গবেষণা বিভাগ*, পৃ. ১১১

১১৫. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমীক্ষা, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৭৭

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

১১৭. ড. মীর মনজুর মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

মূলভিত্তি।[১১৮] এম. এ. ভের্মা বলেছেন, একটি সমাজের সকল মানুষেল জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানোর প্রতিক্রিয়াই মানব সম্পদ উন্নয়ন।[১১৯] আবার ফ্রেডরিক এই. হারবিসন আরো জোর দিয়ে বলেছেন, মূলধন, আয় এবং ভৌত সম্পদের কোনটিই একটি জাতির সম্পদ নয়। শুধু মানব সম্পদই একটা জাতির আসল সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়।[১২০] মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা খুব সুবিধাজনক নয়। নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার জন্য এ খাতকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু সরকর ও সচেতন নাগরিকদের কাছে ইতোমধ্যেই এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়টি আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিকল্পহীন পূর্ব শর্ত।[১২১]

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য আবশ্যিক মৌলিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক ন্যায় বিচার, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনের শাসন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সুশীল সমাজ গঠন, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। আর এসব বিষয়ে সামাজিক উন্নতি সাধনে একজন ইমাম বর্ণনাতীত ভূমিকা রাখতে সক্ষম। একজন ইমাম বিভিন্নভাবেই সমাজের অনেক গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেন। তাই তিনি ইচ্ছা করলে মানব সম্পদ উন্নয়নে নৈতিকগুণ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

শিল্পায়নে মানুষকে উৎসাহ দান

শিল্পখাত অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। কারণ শিল্পায়নের অভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা ও বেকারাত্বসহ নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় শিল্পায়ন তরান্তিত হলে উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। সুতরাং ব্যাপক শিল্পায়নে এখনই উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

আমাদের দেশের অনেক ব্যক্তি বা গ্রুপ অব কোম্পানী আছে যারা ইচ্ছা করলেই বড় বড় কলকারখানা গড়তে পারে। আমাদের সম্মানিত ইমামদের দায়িত্ব হল, জুমার আলোচনাসহ বিভিন্ন স্থানে সময় সুযোগে শিল্পায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে তাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা। একদিকে তারাও লাভবান হবে, বেকার সমস্যার সমাধানও হবে, সেই সাথে দেশও অনেক উন্নতি লাভ করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন

আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ খুবই অপ্রতুল। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা যেমন একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করে। তেমনি উক্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার না করে সে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কাজেই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এর সুষ্ঠু ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইমাম সাহেবগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।[১২২]

---

১১৮. Resource UNDP Human development report 1994, Delhi: Oxford University prass, p.13

১১৯. M. M. Verma, Human development. p. 14

১২০. গোলাম মোস্তফকীম, *বাংলাদেশ মানব সম্পদ উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা*, লোক প্রশাসক সাময়িকী, ৮ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ১২১

১২১. ড. মীর মনজুর মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ

টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পোলিও মুক্ত দেশ গঠন

দেশে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো, জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিরোধে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন আমাদের সম্মানিত ইমামগণ। টিকাগ্রহণ করা নিয়ে সমাজে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এসব বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পোলিও মুক্ত দেশ গঠনে ইমামগণ অসামান্য অবদান রেখেই চলেছেন। ইমামগণ টিকাদানের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জুমু'আর বয়ানে টিকার গুরুত্ব তুলে ধরে সমাজের সকল মানুষ সচেতন করার পাশাপাশি এই টিকা গ্রহণ না করার ক্ষতিকর দিকগুলো অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে মানুষকে বুঝাতে অবিরাম চেষ্টা করেই চলেছেন। টিকাদানের নির্ধারিত দিন মসজিদের মাইক থেকে ঘোষণা দানের মাধ্যমে শেষ মুহূর্তের কাজটুকুও অত্যন্ত যত্নের সাথে করছেন।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

বর্তমানে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে জন্ম ও মৃত্যু সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকার ঘোষিত জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এ নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায়ও এটা আবশ্যক। আদম শুমারীসহ আরো অনেক পরিসংখ্যনে জন্ম নিবন্ধন তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জমি রেজিষ্ট্রির মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে অনেক সময় ছেলে মেয়ের জন্য পিতার মৃত্যু সনদ লাগে। মোটকথা অনেক কাজেই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন তথ্য জরুরি ভূমিকা রাখে। আমাদের সম্মানিত ইমামগণ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজেও বিভিন্নভাবে অবদান রাখতে পারেন। তারা মানুষকে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন। সেই সাথে সরকারের উদ্দেশ্য যে, প্রতিটি নাগরিক যেন নিবন্ধিত হতে পারে সেখানেও প্রচার প্রসারের মাধ্যমে ইমাম সাহেব অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন।

স্যানিটেশন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন

সুস্থ, সুন্দর ও রোগমুক্ত থাকার জন্য যে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস অনুশীলন করতে হয় তাই স্যানিটেশন। আমাদের সামাজিক জীবনে স্যানিটেশনের যে কত গুরুত্ব রয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনা না করলে বোঝা কঠিন। মূলত সৃষ্ট স্যানিটেশন ব্যবস্থা আমাদের অনেক অনাকাঙ্খিত রোগ বালাই থেকে মুক্ত রাখতে পারে, আর আমাদেরকে উপহার দিতে পারে একটি স্বাস্থ্য সম্মত সমাজ ব্যবস্থা। স্যানিটেশন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা নেয়া প্রয়োজন নিম্নে তার কতিপয় দিক তুলে ধরা হল,

ক) সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার।

খ) স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট ব্যবহার।

গ) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

ঘ) পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

সুষ্ঠু স্যানিটেশনের অভাবে আমাদের সামাজিক জীবনে নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। যেমন বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধি হতে পারে ডায়রিয়া, কলেরা, জন্ডিস, টাইফয়েড, খুজলি পাঁচড়াসহ বিভিন্ন রকম চর্মরোগ এছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে আমাদের উপর বিভিন্ন ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে এর নৈতিকবাচক প্রভাব থেকে বাঁচা সম্ভব।

- ❖ রোগের বিস্তার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।
- ❖ সুষ্ঠু স্যানিটেশন ব্যবস্থা জোরদার করা।
- ❖ সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।
- ❖ স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করা।
- ❖ খাওয়ার আগে পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া।
- ❖ টয়লেটের পর সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধোয়া।
- ❖ নখ ছোট রাখা।
- ❖ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।
- ❖ সকল কাজে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।
- ❖ সকলের মাঝে স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যাপকতর করা।

স্যানিটেশন কার্যক্রমে ইমাম সাহেবগণ অন্য যে কোরো চেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। কারণ সমাজ নেতা হিসেবে ইমামের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। তিনি যা বলেন মুসল্লিগণ তা করতে বেশি সচেষ্ট থাকেন। গণমাধ্যম কিংবা মিডিয়ার মাধ্যমেও খুব বেশি প্রচার প্রসার করা না গেলেও ইমাম সাহেবগণ জুমার খুতবাতে এ প্রসংগ তুলে মানুষকে বেশি সচেতন করতে সক্ষম।

পরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহদান

আল্লাহ এ পৃথিবীকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ পরিকল্পনা মাফিক ছয় দিনে আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন। আর কোন কাজ পরিকল্পনা ছাড়া করা বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা। তাই প্রত্যেক মানুষকে প্রতিটি কাজ পরিকল্পিত উপায়ে করা উচিৎ। একটি পারিকল্পিত পরিবার সমাজ ও দেশের জন্য খুবই জরুরি। দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও সুখী করতে পরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। পরিকল্পিত পরিবার বলতে বুঝায়, স্বামী-স্ত্রী দম্পতি পরামর্শ করে তাদের সুবিধাজনক সময়ে সন্তান গ্রহণ করা, সন্তানের সংখ্যা নির্ণয় করা, সন্তানের লেখাপড়ার বিষয় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা। এছাড়াও পারিবারিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড চিন্তা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রহণ করা। আর এক্ষেত্রে আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ মানুষকে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে পরিকল্পিত পরিবার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। সেই সাথে বিষয়টি নিয়ে সমাজের প্রচলিত ভুল ভেঙ্গে সঠিক বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেন।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন, জন সংখ্যার স্থিতি আনয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইমামদের ভূমিকা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অবিস্মরণীয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামগণ স্থানীয় পর্যায়ের সকল ইমামকে

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠিত করে এসব বিষয়ে পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে নতুন চিন্তা ও দৃষ্টি ভঙ্গির উন্মেষ ঘটাচ্ছেন। জাতীয় কল্যাণে এটা ইমামদের অনেক বড় অবদান। এক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলোকে প্রশিক্ষিত ইমামগণ মাঠ পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। শুক্রবার জুমার বয়ানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুবাদে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতনতার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দিচ্ছেন।

খাদ্য ও পুষ্টি জ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহের মধ্যে পুষ্টিহীনতা অন্যতম। পুষ্টির অভাবে মানুষ দুর্বল, রুগ্ন ও স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে। এতে কর্মশক্তি হ্রাস পায়। অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে বহু সংখ্যক মানুষ অন্ধ, বিকলাঙ্গ হয়ে চির কর্মহীন হয়ে পড়ে। শিশুদের পুষ্টিহীনতার কারণে তাদের মেধার পূর্ণ বিকাশে বিগ্ন ঘটে। শ্রমিকশ্রেণি অশিক্ষার দরুণ পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে যথাযথ শ্রমদানে অপরাগ হচ্ছে। এর ফলে দেশ মেধাবী, দক্ষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নাগরিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করেও কোন লাভ হচ্ছে না তাতে ভেজাল থাকার কারণে আথবা মাত্রাতিরিক্ত সার বিষ প্রয়োগের কারণে। আবার কোন কোন খাবারে ক্ষতিকর ফরমালিন ও ক্যামিক্যাল ব্যবহার করে খাদ্যগুণ বিনষ্ট করা হচ্ছে। এ সকল কারণে জাতি আজ হাজারো রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত। এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে আমাদের লক্ষ লক্ষ ইমাম সহাবেগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। ইমামগণ সামাজিকভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ায় সকলেই তাঁর কথাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করেন। তাই ইমামদের উচিৎ এসকল ব্যাপারে সচেতনভাবে জাতিকে সঠিক বুঝ প্রদান করা।

প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা প্রদান

স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইমামগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। যেমন: স্বাস্থ্য সম্মতভাবে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে স্যানিটারী টয়লেট ব্যবহার, মলমূত্র ত্যাগের পর সাবান বা ছাই অথবা মাটি ব্যবহার করে জীবানুমুক্ত হওয়া, নলকূপ বা ফুটানো পানি ব্যবহার করা, পানি বাহিত রোগ যথা ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েট, জন্ডিস ও আর্সেনিক সম্পর্কে ধারণা দেয়া, গর্ভবর্তী মায়েদের পরিচর্যা সম্পর্কে মুসল্লীদের সচেতন করা, শিশুদের রোগ প্রতিরোধ টিকা দানের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ইমামগণ অত্যন্ত জোড়ালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এছাড়া মুসল্লীদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও ধারণা দিতে পারেন। যেন সামান্য সমস্যায়ই তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে যান। যেমন ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইন গ্রহণ করা,সামান্য কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের অনুপাত প্রায় ১:৪৮৬৬। অথচ ইমামগণ শহর ও গ্রামে সমানভাবেই অবস্থান করেন। কারণ জনসংখ্যার হার অনুপাতে মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়। আর ইমামগণ সঙ্গত কারণেই দৈনিক পাঁচবার এবং সপ্তাহে একবার মহল্লাবাসীর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করার সুযোগ পান। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নিবিড় সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। তথ্যানুযায়ী ১৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

খ্রি. হতে ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত ইমামগণ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেছেন ৯১২৭৭৫ জনকে এবং অসুস্থ্য হলে ডাক্তারের নিকট পাঠিয়েছেন ২৫২০৪১২ জনকে।[১২৩] এ তথ্য নিঃসন্দেহে ইমামদের আগামী দিনের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে উৎসাহ যোগাবে। ইসলাম মানুষের সুস্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, হে নবী আপনার পোষাক পরিচ্ছদ ময়লামুক্ত পূত-পবিত্র রাখুন।[১২৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বাস্থ্য সম্মত বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাতলে দিয়েছেন, যেমন তিনি বলেন হাই তোলার সময় তোমরা মুখে হাত রাখ।[১২৫] অপর এক হাদীসে বলেন তোমাদের কারো কঠিন জ্বর হলে তার মাথায় ঠাণ্ডা পানি দাও।[১২৬]

রাসূল (সা.) নিজে শাক সবজি ও ফলমূল বেশি পছন্দ করতেন। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা) একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন, তোমরা তোমাদের পেটকে জানোয়ারের কবর বানিও না। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা কেবল গোশত খেয়োনা। গোশত ছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত অন্যান্য নিয়ামত দ্বারাও উপকারিতা লাভ কর। ফল এবং শাক-সবজির বেশি ব্যবহার গোশতের পরিমাণ হ্রাস করে এবং চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধতা আনয়ন করে। আমাদের ইমামগণ এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে আদর্শ সমাজ বির্নিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সচেতনতা সৃষ্টি

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এলাকার লোকদের সতর্ক করা হলেও অনেকেই এসব আগাম সতর্ক সংকেতকে আমলে নেয়না। এজন্য অনেক বড় মূল্য দিতে হয়। কিন্তু ইমাম সাহেবগণ মসজিদের মাইকে ঘোষণা করলে জন্ম-মৃত্যু সংবাদের মতই সাধারণ লোক তা অনুসরণ করে। পল্লী বা উপকূলীয় অঞ্চলের লোকদের কাঁচা ঘর-বাড়ির কারণে তারা পাকা মসজিদে ঠাঁই নেয়। এজন্য সরকার এখন আশ্রয় কেন্দ্রগুলোকে মসজিদ বানাতে চান। সারা বছর মসজিদ কমপ্লেক্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আবার দুর্যোগের দু'তিন দিন নারী-পুরুষ আবাল বৃদ্ধ বণিতা সেখানে আশ্রয় নিতে পারবে। তাদের প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য শৌচাগারেরও ব্যবস্থা থাকবে। তাদের গবাদি পশুর জন্যও থাকবে নিরাপদ আশ্রয়।[১২৭]

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইতিপূর্বে ইমামগণ ত্রানবিতরণে মানুষকে সহায়তা দিয়ে আসছেন। আমানতদারীর সাথে ত্রাণ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ইমাম ও মুসল্লীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা খুবই লাগসই। কারণ একই অঞ্চলের লোকেরা তাদের পথঘাট, লোকজনকে ভাল চেনেন ও মানেন। মসজিদ ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থা খুবই কার্যকর বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এক্ষেত্রে ইমামদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে।[১২৮]

---

১২৩. *ইমাম প্রশিক্ষণ সমাপনী স্বরণিকা ৭৭৮-তম দল*, ২০১৩, ২০১৪ অর্থ বছর, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ই.ফা.বা., ঢাকা: জানুয়ারি, ২০১৪

১২৪. আল-কুর'আন, ৭৪:৪

১২৫. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ২য় খ, হাদীস নং ৪৪৫৯

১২৬. প্রাগুক্ত, ১ম খ, হাদীস নং ১৪৭৪

১২৭. মুহাম্মদ আতাউর রহমান, ড. আব্দুলণ্যাহ মা'রফ, কাজী আবু হোরায়রা, *ইমামদের ক্ষমতায়ন*, পৃ. ৫২

১২৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি সরকারি ও বেসরকারী সংস্থাগুলো কোন তথ্য বা বার্তা, দুর্গম অঞ্চলে একযোগে সর্বত্র দ্রুত পৌঁছে দিতে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সহযোগিতা নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও তাদেরকে যদি কিছু সরঞ্জাম যেমন- রেডিও, মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মটর সাইকেল, বাই-সাইকেল, হ্যান্ড-মাইক ইত্যাদি সরবরাহ করা যায় তবে তাদের কর্মক্ষমতা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এমনকি একটি নির্ধারিত সম্মানী নিয়মিতভাবে প্রদান করে তথ্য অফিসারের মত তারও সেবা নেয়া যেতে পারে।[১২৯]

আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

আর্সেনিক এক ধরণের সাদা রঙের ধাতব পাউডার, যা প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এর কিছু কিছু যৌগিক আর্সেনাইট ও আর্সেনেট মারাত্মক বিষাক্ত এবং এগুলো ত্বকের ক্যান্সার কিডনি, যকৃৎ অকেজো, শ্বাস সমস্যা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে। অন্যান্য অসুখের মধ্যে রয়েছে- শরীরে কালচে বাদামী রঙের স্পট, হাতের তালু ও পায়ের তলা মোটা হয়ে যাওয়া এবং হাত পায়ের চামড়া উঠে যাওয়া ইত্যাদি।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ভিত্তিক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেন্টিভ এ্যন্ড সোস্যাল মেডিসিন (নিপসম) ১৭টি জেলার গ্রামীণ এলাকার ১০০০টি নলকূপের নমুনা পানি সংগ্রহ করে। এরমধ্যে কমপক্ষে ১৮০টি নমুনায় আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৯টি জেলায় আর্সেনিক আক্রমণের সন্ধান মেলে। এসব জেলোয় পানিতে আর্সেনিক বিষাক্ততার যে পরিমাণ পাওয়া গেছে, তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মাত্রার (০.০১) চেয়ে ২৫ থেকে ৩৫ গুণ বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে পানিতে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা হচ্ছে (০.০৫) পিপিএস। কিন্তু বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন সীমান্ত এলাকার জেলাগুলোতে নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা পেয়েছে ১.৫ থেকে ২পি পি এস।

ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল (ডিসিএইচ) আর্সেনিক পরিস্থিতির উপর একটি গবেষণা চালিয়েছে। এই গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, আর্সেনিক বিষে রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। যেসব এলাকায় আর্সেনিক বিষের আক্রমণের বিষয়টি মারাত্মক আকার নিয়েছে সেসব এলাকার জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সম্পূর্ণ দেশজ প্রযুক্তিতে নামমাত্র খরচে আর্সেনিক দূষিত পানিকে বিশুদ্ধ করার একটি পদ্ধতি অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে উদ্ভাবিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছেন বেসরকারী সংগঠন এলাজিং অ্যাজমা এনভাররনমেন্টাল রিসার্চ এনডস্কিন কেয়ার ইনস্টিটিউট এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ এম. এ. হাসান। এতে পানি আর্সেনিক দূষণ মুক্ত করতে দরকার শুধু ধানের তুষ বা নারকেলের মালা (খোল) কিংবা ছোবড়া পোড়ানো ছাই। এ পদ্ধতি অনুযায়ী নাড়কেলের ছোবড়া, মালা বা ধানের তুষের যে কোনও একটি পুড়িয়ে ছাই করতে হবে। এই ছাই চালনীতে ঢেলে সংরক্ষণ করতে হবে শুকনো পাত্রে। একমুঠো ছাইয়ের মধ্যে আধমুঠো পরিমাণ ফিটকারি আর্সেনিক যুক্ত ৪ লিটার পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে ১২ ঘণ্টা রেখে দিলেই পানির আর্সেনিক আলাদা হয়ে যাবে।

---

১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

এখন একজন ইমামের দায়িত্ব হল তাঁর এলাকার মানুষকে আর্সেনিক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে ব্যবহৃত পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা, আর পাওয়া গেলে আর্সেনিক যুক্ত পানি ব্যবহার না করতে পরামর্শ দেয়া আর প্রয়োজনে আর্সেনিক মুক্ত করে ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করা।

এইচ আই ভি ও এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

এইচ.আই.ভি (হিউম্যান ইম্যিউন ভেফিশিয়েন্স ভাইরাস) মানুষের শরীরে প্রবেশের পর মানব দেহে পরিলক্ষিত উপসর্গসমূহের সমাহারই হচ্ছে এইডস (এ্যাকোয়ার্ড ইম্যিউন ডেশিয়েন্সি সিনড্রোম) যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় রোগ প্রতিরোধের অভাবজনিত উপসর্গ। এইডস এমন এক ভয়াবহ রোগ যা দ্বারা একবার কেউ আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনিবার্য। এ যাবত এইডসের কোন ফলপ্রসু চিকিৎসা আবিস্কৃত হয়নি। এটা আল্লাহর অশেষ রহমত, যে ভয়াবহ হলেও এইডস প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগ। ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাথে এইডস প্রতিরোধের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নিম্নোক্ত উপায়ে সাধারণত এইডস রোগ ছড়ায়,

ক) অনিরাপদ অবাধ যৌনসঙ্গমের সাহায্যে।

খ) রক্ত সঞ্চালন অথবা মোড প্রডাক্টের মাধ্যমে।

গ) একই সূঁচ বা সিরিজ একাধিক লোকের ইনজেকশন নেবার ফলে।

ঘ) সংক্রামিত মায়ের সন্তান।

ঙ) সেলুনে ব্যবহৃত ব্লেডের মাধ্যমে।

এইডস রোগের প্রধানতম লক্ষণ হল:

ক) ওজন হ্রাস (শারীরিক ওজনের প্রায় দশ শতাংশ)

খ) ক্রনিক ডায়রিয়া (এক মাসের অধিক সময় স্থায়ী)

গ) দীর্ঘ স্থায়ী জ্বর (এক মাসের অধিক সময় ধরে)

এছাড়াও আরও কিছু লক্ষণ আছে যেমন:

- এক মাসের বেশি স্থায়ী জ্বর, কাশি, দুর্বলতা।
- গায়ে ব্যাথা ও লাল লাল চাকা বের হওয়া।
- মাথা ব্যাথা।
- লসিকা গ্রন্থ ফুলে যাওয়া।
- গিরায় গিরায় ব্যথা।
- একাধিকবার হারপেস জোস্টার এর সংক্রমন।
- দীর্ঘ সময় মুখ ও গলায় ছত্রাক সংক্রমন ইত্যাদি।

এইচ. আইভি ও এইডস থেকে পরিত্রাণের একমাত্র প্রধান উপায় হল ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা। ইসলামী অনুশাসন মেনে চললে ব্যাভিচারের মত জগণ্যতম পাপ করার কোন সুযোগ থাকবে না। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে ব্যাভিচারকে নিকৃষ্টতম পাপ বলে অভিহিত করেছে এবং বিবাহিত ব্যাভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়েছে। ব্যভিচারের ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে অসংখ্য

Dhaka University Institutional Repository

আয়াত নাযিল হয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী– ইহাদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।[১৩০] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, যিনার নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।[১৩১]

আল্লাহ আরো বলেন, আমি লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বের কেউ করে নাই। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়া পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।[১৩২]

অবৈধ যৌনাচার ও ব্যভিচারকে মহামারীর কারণ হিসেবে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- "হযরত ইব্ন আব্বাস হতে বর্ণিত, যখন কোন জাতি বা সম্প্রদায় আত্মসাৎ প্রবণ হয় তখন ভয়ভীতিতে তারা আক্রান্ত হয়, যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন মহামারী দেখা দেয়।

অনিয়ন্তিত যৌনাচার এইডস বিস্তারে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। শুধু একটি বার অবৈধ যৌন ক্রিয়া মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারে। নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ তার নিজের ভালমন্দ বিবেচনা না করে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়। পরিণামে সে নিজে যেমন তার জীবনের হুমকি বয়ে আনে তেমনি এর দ্বারা তার পরিবার, তথা সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপর দিকে নৈতিক স্খলনের কারণে সে ব্যভিচার, সমকামিতা, মাদকাসক্তি ইত্যাদিতেও প্রবৃত্ত হতে পারে। এ সকল কর্মও এইডস বিস্তারে সমভাবে দায়ী। সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, ইসলামী অনুশাসন মেনে নিয়ন্ত্রিত যৌনাচার এইচআইভি বিস্তার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলাম কখনো মানুষের যৌন চাহিদাকে অবদমিত করার পরামর্শ দেয়না। তাই ইসলাম বিয়ে করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বিয়ে স্বাস্থের জন্য উপকারী। অন্যদিকে বিয়ে না করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটা মানুষকে ব্যাভিচার, বিকৃত যৌনচার এবং যৌন সংশ্লিষ্ট অপরাপর অপরাধের পথে ধাবিত করে। ইসলাম প্রকৃতির সাথে মানুষের জৈবিক চাহিদার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃস্টি করার মধ্য দিয়ে মানুষকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করে। বিয়ে একটি মৌলিক সামাজিক প্রথা। ইসলামে বিয়ে গুরুত্বপূণ আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। ইসলাম কখনো অবৈধ ও বিকৃত যৌনাচার সমর্থন করে না। যৌন সম্ভোগের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক জৈবিক চাহিদা মেটানোর মধ্য দিয়ে মানসিক শান্তি ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনে বিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিয়ের দ্বারা অনেক উপকার লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ আছে তারা বিয়ে কর। কারণ বিয়ে তোমাদের পবিত্রতা রক্ষায় এবং দৃষ্টিকে সংযত রাখতে সাহায্য করে। অপরদিকে যাদের সামর্থ নেই

১৩০. আল-কুর'আন, ৩৩:৩৫
১৩১. আল-কুর'আন, ১৭:৩২
১৩২. আল-কুর'আন, ৭:৮০-৮১

Dhaka University Institutional Repository

তারা রোযা রাখ, কারণ রোযা যৌন ক্ষুধা সংবরণে সহায়ক। নবী করীম (সা.) আরও বলেন, "যে ব্যক্তি পুতপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষ্য প্রার্থনা করে সে যেন একজন মুক্ত (আযাদ) নারীকে বিয়ে করে। রাসূল আরও বলেন, "যে ব্যক্তি বিয়ে করল সে দ্বীন এর অর্ধেক পরিপূর্ণ করল।"

আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ এইচ আইভির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তার মুসল্লীদেরকে সচেতন করতে পারেন। পাশাপাশি ব্যভিচার বন্ধে মহল্লার মুসল্লীদের নিয়ে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে পারেন।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে অবদান

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষা মৌলিক অধিকার তাই শিক্ষা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। সম্মানিত ইমমাগণ তাঁর মহল্লার প্রতিটি মানুষকে শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। যেন একজন মানুষও অক্ষর জ্ঞান থেকে দূরে না থাকে সে ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। ছোট্ট বাচ্চাদেরকে মক্তবে আসার ব্যাপারে তাগিদ দান করতে পারেন। আর বয়স্কদেরকে নৈশকালীন স্কুলে পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সু-স্বাস্থ্য লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা। তাই ইমাম সাহেব তাঁর এলাকার সকল মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। অনিয়মতান্ত্রিক ও উচ্ছৃংখল জীবন পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক সুশৃংখল জীবনের গুরুত্ব মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন। এভাবে শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে অসামান্য অবদান রাখতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ মসজিদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা

দাওয়াত ও তাবলীগ কেন্দ্র

প্রত্যেকটি মসজিদে একটি করে দাওয়াত ও তাবলীগী কেন্দ্র থাকা আবশ্যক। আর এই তাবলীগী কেন্দ প্রতিষ্ঠা করতে নেতৃত্ব দান করবেন মসজিদের ইমাম সাহেব। তার সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি এ কেন্দ্রটি পরিচালনা করবেন। দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি মসজিদের নিয়মিত মুসল্লীদের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন। দ্বীন প্রচার ও প্রসারে নিয়মিত জামাত বিভিন্ন এলাকায় পাঠাবেন, তাদের খোঁজ খবর নিবেন আবার অন্য এলাকা থেকে যে সকল জামাত দ্বীনি কাজে এখানে আগমন করবেন। তিনি সব বিষয়ে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদ থেকে দাওয়াত ও তাবলীদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যে সকল মসজিদ থেকে এখনও দাওয়াতের কাজে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে সে সকল মসজিদের ইমামদের দায়িত্ব হল অতি তাড়াতাড়ি এ কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে কাজ শুরু করা। আর যে সব মসজিদ থেকে দুর্বলভাবে এ কাজ চলছে সেগুলোকে আরো বেগবান করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদ-ই-নববী থেকে দাওয়াতের কাজ করতেন।

দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব বর্ণনা করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[১৩৩]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[১৩৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন, যে আল্লাহর পথে আহ্বান করে তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে। সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।[১৩৫]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্মে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কর। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য ভাল হত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।[১৩৬]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, যুগের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।[১৩৭]

---

১৩৩. আল-কুর'আন, ০৫:৬৭
১৩৪. আল-কুর'আন, ১৬:১২৫
১৩৫. আল-কুর'আন, ৪১:৩৩
১৩৬. আল-কুর'আন, ০৩:১১০
১৩৭. আল-কুর'আন, ১০৩:১-৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, বল, এটাই আমার পথ: আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি স্বজ্ঞানে– আমি এবং আমার অনুসারিগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১৩৮]

দাওয়াতের গুরুত্ব তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنى ولو اية وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا خرج ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর। আর বনী ইসরাইল থেকে হাদীস বর্ণনা করতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তার নিজ চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত।[১৩৯]

অপরএক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن حذيفة رض أن النبى صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لتامرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليؤشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم.

হোযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহ্র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে) দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না।[১৪০]

عن أنس رض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تعفروا.

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সহজ কর, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না।[১৪১]

عن ابن مسعودٍ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرًا سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى له من سامع.

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে।[১৪২] পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের এ সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করে মুসল্লীদেরকে দ্বীনি কাজে উৎসাহ দান করা একজন ইমামের পবিত্র দায়িত্ব।

---

১৩৮. আল-কুর'আন, ১২:১০৮
১৩৯. *সহীহুল বুখারী*,
১৪০. *সুনানুত তিরমিযী*,
১৪১. *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*,
১৪২. *সুনানুত তিরমিযী, ও ইব্ন মাজাহ*

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রত্যেকটি মসজিদে একটি হজ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। আর এ হজ্জ প্রশিক্ষণের প্রধান প্রশিক্ষক থাকবেন উক্ত মসজিদের ইমাম। হজ্জ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। আর্থিক ও শারিরীক সামর্থ্যবান প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয। সাধারণ মুসলমানগণের উপর প্রশিক্ষণ ছাড়া হজ্জের ফরয ওয়াজিবসহ যাবতীয় বিধান সঠিকভাবে পালন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই সঠিকভাবে হজ্জ আদায় করার জন্য হজ্জ প্রশিক্ষণ অতীব জরুরি। তাই এজন্য একজন ইমাম সাহেবের জন্য এটার গুরুত্ব অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তিনি তাঁর মহল্লা থেকে হজ্জগামী নারী-পুরুষদেরকে নিয়ে হজ্জ বিষয়ক কর্মশালা গ্রহণ করে, প্রত্যেককেই হজ্জের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রাথমকি ধারণা প্রদান করবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে।[১৪৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যারা সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করলে সে জানে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।[১৪৪]

পবিত্র কুর'আনে আর এক আয়াতে ঘোষণা করা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করে নিও। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদয়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং ঘরে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যারা পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।[১৪৫]

হজ্জের গুরুত্ব তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن على بن ابى طالب، قال: لما نزلت: (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.) قالوا يا رسولَ الله! أفى كل عام؟ فسكت، فقالوا يا رسولَ الله! أفى كل عامٍ؟ قال: لا: ولو قلتُ نعم لو جبَتْ، (يايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم.)

১৪৩. আল-কুর'আন, ২২:২৭
১৪৪. আল-কুর'আন, ০৩:৯৭
১৪৫. আল-কুর'আন, ০২:১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ‘আলী (রা) বলেন, যখন (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.) এ আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবারা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! প্রত্যেক বছর কি হজ্জ করা জরুরি? রাসূলুল্লাহ (সা.) চুপ ছিলেন। অতঃপর সেই মুহূর্তে (অথবা অন্য মাজলিসে) সাহাবীগণ দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করলেন, প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ করা জরুরি? রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন বললেন, না। (সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে তৃতীয়বার তিনি উত্তরটি দিয়েছেন।) যদি আমি হাঁ বলতাম তাহলে প্রত্যেক বছরই হজ্জ ফরয হয়ে যেতো। রাবী বর্ণনা করেন, বারবার প্রশ্ন করা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলো: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেইসকল বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ হলে তা তোমাদেরকে কষ্ট দিবে।[১৪৬]

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من ملك زادًا وراحلةً تُبلغه إلى بيت الله ولم يحجَّ، فلا عليه ان يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا.

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তির কাছে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পাথেয় ও বাহন আছে কিন্তু সে হজ্জ করলো না? সে ইয়াহূদী কিংবা নাসারা হয়ে মৃত্যু বরণ করলে এতে আমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই।[১৪৭]

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحجِّ والعمرةِ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة. হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা হজ্জ ও ‘উমরা (হজ্জে কিরান) একত্রে কর। কেননা হজ্জ এবং ‘উমরা দারিদ্রতা ও গুনাহ এমনভাবে দূর করে যেমনিভাবে আগুন লোহা, স্বর্ণ, রূপাকে খাদ থেকে পৃথক করে। এমনিভাবে হজ্জ ও ‘উমরা মিলে গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়।[১৪৮]

প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

প্রত্যেকটি মসজিদকে এক একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এক্ষেত্রে একজন ইমামের অন্যতম দায়িত্ব নিজেও এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথির কোন কোর্স সম্পন্ন করে এই গুরুত্বপূর্ণ সেবাটুকু প্রদান করবেন। অথবা মসজিদের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলে ইমামের তত্ত্বাবধানে একজন বেতনভুক্ত ডাক্তারও নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। অন্যথায় স্থানীয় ডাক্তারদের অনারারী ভিত্তিতে কাজ করার জন্য ইমাম সাহেব অনুরোধ করতে পারেন। যেহেতু মানব সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তাই আশা করা যায় অনেক ডাক্তারই এই ‘অনারারী’ ভিত্তিতে রোগীদের প্রেসক্রিপশন করতে সম্মত হবেন। ডাক্তার সাহেব সপ্তাহের নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদের কোন এক জায়গায় বসবেন এবং রোগীদের চিকিৎসাপত্র দান করবেন। আগে থেকেই ডাক্তারের নির্ধারিত সময়

১৪৬. মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী, অনু. মুফতী মাসরূরুল হাসান, *তুহফাতুল আলমা‘ঈ*, ৩য় খণ্ড, অপ্রকাশিত।
১৪৭. প্রাগুক্ত।
১৪৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সবাইকে জানিয়ে দেয়া হবে। এর ফলে এলাকায় অসুস্থ ব্যক্তিরা সহজেই প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণের অপূর্ব সুযোগ লাভ করতে পারবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময় আহত সৈনিকদের চিকিৎসা ও সেবার কাজে মসজিদ ব্যবহৃত হত। যুদ্ধাহত মুজাহিদদের সেবা শুশ্রুষার কাজ মসজিদে হত। বিভিন্ন গোত্রের সেবক সেবিকার মাধ্যমে মসজিদ অথবা মসজিদের বারান্দায় তাবু খাঁটিয়ে আহতদের চিকিৎসা করার প্রমাণ হাদীস শরীফের বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়।[১৪৯]

খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লা (সা.) হযরত মুয়ায (রা.) কে বিশেষভাবে দেখা শুনার জন্য মসজিদে স্বতন্ত্র তাবু খাটানোর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।[১৫০]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে উপদেশ ও অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য। মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[১৫১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কুর'আন অবতির্ণ করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।[১৫২]

মুসলিম সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সমাজে সর্বপ্রকার সৎ প্রেরণা বা সৎ কাজের সুত্রপাত মসজিদ থেকেই। প্রাথমিক চিকিৎসা দানের ব্যাপারটি এর ব্যতিক্রম ছিল না। যদিও পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠান মসজিদ থেকে পৃথক হয়ে হাসপাতাল নাম ধারণ করে স্বতন্ত্ররূপ লাভ করেছে। তারপরও এ হাসপাতাল মসজিদের সন্নিকটে থাকত। তার কারণ ছিল এই যে, মুসলিমদের নিকট ইলমের বড় দুটি শাখা হল- (ক) ইলমুল আদয়ান তথা ধর্মীয় জ্ঞান (খ) ইলমুল আবদান তথা শরীর বিষয়ক জ্ঞান। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বৈশিষ্ট এই ছিল যে, আলিমগণ ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সাথে চিকিৎসা শাস্ত্র অবশ্যই অধ্যয়ন করতেন যাতে মানব সমাজের কিছুটা সেবা করতে পারেন আর একসাথে কিয়ৎ পরিমাণে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাও হতে পারে।[১৫৩] ইসলামী বিশ্বে সর্বপ্রথম খলীফা আল ওয়ালীদই ৮৮ হি. হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৬১ হি. ইবনে তুরণ দরিদ্র লোকদের জন্য আরোগ্য নিকেতন (শিফা খানা) নির্মাণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি মসজিদের পশ্চাদ্দেশে একটি দাওয়াখানা নির্মাণ করেন।[১৫৪] তাতে একজন চিকিৎসক পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে প্রতি শুক্রবারে বসতেন। ইব্ন জুবায়ের বলেন যে, এতে চিকিৎসা ঔষধ-পত্র ছাড়াও খাবার ও পোষাক পরিচ্ছদ সরকারের পক্ষ থেকে রোগীকে দেয়া হত। চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা সম্পর্কে ইব্ন আবী উসায়বিয়া বলেন যে, এই শিক্ষা ইসলামে অব্যাহত ও অবিচ্ছিন্ন ধারায় চালু ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা অধিকাংশ সময় হাসপাতালের মাধ্যমে প্রদান করা হত। প্রধান চিকিৎসক তাঁর

১৪৯. *আল-মাকরীযী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৮; বি.জি.এ. ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৬
১৫০. *আল-মাগফির*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২-২৩৮
১৫১. আল-কুর'আন, ১০:৫৭
১৫২. আল-কুর'আন, ১৭:৮২
১৫৩. কিতাবুল উযারা সম্পাদিত, Amedroz, পৃ. ২১
১৫৪. ইবন আবী উসার-বিআ, ১ম খণ্ড , পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুষ্পার্শের ছাত্রদিগকে একত্র করে শিক্ষা দিতেন এবং এ সকল ছাত্র রোগীর পরিচর্যার কাজে তাকে সাহায্য করত।[১৫৫] বর্তমানেও মসজিদের ইমাম সাহেবগণ ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও সেবামূলক এ কর্মকাণ্ডটি পুনরায় চালু করতে পারেন।

ইসলামী তাহযীব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে এমন কোন সময় বা স্থান নেই যে সম্পর্কে ইসলামের কোন দিক নির্দেশনা নেই অর্থাৎ মানব জীবনের সকল দিক সম্পর্কে পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনের নির্দেশ:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে।[১৫৬]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদেরকে একত্র করা হবে।[১৫৭]

ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনের চর্চায় সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম স্থান হচ্ছে মসজিদ। এই মসজিদ থেকেই ইসলামের যাবতীয় কৃষ্টি-কালচার সমাজে প্রচলিত হবে। আর এর প্রধান ভূমিকা পালনকারী হলেন মসজিদের সম্মানিত ইমাম। তিনি বিভিন্ন সময়ে মুসল্লীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করে থাকেন। তিনি উক্ত আলোচনা সভায় তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের আলোচনাসহ নবী রাসূল, পীর আওলিয়াদের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে সমাজে ইসলামী তাহযীব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। সেই সাথে সমাজ থেকে অপসংস্কৃতি, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দূর করণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

দুর্গতদের আশ্রয় ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

প্রতিটি মসজিদ দুর্গতদের এক একটি আশ্রয় ও সেবা কেন্দ্র। আপদকালীন সময়ে বিপদগ্রস্ত মানুষ মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে সাময়িক ঠাঁই খুঁজে নিয়ে বিপদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবে। আর এ কাজে একজন ইমাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের দেশে নিয়মিতভাবে বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন ও ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়মিত লেগেই থাকে। এই সময়ে ইমাম সাহেব তাঁর নেতৃত্বে আর্তমানবতার সেবায় ত্রাণ ফান্ড গঠন করতে পারেন। পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে দুর্গত এলাকায় পাঠাতে পারেন। বাস্তুভিটা উদ্বাস্তু মানুষকে ইমাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে মসজিদ সংলগ্ন কোন স্থানে তাঁবু খাঁটিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করার বন্দোবস্ত করতে পারেন। ইসলামের ইতিহাসে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই যে, মসজিদ নববী থেকে বিভিন্ন মুজাহিদ দলের জন্য সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা হত।

---

১৫৫. মওলানা শহীদুল ইসলাম, মসজিদে নবুবী (সা.)-এর কার্যক্রম, পৃ. ১৪৮

১৫৬. আল-কুর'আন, ০৬:১৬২

১৫৭. আল-কুর'আন, ০৬:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা বলেন, পানাহারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে।[১৫৮]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[১৫৯]

মেহমান খানা প্রতিষ্ঠা

আমাদের দেশের অনেক মসজিদ বাস টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট বা রেল স্টেসনে অবস্থিত। এইসব মসজিদের পাশে ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে একটি করে মেহমান খানা নির্মান করা যেতে পারে। কারণ মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনে দূরদুরান্তে সফর করতে হয়। আর এসব এলাকার মানুষ সচরাচর বেশি বিপদে পড়ে। তাই মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধানে ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে এসব জায়গায় মেহমানখানা নির্মিত হলে সাধারণ মানুষ অনেক উপকৃত হতে পারে। সফররত সরকারী কর্মচারী পথিক এমনকি মহল্লার কোন মুসল্লীর মেহমানরাও এখানে রাত যাপন করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, মুসলিম ইতিহাসে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় প্রচলিত আবাসিক হোটেলের কোন প্রচলন ছিল না। বরং মসজিদ সংলগ্ন মেহমান খানা অথবা রাস্তার পাশে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নির্মিত সরাইখানার প্রচলন ছিল। কারণ মুসাফির ও মেহমানদের খেদমত করাকে তারা ধর্মীয় নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানদের মর্যাদা দেয়।[১৬০] হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় কাফিরদের পর্যন্ত রাসূল মসজিদে নবুবীতে স্থান দিয়েছেন। তাদের সাথে যথাযথ মেহমানদারী করেছেন।[১৬১]

যাকাত ফান্ড প্রতিষ্ঠা

অর্থনীতি মানব সমাজের একটি অপরিহার্য অংশ। যা ছাড়া সমাজ ও জীবন অচল। লেনদেন কিভাবে করতে হবে, শরীয়া ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা সমাজে কিভাবে চালু হবে, অর্থ কিভাবে ধনীদের হাতে কুক্ষিতে না থেকে সমাজের সর্বত্র বিচরণ করবে মানুষের জীবনে ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে কিভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন হবে এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র বাতলে দিয়েছেন। মদীনা রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয় ছিল মসজিদে নববী আর হযরত উসমান ইব্ন আফফান (রা.) ছিলেন এ মন্ত্রনালয়ের মূল ব্যক্তিত্ব। এখান থেকে গোটা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আয় ব্যয় এবং জনগণের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করা হত। সুদ মুক্ত শরীয়া ভিত্তিক অর্থনীতির যে নযীর মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেছিল তা আজও পৃথিবীতে বিরল ইতিহাস। অতএব আমাদের সম্মানিত ইমামদেরকে ইসলামী অর্থনীতি জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং সমাজে প্রয়োগের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

---

১৫৮. আল-কুর'আন, ৭৬:০৮
১৫৯. আল-কুর'আন, ০৩:৯২
১৬০. কাজী আবু হুরায়রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি মসজিদে একটি করে যাকাত ফান্ড গড়ে তোলা দরকার। এক্ষেত্রে সম্মানিত ইমামগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ইমাম সাহেব তাঁর মসজিদের মুসল্লীদেরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে সমাজের ধনীদের থেকে যাকাতসহ বিভিন্ন দান সদকার টাকা সংগ্রহ করে সমাজের হত দরিদ্র লোকদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন। এতে করে সমাজের অসহায় নিঃস্ব মানুষগুলোর আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ইমাম সাহেব তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বের মাধ্যমে উক্ত টাকা দিয়ে সমাজের নির্দিষ্ট দু' একটি দরিদ্র পরিবারকে টার্গেট করে তাদের স্থায়ী আর্থিক সঙ্গতির জন্য রিক্সা, ভ্যান বা অন্যকোন ছোট খাঁটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেন। যাতে স্থায়ীভাবে তাদের একটি অর্থনৈতিক অবলম্বন অর্জন হয়। এভাবে প্রতি বছর একটি/দুটি পরিবারকে টার্গেট করে অর্থদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান করলে খুব অল্প সময়েই উক্ত সমাজ থেকে দরিদ্রতাকে ঝাটিয়ে বিদায় করা সম্ভব। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ নির্দেশ করেন,

সদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাজ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১৬২]

পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন, অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।[১৬৩]

অন্য আয়েতে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[১৬৪]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী হলো,

قال جرير ابن عبد الله بايعت النبى صلى الله عليه وسلم على اقام الصلوة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

হযরত জাবীর ইব্ন 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা.)-এর নিকট সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার উপর বায়'আত করি।[১৬৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

توخذ من اغنيائهم وترد إلى فقرائهم.

ধনীদের থেকে গ্রহণ করে তা দরিদ্রদের দেয়া হবে।[১৬৬]

---

১৬২. আল-কুর'আন, ০৯:৬০

১৬৩. আল-কুর'আন, ০৯:১১

১৬৪. আল-কুর'আন, ০২:২৭৬-২৭৭

১৬৫. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৮ম সংস্করণ, ২০১০ খ্রি., ৩য় খ, হাদীস নং ১৩১৯, পৃ. ৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

عن عدى بن حاتم رض قال سمعت رسول الله صلى الله يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বরেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর, এক টুকরা সদকা করে হলেও।[১৬৭]

পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

প্রতিটি মসজিদেই একটি পরামর্শ কেন্দ্র থাকা জরুরি। সংশ্লিষ্ট এলাকার মুসল্লীদের সহযোগিতায় ইমাম সাহেব পরামর্শ কেন্দ্র পরিচালনা করবেন। উক্ত মসজিদের মুসল্লীগণ সেখানে তাদের জাগতিক, ধর্মীয় ও পরকালীন সকল বিষয়ে পরামর্শ লাভের সুযোগ পাবে। ধর্মীয় ও পরকালীন বিষয়ে ইমাম নিজেই মুসল্লীদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে সচেষ্ট থাকবেন। আর জাগতিক বিষয়ে ইমাম সাহেবের সীমাবদ্ধতা থাকলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পণ্ডিতদেরকে বিষয় ভিত্তিক দিন ধার্য করে পরামর্শ দান করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। কেননা এটি একটি ইবাদাত। অর্থাৎ মানুষকে যে কোনভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, الدين النصيحة এতে করে সমাজের সাধারণ মানুষ মসজিদ থেকে পরামর্শ লাভ করে তাদের জীবনের সমস্যা সমাধানে একটি সহজ উপায় খুঁজে পাবে। মনোবিজ্ঞানীর মত গুরুত্বপূর্ণ ও সমাজের জন্য প্রয়োজনীর ব্যক্তিত্বদের পরামর্শ পেয়ে মানুষ সহজেই তাদের সমাধান খুঁজে পাবে। বিষয়ভিত্তিক পণ্ডিত ব্যক্তিগণের পাশাপাশি নিজেরাও নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে অনেক বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ লাভ করতে সমর্থ হবে। পরামর্শের গুরুত্ব তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন, স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি, তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংসা স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি যা জানি তা তোমরা জান না।[১৬৮]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর কর; যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।[১৬৯]

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[১৭০]

মসজিদে নবুবীতে আল্লাহর রাসূল সাহাবীদেরকে নিয়ে সর্বদাই পরামর্শ করতেন। যেমন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সকল সাহাবীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) পরামর্শ করেন। আবার বদর যুদ্ধের

১৬৬. আবূ আব্দুলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইব্‌নু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, যাকাত অধ্যায়, ২য় খ, পৃ. ১১৩
১৬৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩৩৪, পৃ. ১৬
১৬৮. আল-কুর'আন, ০২:৩০
১৬৯. আল-কুর'আন, ০৩:১৫৯
১৭০. আল-কুর'আন, ৪২:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধবন্দীদের নিয়েও রাসূলের পরামর্শ সর্বজ্ঞাত। এছাড়া রাসূল পরামর্শের গুরুত্ব তুলে ধরে ইরশাদ করেন,

عن ابى سلمة عن ابى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم وسلم قال المستشار مؤتمن.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, পরামর্শ লাভকারী ব্যক্তি নিরাপদ।[১৭১]

এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য,

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استشار احدكم اخاه فليستشر عليه.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট পরামর্শ চায় তখন তার উচিৎ তাকে সঠিক পরামর্শ প্রদান করা।[১৭২]

উপস্থাপিত আয়াত ও হাদীসে নববী দ্বারা নিঃসন্দেহে পরামর্শের গুরুত্ব পরিস্ফুটিত হয়। মহান রাব্বুল আলামীন অমুখাপেক্ষী সত্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে ফিরিশতাদের সাথে পরামর্শ করেন। খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে নিয়ে পরামর্শ করেন এবং হযরত সালমান ফারসী (রা) এর পরামর্শ গ্রহণ করেন। পরামর্শ নাম করণ একটি সূরার নামকরণ পরামর্শের গুরুত্ব বহুগুনে বৃদ্ধি করেছে। পরামর্শে যথেষ্ঠ বরকত নিহিত থাকে। পরামর্শ বিহীন একাকী কাজে শয়তান প্রশ্রয় নিতে পারে। অনেকের পরামর্শ ভিত্তিক কাজে ভুল কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভুল হলেও সকলের উপর এর দায়িত্ব বর্তায়, ফলে কোন একক ব্যক্তি বিপর্যস্ত হয়না। পরামর্শের প্রধান কেন্দ্র ছিল মসজিদ-ই-নববী এবং প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন উক্ত মসজিদের ইমাম রাসূলুল্লাহ (সা.)। অতএব আমাদের মসজিদ ও ইমামদেরকেও এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

জানাযা ও দাফন-কাফন বিভাগ প্রতিষ্ঠা

মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন ও জানাযার জন্য মসজিদ কেন্দ্রীক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকা জরুরি। ইমাম সাহেব মসজিদের মুয়াজ্জিন ও খাদেমসহ এলাকার দ্বীনদার কতিপয় মুসল্লীকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। যাদের কাজ হবে মহল্লার কোন ব্যক্তি ইন্তিকাল করলে তাকে শরীয়ত সম্মত পন্থায় গোছল করিয়ে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা। সেই সাথে মৃত ব্যক্তির শোকাহত পরিবারকে স্বান্তনা দেয়া এবং তাদের খাবার-দাবারের তদারকি করা। এক্ষেত্রে সম্মানিত ইমাম সাহেবের আরোও একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সমাজে যত কুসংস্কার ও বিদআত প্রচলিত আছে এর মুলোৎপাটন করা। যেমন কোন কোন এলাকায় দেখা যায় ৭/১৪ দিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির কবরে মোমবাতি, আগর বাতি প্রজ্জলন করা, তার কবরের কাছে গিয়ে আযান দেয়া ইত্যাদি। এ জাতীয় আরও যত বিদ'আত ও কুসংস্কার আছে সেগুলো দূর করে মৃত ব্যক্তির জন্য যে সকল আমল ও কার্যবলী তার নাজাতের জন্য উছিলা হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে শোকাহত পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করা। এই সময়-সাধারণত মৃত ব্যক্তির আপনজনদের অন্তর নরম থাকে তাই তাদেরকে দিয়ে বেশি বেশি নেক কাজ করিয়ে নেয়া বা তাদেরকে ইসলামী আদর্শের দিকে

১৭১. *আবূ দাউদ*, ১ম খ, ঢাকা: রশীদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ১২৭

১৭২. *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৪র্থ খ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান করা একজন ইমামের জন্য মোক্ষম সময়। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কয়েকদিন পর্যন্ত এ কাজগুলো করতেন। আর তার পরিবার পরিজনের খোঁজ খবর নিতেন এবং সাধ্য অনুযায়ী তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সচেষ্ট থাকতেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ ধারণ করে আমাদের মসজিদসমূহের ইমামদেরও দায়িত্ব হচ্ছে মুসল্লীদেরকে নিয়ে মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা আর তার পরিবার পরির্জনকে সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করা।

কুরবানী ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা

প্রতিটি মসজিদেই কুরবানী ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র কমিটি ভিত্তিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। যার নেতৃত্ব দান করবেন স্বয়ং মসজিদের ইমাম সাহেব। জিলহজ্জ মাস আসার পূর্ব থেকেই ইমাম সাহেব মসজিদের মুসল্লীদেরকে কুরবানীর যাবতীয় মাস'আলা মাসায়েল ও ফযিলত সম্পর্কে অবগত করবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।[১৭৩]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, আল্লাহর কাছে পৌঁছে না তাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়নদিগকে।[১৭৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লহারই উদ্দেশ্যে।[১৭৫]

হযরত ইব্ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কেউ যেন কুরবানীর গোশত তিন দিন না খায়।[১৭৬]

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নামায আদায় করে খুতবা দান করে ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কুরবানী করেছে সে যেন আবার কুরবানী করে।[১৭৭]

কুরবানীর দিন ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে মহল্লার কুরবানীর সকল পশু জবাই করা হবে। এরপর গোশত বণ্টন করার সময় তার কমিটির লোকদের নিয়ে প্রত্যেক যবেহ করা প্রাণীর একটি অংশ তথা $\frac{১}{৩}$ ভাগ মসজিদ প্রাঙ্গনে নিয়ে আসবেন। এরপর সমাজের দরিদ্র ও নিরীহ মানুষদের মাঝে সমান হারে উক্ত গোশত বণ্টন করে দিবেন। যাতে করে সমাজের সকল অসহায় মানুষ আল্লাহর

১৭৩. আল-কুর'আন, ১০৮:১-৩
১৭৪. আল-কুর'আন, ২২:৩৭
১৭৫. আল-কুর'আন, ০৬:১৬২
১৭৬. *সহীহ মুসলিম শরীফ*, অনুবাদ: শায়খুল হাদীস মোহাম্মদ আজীজুল হক, ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০৭, হাদীস নং ৪৯৪০, পৃ. ৭৬০
১৭৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৯২১, পৃ. ৭৫৮

Dhaka University Institutional Repository

মেহমানদারী গ্রহণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে সামর্থ হয়। এ সকল কাজের পাশাপাশি ইমাম সাহেরব অপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, মানুষকে কুরবানী পরবর্তী বর্জ পদার্থ পরিস্কার করার ব্যাপারে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনে তাঁর কমিটির লোকদের নিয়ে এ কাজে তদারকি করা। কারণ যদি কুরবানীর পশুর বর্জ্য পদার্থ যথাযথবাবে পরিস্কার করা না হয় তবে এগুলোর দুর্গন্ধ ছড়াবে এবং নানাবিধ রোগ ব্যাধি সমাজে সৃষ্টি হবে। এতে করে সমাজের সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই একজন যোগ্য ও সচেতন ইমামকে এসকল বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আঞ্জাম দেয়া প্রয়োজন।

বিচার ও সালিশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

প্রতিটি মসজিদেই একটি বিচার ও সালিশ কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। মসজিদের ইমামগণ স্থানীয় গণ্যমান্য ও সরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে মসজিদ কেন্দ্রীক একটি বিচার ও সালিশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন। স্থানীয় গ্রাম্য মাতব্বরদের মাধ্যমে যে সকল বিচারকার্য পরিচালিত হয় তা বন্ধ করে মসজিদ কেন্দ্রীক বিচার ও সালিশ কেন্দ্রের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে ইমাম সাহেবগণ সচেষ্ট থাকবেন। এতে গ্রামের সাদা-সিধা মনের নিরীহ মানুষটি ন্যায় বিচার পেতে সামর্থ হবে। কারণ অনেক সময় নিরীহ মানুষগুলো প্রচলিত গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। গ্রাম্য মাতব্বরগণ সামান্য উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে যালিমের পক্ষ অবলম্বন করে মাযলুমকে আরো কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে নিপতিত করে।

মদীনা রাষ্ট্রের বিচরালয় ছিল মসজিদে নববী। বিচারক ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। ইনসাফ ও সততার সাথে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন। কারো প্রতিই পক্ষপাতমূলক কোন ফয়সালা প্রদান করেননি। ফলে মদীনা রাষ্ট্রে কায়েম হয়েছে আইনের শাসন, প্রত্যেকেই পেয়েছে, তাদের নাগরিক অধিকার। যার ফলশ্রুতিতে মদীনার সমাজ ব্যবস্থা হয়েছে একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা। আজও যদি আমাদের সুযোগ্য ইমামগণ ন্যায় ও নিষ্ঠা, সততা ও ইনসাফ এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করতে পারেন তবে ঘূণে ধরা এ সমাজেও শান্তি ফিরে আসা সময়ের ব্যবধানমাত্র। আর এ কাজটি সুচারুরূপে বাস্তবায়নের জন্য ইমাম সাহেবদেরকে একদিকে যেমন শরয়ী আহকামগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে হবে অন্যদিক থেকে বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। তবেই তারা বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে বিচার ফয়সালা করতে সক্ষম হবেন। বিচার সংক্রান্ত মহান আল্লাহর নির্দেশ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।[১৭৮]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো; নবীগণ, যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তারা ইয়াহূদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত। আরও

১৭৮. আল-কুর'আন, ০৪:৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বিধান দিত রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির। আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে যখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম। ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছে তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা ফাসিক।[১৭৯]

বিচার কার্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن عبادة بن الصامت (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا حدود الله فى القريب والبعيد ولا تأخذكم فى الله لومة لائم.

হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলের উপর আল্লাহর দণ্ডসমূহ কার্যকর কর। আর আল্লাহর ব্যাপারে কোন উৎপীড়কের উৎপীড়ন যেন তোমাদেরকে বাঁধা প্রদান করতে না পারে।[১৮০]

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا على! اذا جلس اليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول انك اذا فعلت ذلك بين لك القضاء.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে আলী! যখন বাদী ও বিবাদী (উভয় পক্ষ) তোমার কাছে বিচার নিয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে ফয়সালা প্রদান করবেন না যতক্ষণ না তুমি প্রথম ব্যক্তির ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে তা শুন। এরূপ নিয়ম পালন করলেই কেবল তুমি সুষ্ঠু বিচারনীতি প্রতিষ্ঠিত করলে। [১৮১]

অপর এক হাদীসে আছে,

عن عبد الله بن زبير (رض) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يد الحاكم.

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর থেকে এ বিষয়ে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এই বিষয়ে ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, বিচারের সময় বিবাদমান উভয় পক্ষকে বিচারকের সম্মুখে বসাতে হবে।[১৮২]

---

১৭৯. আল-কুর'আন, ০৫:৪৪, ৪৫,৪৭
১৮০. ইব্ন মাজাহ, ২য় খ, পৃ. ১১৮
১৮১. আবূ দাউদ, ১ম খ, পৃ. ১২৩
১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন ও ভোট কার্যে সহযোগিতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

প্রতিটি মসজিদেই নির্বাচন ও ভোট কার্যে সহযোগিতা কেন্দ্র নামে কিছু লোকের মাধ্যমে একটি সংগঠন থাকা প্রয়োজন। ইমাম সাহেব সমাজ সচেতন মুসল্লীদের মাধ্যমে এর কার্যাবলী সম্পাদন করবেন। বর্তমানে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক মুসলিম প্রধান দেশ। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে নিয়ে প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত সকল ব্যক্তিই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তাই আমাদের দেশের ভোটের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি নাগরিক যেন তার গুরুত্বপূর্ণ ভোট দানে পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান করতে পারে এটা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু তারপরও একজন ইমাম জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি তার এ অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে জনগণকে সচেতন করা, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দান করা, নির্বাচন কোন রকম অন্যায় বা পেশী শক্তির প্রদর্শন না করা, আইনের প্রতি মানুষকে সজাগ করাসহ নির্বাচনে ও ভোট সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে ইমাম সাহেব মসজিদের খুৎবায় বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করার মাধ্যমে ভোট কার্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ আছে।

উকিল চেম্বার গঠন

প্রতিটি মসজিদ কেন্দ্রীক উকিল চেম্বার গঠন করা যেতে পারে। মসজিদের ইমাম সাহেবগণ সংশ্লিষ্ট সমাজে বসবাসরত উকিলদের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। কারণ সমাজের নিরীহ লোকেরা অনেক সময় না বুঝেই ছোটখাটো বিষয়ে মামলা-মোকাদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত পরামর্শের অভাবে মামলা চালাতে গিয়ে বিষয়-সম্পদ ও ঘর বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এসব ক্ষেত্রে আইন ব্যবসায়ীগণ আইনি বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে এসব লোকদের সাহায্য করতে পারেন। বিশেষ করে গরীব ও অশিক্ষিত লোকেরা এধরণের কর্মসূচি থেকে বিশেষ ফায়দা পেতে পারেন। আইনবিদরা নির্দিষ্ট দিনে মসজিদে বসবেন এবং যারা পরামর্শের জন্য আসবেন তাদেরকে বিনা ফিতে অথবা অল্প ফিতে আইনি পরামর্শ প্রদান করবেন।

পুস্তক প্রকাশনা, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেব মসজিদ কমিটি ও অন্যান্য মুসল্লীদের সাহায্য সহযোগিতায় বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ করার উদ্যোগ নিতে পারেন। এতে করে মসজিদের মুসল্লীদের মাঝে পড়া ও লেখার মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে। তারা ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে। ষান্মাষিক ও বাৎসরিক বিভিন্ন বিষয় সংবলিত ম্যাগাজিন বের করতে পারেন। সেই সাথে বিষয়ভিত্তিক ভাল বই বিক্রি করে প্রকাশনা বিভাগের ফান্ডও সমৃদ্ধি করতে পারেন। ইমাম সাহেব মুসল্লিদের মাধ্যমে মসজিদ কেন্দ্রীক বইমেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে ইসলামী ক্যালিওগ্রাফীসহ দেশ বিদেশের ঐতিহ্যবাহী মসজিদের ছবি প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা যেতে পারে। এভাবে ইমাম সাহেব নানাভাবে মসজিদ কেন্দ্রীক বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কাজের আঞ্জাম দিতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইমাম প্রশিক্ষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইমাম প্রশিক্ষণ পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইমাম প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইমাম প্রশিক্ষণ পরিচিতি

প্রশিক্ষণ পরিচিতি

প্রশিক্ষণের সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করা কঠিন। সাধারণভাবে বলা যায় যে, "কোন কার্যসম্পাদনে কোন কর্মীকে যোগ্য করে তোলার জন্য হাতে কলমে শিক্ষা দান করাকে প্রশিক্ষণ বলে।" আবার বলা যায় যে, কোন বিশেষ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ায় কোন কর্মীকে কোন বিশেষ কাজে দক্ষতা, কর্মক্ষমতা ও প্রবণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে গড়ে তোলার নাম প্রশিক্ষণ।[১] প্রশিক্ষণ একটি দ্বিমুখী কর্মপ্রবাহ। প্রশিক্ষক মূলত শিক্ষক হলেও প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষার্থী নন। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞানের স্তরে ব্যবধান খুবই সামান্য। দু'জন সমান পংক্তিতে বসতে না পারলেও তাদের পংক্তির মধ্যে ব্যবধান দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না।[২] এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ এক বিষয় নয়। উপরে প্রশিক্ষণের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষণ অনেকটা এর কাছাকাছি হলেও বেশ পার্থক্য রয়েছে। 'শিক্ষণ' এটিও প্রশিক্ষণের মতো দ্বিমুখী কর্মপ্রবাহ। তবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। শিক্ষক সবজান্তা না হলেও অনেক বেশি জানেন। তার নিজের বিষয়ে তাকে পারদর্শী বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান তার চেয়ে অনেক অনেক কম। শিক্ষক থাকেন জ্ঞানের অনেক উচ্চ পর্যায়ে। ব্যতিক্রম খুবই বিরল।[৩] তবে বাস্তবতা হলো, এই শিক্ষণ বা প্রশিক্ষণ প্রথমদিকে আনুষ্ঠানিক কোন বিষয় ছিল না। বরং শিক্ষা ছিল ধর্ম প্রবর্তকের মুখ নিঃসৃত বাণী এবং ধর্মের বিস্মৃত জ্ঞান পুনরুদ্ধারে এক প্রচারণামূলক প্রচেষ্টা। তৎকালে সম্ভ্রান্ত বংশীয়, গোত্রচেতনা সম্পন্ন ও জাতির কর্ণধার ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সুন্নত শিক্ষা দান করতেন। এটা কোন পেশাধারী শিক্ষা ছিল না। সুতরাং জ্ঞানার্জন এখন এমন একটি বিষয়, যার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং তারই আকর্ষণে তা ক্রমশ শিল্পকর্মও পেশায় পরিণত হয়।[৪]

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো জিজ্ঞাসা, মনোবল, দক্ষতা এবং জ্ঞান।[৫] তবে সমাজ বিজ্ঞান কসকিও মনে করেন, জ্ঞান উপরিউক্ত তিনটি বিষয়সহ সামাজিক আচরণের পরিবর্তন কে অন্তর্ভুক্ত করে। Coscio-এর মতে Training consists of planned programmes designed to improve performance at the individual, group and/or organization levels. Improved performance inturn implies that there have been measurable changes in knowledge, skills, attitude and social behaviour.[৬] অর্থাৎ "প্রশিক্ষণ হলো ব্যক্তিক ও প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উন্নত কর্ম সম্পাদনের পরিকল্পিত কর্মসূচি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে,

---

১. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল* (ঢাকা: ২০০৯), পৃ. ৮৭

২. শেহাব উদ্দিন আহমদ, *শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ* (হোসনে আরা শাহেদ) সম্পাদিত, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০২ পৃ. ৫৯২

৩. প্রাগুক্ত।

৪. ইব্‌ন খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, প্রথম খণ্ড, *গোলাম সামদানী কোরায়শী* (অনূদিত), ঢাকা-২০০৭, পৃ. ১০৬-১০৭

৫. শেহাব উদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩

৬. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষণ একজন প্রশিক্ষাণার্থীর মধ্যে ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হলো ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য যে কোন সংগঠনের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সাংগঠিক সফলতার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। কারণ প্রশিক্ষণ এমন একটি ধারাবাহিক বা নিরবচ্ছিন্ন ও সমন্বিত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজন, সমস্যা ও জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। প্রশিক্ষণের কতিপয় মহৎ ফলদানকারী উদ্দেশ্য থাকার কারণেই বর্তমানে জটিল উৎপাদন ব্যবস্থায় এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষতার উন্নয়নই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। এতে ব্যক্তিগতভাবে কর্মী উপকৃত হবার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানও বিশেষভাবে উপকৃত হয়। প্রশিক্ষণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার সংকট দূর করে। এটি একটি ধারাবাহিক কর্মী উন্নয়ন কার্যক্রম। এর মাধ্যমে কর্মীদেরকে দক্ষতার সাথে কাজ করার যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য নতুন কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দান করা, কর্মীদের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করা, বিশেষ কাজে দক্ষ করে তোলা, পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ও পুরনো কর্মীদেরকে নিষ্ক্রিয়তা থেকে রক্ষা করা। কারণ যে কোন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সময় পুরনো কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। নিচে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করা হলো[৭]:

- ❖ দক্ষতার উন্নয়ন
- ❖ সংগঠনের নীতি ও তত্ত্বাধায়কের চিন্তাধারা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান
- ❖ মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ন
- ❖ সাধারণ কর্মী ও সুপারভাইজারগণকে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করা
- ❖ আচরণ পরিবর্তন
- ❖ নিরাপত্তা বিধান
- ❖ অপচয়হ্রাস
- ❖ মনোভাবের পরিবর্তন
- ❖ কর্মীর নিষ্ক্রিয়তা দূরীকরণ
- ❖ বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন
- ❖ সামাজিক দক্ষতা উন্নয়ন
- ❖ উৎপদনশীলতা বৃদ্ধি
- ❖ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি
- ❖ বহুমুখী জ্ঞান দান

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আলোকে প্রশিক্ষণ

ইসলামে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে কতগুলো তৎপরতা চিহ্নিতকরণ বুঝায় যা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ করে তোলে, তাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত ও বিকাশিত করে এবং নেতৃত্ব ও দাওয়াত দানে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ ইসলামী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ইসলামী প্রত্যয়, উপলব্ধি ও চেতনার একটি মৌলিক ভিত্তি আছে এবং এক্ষেত্রে এ ভিত্তির উপর সবকিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

এখানে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্য হলো মানুষের সাথে তার সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কের মর্মবাণী চিহিত করা এবং সেগুলো অর্জনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ সকল কর্মসূচীতে ব্যবহৃত শিক্ষামূলক বিষয়গুলোর লক্ষ্য হলো প্রশিক্ষণার্থীদের ঈমান ও প্রত্যয় বৃদ্ধি করা এবং তাদের ইসলামি ধ্যান-ধারণার বিস্তার ও প্রসার ঘটানো।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ইসলামের আলোকে প্রশিক্ষণের ৭টি মূল বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। যেমন :

- ❖ দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোভাব
- ❖ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি
- ❖ দলীয় মেজাজ
- ❖ আধ্যাত্মিক উন্নয়ন
- ❖ জ্ঞানার্জন এবং ইসলামের সঠিক উপলব্ধি
- ❖ সমসাময়িক কালের ধর্ম এবং আদর্শগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ
- ❖ দাওয়াতি কাজের দক্ষতা এবং মাধ্যম

প্রশিক্ষণের উপকারিতা

কর্মীকে আরও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলাই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। তাই বলা যায়, প্রশিক্ষণ সব প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধাজনক। প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া কর্মী এবং প্রতিষ্ঠান উভয়কে কতকগুলো সুবিধা প্রদান করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী মূল্যবান কর্মীতে পরিণত হয়। আর প্রতিষ্ঠান তার বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। নিচে প্রশিক্ষণের সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলো।[৮]

✯ মনোবল বৃদ্ধি ✯ উন্নত পণ্য এবং সেবা উৎপাদন ✯ দুর্ঘটনার হ্রাস ঘটানো ✯ সময় ও সম্পদের অপচয় হ্রাস ✯ মানব মূলধন গঠন ✯ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ✯ প্রয়োজন নির্ধারণ ✯ ভুল-ত্রুটিমুক্ততা ✯ ইতিবাচক আচরণ ✯ দ্রুত সম্প্রসারণ ✯ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা উন্নয়ন ✯ আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি বিভাগ হচ্ছে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামগণের ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার জন্যই সর্বপ্রথম ১৯৭৮ খ্রি. দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-৭০খ্রি.) পরীক্ষামূলকভাবে ১০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ধর্মীয় নেতাদের (ইমাম-মুয়াজ্জিন) প্রশিক্ষণ নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৯ খ্রি. ১০ নভেম্বর থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রকল্পের অধীনে মোট ৫৩৬ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জিত হওয়ায় পরবর্তীতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২৯৭.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৭৯৪.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরপর দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প দু'টির অধীনে যথাক্রমে ১২,২১২ এবং ১৪,০৭৫ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার প্রেক্ষিতে ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মোট ৬০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭,০০০ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।[৯] প্রকল্পটির সফলতার নিরিখে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আরো ৩টি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির তৃতীয় পর্যায় বাস্তবায়নে জুন ২০০১ সময়ে সমাপ্ত হয়। ১৯৭৮ থেকে ২০০১ মেয়াদে বাস্তাবায়িত ৪টি প্রকল্পের (পরীক্ষামূলক প্রকল্পসহ) আওতায় মোট ৩৮৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৩,৩৩৫ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায় ছিল জুলাই ২০০১ থেকে জুন ২০০৪ সময়কাল পর্যন্ত। প্রকল্পটি জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এর মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়ে পূর্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। ২০০৪ সালে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বাজেট নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় ৩৩০০ জন ইমামকে ৪৫ দিনের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং ১৪০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামকে রিফ্রেসার্স কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, দিনাজপুর ও সিলেট এই ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানদানের পাশাপাশি গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বনায়ন, প্রাণী সম্পদ পালন ও মৎস্য চাষ, প্রাক-প্রাথমিক/ প্রাথমিক বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিতি ইসলামি ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ও পরিচিত ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে উপার্জনক্ষম এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মত উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

---

৯. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাস্ড়বায়নাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশ, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ, জুলাই-১৯৯৪, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ❖ মসজিদে নববীর অনুকরণে বাংলাদেশের মসজিদগুলোকে পুনর্গঠিত করা।
- ❖ কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোকে পুনর্বিন্যস করা।
- ❖ বাংলাদেশের ধর্মীয় নেতা তথা মসজিদের ইমামগণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে অধিকতর শক্তিশালী নেতৃত্বদানে সক্ষম করে গড়ে তোলা।
- ❖ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে দক্ষ ও কর্মতৎপর করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- ❖ অন্যান্য সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূলবোধসহ দ্বীনি কর্মসূচি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।[১০]

১০. প্রকল্প দলীল, ৪র্থ পর্যায়, মার্চ-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইমাম প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির নিয়মিত কোর্সের নাম ও মেয়াদকাল:[১১]

ক্র নং	কোর্সের নাম	মেয়াদ
১)	নিয়মিত ইমাম প্রশিক্ষণ	৪৫ দিন
২)	রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ কোর্স	৫ দিন
৩)	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	১৫ দিন
৪)	কর্মচারী প্রশিক্ষণ	১৫ দিন
৫)	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২ মাস
৬)	মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম	৪ দিন
৭)	মানবাধিকার প্রশিক্ষণ	৭ দিন
৮)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৫ দিন
৯)	মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৩০ দিন
১০)	মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ	৩০ দিন
১১)	এইচ আইভি এইডস প্রতিরোধ বিষয় প্রশিক্ষণ	৩ দিন
১২)	এলওআই বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ দিন
১৩)	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ প্রশিক্ষণ	৩ দিন
১৪)	সরকারী কর্মকর্তাদের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়ন বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	৩ দিন
১৫)	মাতৃ ও শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ দিন
১৬)	নিরাপদ অভিবাসন প্রশিক্ষণ	৩ দিন
১৭)	মসজিদের মোতাওয়াল্লী ও ম্যারিজ রেজিস্টারদের প্রশিক্ষণ	৩ দিন
১৮)	গণশিক্ষা প্রকল্পের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ	৬ দিন
১৯)	গণশিক্ষা প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার প্রশিক্ষণ	৬ দিন
২০)	গণশিক্ষা প্রকল্পের গণশিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	৪ দিন

১১. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ এমরান, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কার্যক্রম: একটি পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানু-মার্চ, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির শুরু থেকে জুন ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা ও প্রশিক্ষণের বিষয়[১২]

ক্র. নং	বিষয়	ইমামদের সংখ্যা
১)	নিয়মিত প্রশিক্ষণ	৮০৯৮৪ জন
২)	রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	২৫১৭৩ জন
৩)	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	৩৭৩ জন
৪)	কর্মচারী প্রশিক্ষণ	৯৭৯ জন
৫)	মানব সম্পদ প্রশিক্ষণ	৩১৩৪৮ জন
৬)	মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ	১৫৯৪ জন
৭)	মক্তব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	১৫৯৮ জন
৮)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৫৮২ জন
৯)	মানবাধিকার বিষয় প্রশিক্ষণ	৪০০ জন
১০)	এইচ আইভি/এইডস প্রশিক্ষণ	২০০ জন
১১)	ইউ এস এ আইডি প্রশিক্ষণ (আমেরিকান সেন্টারের)	১৫৭০৩ জন
১২)	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২০৯৪ জন
১৩)	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধনকরণ	১৫০ জন
১৪)	সরকারী কর্মকর্তাদের নৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	৩০০ জন
১৫)	মাতৃ ও শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৪৫০ জন
১৬)	নিরাপদ অভিবাসন প্রশিক্ষণ কোর্স	১০০০ জন
১৭)	মসজিদ মোতাওয়াল্লী ও ম্যারেজ রেজিষ্টারদের প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫০ জন
১৮)	গণশিক্ষা প্রকল্পের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ-৬দিন	১০ জন
১৯)	গণশিক্ষা প্রকল্পের ফিল্ড সুপার ভাইজার প্রশিক্ষণ	১৫৪ জন
২০)	গণশিক্ষা প্রকল্পের গণশিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	১৩৬ জন
২১)	ইফাঃকর্মকর্তা ও কমৃচারীদের বেসিক কম্পিটার কোর্স	১৯০৯ জন
	মোট	**১,৬৫,২৮৭ জন**

১২. প্রাগুক্ত, *ইমাম*, (ই.ফা.বা., ২০১৪ খ্রি.) পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির শুরু থেকে ডিসেম্বর-২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের কর্মতৎপরতা[১৩]

ক্র. নং	বিষয়	সংখ্যা
১)	মসজিদে মক্তব ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছেন	১২৫০০ জন
২)	এসব বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	১৬০২৪৫০ জন
৩)	অন্যান্য মসজিদে মক্তব ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছেন	১২৫০০ জন
৪)	নিরক্ষরতা দূর করেছেন	৭৫০৫২৫০ জন
৫)	মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন	৮৩৩৬ জন
৬)	এসব পাঠাগারে পুস্তকের সংখ্যা	৭০৫৪২ জন
৭)	এসব পাঠাগারে দৈনিক পাঠকের সংখ্যা	৫৭৫৫৬০ টি
৮)	প্রশিক্ষণগ্রহণের ফলে সংশ্লিষ্ট ইমামগণের মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে	৫৭৫৪১৩ জন
৯)	প্রাথমিক চিকিৎসা দান করেছেন	৯১২৭৭৫ জন
১০)	ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করেছেন	২৫২০৪১২ জন
১১)	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি সাধনে পরামর্শ দিয়েছেন	৯৫০৯১৩ জন
১২)	ব্যক্তিগত ও মসজিদের পুকুরে মাছ চাষ করেছেন	২২৯১৪২০ জন
১৩)	এসব পুকুরে মাছ চাষ থেকে প্রতি বছরে আয়ের পরিমাণ	৭০০৮৫৫৭ টাকা
১৪)	ইমামগণ ব্যক্তিগতভাবে হাঁস-মুরগীর খাবার প্রতিষ্ঠা করেছেন	১২০২০ টি
১৫)	এসব খামারে হাঁস মুরগীর সংখ্যা	৮২০০০০ টি
১৬)	মুসল্লীদের উদ্বুদ্ধ করায় পারিবারিক হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে	৬৮০০০ টি
১৭)	হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা করেছেন	১২৫০০ টি
১৮)	গবাদি পশুর চিকিৎসা করেছেন	৯৭৭৫২০ টি
১৯)	গবাদি পশুর চিকিৎসা সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছে	১০৭৫২২ জন
২০)	আধুনিক পশুর চিকিৎসা সম্পর্কে পরামর্শ	৩৫০২৫৭ জন
২১)	বৃক্ষরোপন করেছেন	১৭৭৮০৯৮৭ জন
২২)	ইমামের পরামর্শে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে	৩৩২৫০৫০০ জন
২৩)	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামদের মাধ্যমে উপকার ভোগীর সংখ্যা	২০৭১৯২২ জন
২৪)	সমবায় সমিতি গঠন করেছেন	৭৫৬০ টি
২৫)	প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মোট আয় বেড়েছে	১৫৬৮২ টাকা
২৬)	প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মাথা পিছু আয় বেড়েছে (গড়ে)	১৫৬৮২ টাকা
২৭)	মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে খুতবার আগে বাংলায় বক্তব্য রাখেন	১৭৩৬৮ জন
২৮)	জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে অবদানের পরিমাণ (আনুমানিক)	৬৯৮৭২ কোটি টাকা

১৩. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, স্মরণিকা, *ইমাম*, (ই.ফা.বা., ২০১৪ খ্রি.) পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

২০০৯-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বিভাগ ওয়ারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা[১৪]

ক্রমিক নং	বিভাগ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা	
		নিয়মিত	রিফ্রেসার্স
০১	রংপুর	৮,৪৩০ জন	৩,৪৬২ জন
০২	রাজশাহী	১০,৭৫২ জন	২,৪৭৯ জন
০৩	খুলনা	৮,০৭৭ জন	২,৪৯২ জন
০৪	বরিশাল	৪,৮৫৭ জন	২,০৯৮ জন
০৫	ঢাকা	১৮,৩৯৯ জন	৪,১৮৭ জন
০৬	সিলেট	৫,০২৯ জন	১,৭৬৭ জন
০৭	চট্টগ্রাম	১০,৭৮৩ জন	৩,২৮৭ জন
	মোট	**৬৬,৩২৭ জন**	**১৯,৭৭২ জন**

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির নিয়মিত কোর্সের বিদ্যমান সিলেবাসের নম্বর ও ক্লাস[১৫]

ক্র. নং	বিষয়	নম্বর	ক্লাস
১)	ইসলামিয়্যাত	১০০	৪০
২)	প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১০০	৩৫
৩)	প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১০০	২৫
৪)	কৃষি ও বনায়ন	১০০	২৩
৫)	প্রাণী সম্পদ পালন ও মৎস্য চাষ	১০০	২৩
৬)	বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি	৫০	১০
৭)	পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন	৫০	১০
৮)	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিতি	৫০	১৫
৯)	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ও পরিচিতি	৫০	৪
১০)	ব্যবহারিক / মৌখিক	১০০	-
	সর্বমোট	**৮০০**	**১৮৫টি**

১৪. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৫. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, স্মরণিকা, *আল-ইমামত*, (ই.ফা.বা., ২০১৩ খ্রি.) পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬-২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত বছর ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা[১৬]

বছর	ইমামদের সংখ্যা
১৯৮৬-৮৭	২২৬১ জন
১৯৮৭-৮৮	৩৮৯৫ জন
১৯৮৮-৮৯	২২১৩ জন
১৯৮৯-৯০	২৪৯১ জন
১৯৯১-৯২	১৮৩৮ জন
১৯৯৩-৯৪	১৬৯৭ জন
১৯৯৪-৯৫	১৭২৫ জন
১৯৯৫-৯৬	১৬২৪ জন
১৯৯৬-৯৭	২১০৬ জন
১৯৯৭-৯৮	১১৪৪ জন
১৯৯৮-৯৯	৯৫২ জন
১৯৯৯-২০০০	২১০৭ জন
২০০০-০১	২০৬১ জন
২০০১-০২	১৪৯৭ জন
২০০২-০৩	৮০০ জন
২০০৩-০৪	৩০৯১ জন
২০০৪-০৫	১৩৯৭ জন
২০০৫-০৬	১৮৯৭ জন
২০০৬-০৭	১৮৫৬ জন
২০০৭-০৮	৩১১৮ জন
২০০৮-০৯	৩১৭৩ জন
২০০৯-১০	২১৯৭ জন
২০১০-১১	৩১৮২ জন
২০১১-১২	৩১৪৫ জন
২০১২-১৩	৩২১৭ জন
২০১৩-১৪	৩২৩১ জন

১৬. ইমাম ট্রেনিং একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগওয়ারী মসজিদের সংখ্যা[১৭]

ক্রমিক নং	বিভাগ	মসজিদের সংখ্যা
০১	রংপুর	৩২,১৭৭ টি
০২	রাজশাহী	৩৭,৫৯৫টি
০৩	খুলনা	২৫,১৭৮টি
০৪	বরিশাল	২৭,৯১০টি
০৫	ঢাকা	৬৯,২৭৮টি
০৬	সিলেট	১৬,১২২টি
০৭	চট্টগ্রাম	৪২,১৯৩টি
	মোট	**২,৫০,৩৯৯টি**

▣ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির সীমাবদ্ধতা এবং তা উত্তোরণে কতিপয় প্রস্তাবনা

১৯৭৮ খ্রি. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির যাত্রা শুরু। শুরু থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পাইলট প্রকল্পের অধীন ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এরপর ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছর থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত নিয়মিত ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম অব্যাহতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছর থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬,৩২৭জন। যা মসজিদের সংখ্যার তুলনায় খুবই কম। আবার বিভাগভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা বিবেচনা করলেও এটা প্রতীয়মান হয় যে, বিভাগের মসজিদের তুলনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের আনুপাতিক হার খুবই কম। বছর ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরে তাদের সংখ্যা ছিল ২২৬১ জন। সুদীর্ঘ ২৮ বছর পরেও ইমামদের সংখ্যা খুব কমই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২৩১ জন। দীর্ঘ ২৮ বছরে এই সংখ্যাটা আরো বৃদ্ধি পেতে পারত।

আবার কোর্সের মেয়াদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই। অনেক কোর্সের সময়সীমা মাত্র তিনদিন। সত্যিকার অর্থেই মাত্র তিনি দিনে কোন কোর্স পরিপূর্ণতা পায়না। সময়ের বিবেচনায় এটা অসম্পূর্ণ।

৩৬ বছর পরেও ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি বিভাগ ভিত্তিক তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এত দীর্ঘ সময়ে প্রত্যেক জেলা ভিত্তিক তাদের কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন ছিল। সেই সাথে এখনও কতিপয় বিষয়েই প্রশিক্ষণ করানো হয়। এখানে যুগের চাহিদা অনুযায়ী আরো অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত

১৭. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

করা প্রয়োজন। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রয়োজনের তুলনায় লোকবল অনেক কম বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

বিভিন্ন মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বলা যায়, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ইমামগণ স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী এবং স্ব-উদ্যেগে বনায়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, মৎস চাষ, গবাদি পশু পালন, হাস-মুরগী পালন, গণশিক্ষা কার্যক্রম, সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে নিজেরা সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং অন্যদেরকে সম্পৃক্ত করতে পরামর্শ প্রদান করেছেন।

ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। ফলে বিভিন্ন মহল থেকে তা আরো সম্প্রসারণের জোর তাগিদ উত্থাপিত হচ্ছে। যেহেতু ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, তাই পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মসজিদের ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি ও ইমামদের কল্যাণে যে সব সম্ভাব্য কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয় তার কতিপয় প্রস্তাবনা নিম্নে পেশ করা হল।

- ☞ একাডেমির কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে প্রতিটি জেলাতে এর শাখা স্থাপন করা।
- ☞ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিকে কোন প্রকল্পের অধীন না রেখে স্থায়ীভাবে একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ইনস্টিটিউট হিসেবে গড়ে তোলা।
- ☞ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিকে আরো আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করে একটি আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিতে রূপান্ত করা।
- ☞ ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুগোপযোগী সকল বিষয়ক অন্তর্ভুক্ত করা।
- ☞ অংশগ্রহণকারী ইমামদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- ☞ গুরুত্বপূর্ণ কোর্সের সময়সীমা বৃদ্ধি করা।
- ☞ ইসলামী রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কুর'আন ও হাদীসের উপর উচ্চমানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ☞ ইমামদের চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধানকল্পে একটি চাকুরী বিধি অর্থাৎ সার্ভিস রুল তৈরি করে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা।
- ☞ মসজিদ কমিটির জন্য "মসজিদ পরিচালনা পদ্ধতি" নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে তা কার্যকর করা।
- ☞ কুর'আন-হাদীসের আলোকে আধুনিক বিষয়াবলী সম্বলিত যুগোপযোগী খুৎবা প্রদান করা।
- ☞ মসজিদ বিষয়ক বার্তা ও প্রচার মাধ্যম তৈরি করা। এজন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক একটি পত্রিকা কেন্দ্রীয়ভাবে চালু করা।
- ☞ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে লোকবল বৃদ্ধি করা।
- ☞ মসজিদের ইমামদের পাশাপাশি মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দ, মুয়াযযিন ও খাদেমদের জন্যও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে "আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" শিরোনামের এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইমামদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়কে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সমাজের সংজ্ঞা, সমাজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, সমাজের বৈশিষ্ট্যসহ মানব জীবনে সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার পরিচিতি, বিকাশধারা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসহ আদর্শ সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মসজিদের পরিচয়, মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মসজিদের মিহরাব ও মিম্বার পরিচিতি, মসজিদের ক্রমবিকাশ সেই সাথে ইসলামী সমাজে মসজিদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইমাম পরিচিতি, ইমামতের প্রকার, ইমামতের শর্তাবলী, ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলী, ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য, কুর'আন ও হাদীসের আলোকে ইমামদের মর্যাদা, বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও ইমাম সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ইমামদের অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ইমামদের অবদান, বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইমামদের ভূমিকা, আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে ইমামদের উদ্যোগ গ্রহণসহ মসজিদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইমাম প্রশিক্ষণ পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য এবং ইমাম প্রশিক্ষণের কোর্স ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির সীমাবদ্ধতা ও তা উত্তরণের কতিপয় প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আজ অশান্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্রই অশান্তি বিরাজ করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ইসলাম বহির্ভূত বিষয়ের ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে দিন দিন অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবি, অপহরণ, ধর্ষণ ও গুমের মত নৃশংস ঘটনা বেড়েই চলেছে। এসকল অপরাধ থেকে সমাজ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে ধর্মীয় অনুশাসনের বিকল্প নেই। তাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা আমাদের সকলের একান্ত প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ একটি উদার গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশ। এদেশের মুসলমানগণ ধার্মিক এবং ধর্মের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশে তিন লক্ষাধিক মসজিদ আছে। ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের শহর। এসকল মসজিদে অন্তত তিন লক্ষাধিক ইমাম দায়িত্ব পালন করছেন। এ সকল ইমামগণ যদি সকলে একযোগে হিম্মতের সাথে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করেন যে, সমাজ থেকে তারা যাবতীয় অন্যায়, অবিচার দূর করে একটি শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়বেন তা অনেকাংশেই সম্ভব। কারণ ইমামগণ সমাজের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁদের কথা সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে। সম্মানিত ইমামগণ ঈদ, জুমু'আসহ বিশেষ বিশেষ দিনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সামনে বয়ান করার সুযোগ লাভ করেন। ঐ সকল দিনে ইমামগণ ইসলামের যাবতীয় বিধান অত্যন্ত সাবলীলভাবে যুক্তি সহকারে সবার সামনে তুলে ধরতে পারেন। এভাবে প্রত্যেক ইমাম তাঁর নিজ অবস্থান থেকে এই অশান্তিময় সমাজকে শান্তির সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসতে পারেন।

বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনার দেশ। এদেশের রয়েছে বিশাল জনগোষ্ঠী। এ জনগোষ্ঠীকে জন শক্তিতে রূপান্তর করে যে কোন অসাধ্যকে সাধ্য করা সম্ভব। অত্র গবেষণায় এ বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে যে একজন ইমাম সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডেও অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠনে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। সমাজ কল্যাণমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদার শাসনকাল পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজের মূলকেন্দ্র ছিল মসজিদ। আর এর নেতৃত্ব দান করতেন মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেব। মদীনার খেজুর পাতার মসজিদে নববীই ছিল নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামি হুকুমাতের পার্লামেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট, বিচারালয়, শিক্ষালয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্মের মূলকেন্দ্র। ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত এখানেই গৃহীত হত। দুর্ভাগ্য মুসলিম জাতির আজ তারা ইসলামের সুমহান নীতি আদর্শের বরকত থেকে বঞ্চিত। আজ-বাংলাদেশের সর্বত্রই কেবল নামাজের সময়ই মসজিদ খোলা হয়। নামাযের আগে পরে মসজিদে কোন ধরণের কার্যকলাপ হতে দেখা যায়না। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশ, "তোমরা অন্য ধর্মের অনুসারীদের ন্যায় মসজিদকে গির্জা বা মন্দিরে রূপান্তরিত করো না, বরং মসজিদ হওয়া চাই চিরজীবন্ত, প্রাণবন্ত।" তাই যদি আমরা ইসলামের সেই হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে পারি তবেই মহান আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে সক্ষম হব।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে অত্র অভিসন্দর্ভে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আজও যদি আমাদের বাংলাদেশে মসজিদের ইমাম সাহেবগণ আন্তরিকতার সাথে তাদের যোগ্যতার মাধ্যমে সমাজের হাল ধরেন তবে আমাদের সমাজ হবে একটি সুন্দর আদর্শ সমাজ। যেখানে থাকবে না কোন অন্যায়-অবিচার, যেখানে থাকবে না ইসলাম বিরোধী কোন আচার অনুষ্ঠান, সর্বত্রই বিরাজ করবে শান্তি আর শান্তি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবূল করার প্রার্থনা জানাচ্ছি। সেই সাথে এ কামনা করছি যে, দয়াময় মহান রাব্বুল 'আলামীন সবাইকে বিশেষভাবে বাংলাদেশের মানুষকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

والله اعلم بالصواب ـ اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী ও উর্দূ ভাষার গ্রন্থসমূহ

১. আল-কুর'আনুল কারীম

২. সুলায়মান বিন আশ্'আস *সুনানু আবূ দাউদ,* কুতুবখানা রাশীদিয়া, দিল্লী, তাবি।

৩. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ আয-যাহাবী *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* মাকতাবাতুস সাফা, মিসর, ২০০৩।

৪. ইমাম ইব্ন তায়মিয়া *ফাতওয়াউস সালাত,* দারুত তাকওয়া লিত তুরাস, মিসর, তাবি।

৫. ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ্ *যাদুল মা'আদ,* মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ্, মিসর, তাবি।

৬. শায়খ তোয়া-হাল ওয়ালী *আল-মাসাজিদু ফিল ইসলাম,* দারুল 'ইলমি লিল মালাইন, বৈরূত, লেবানন, ১৯৮৮।

৭. 'আবদুল মালিক বিন হিশাম *সীরাতু ইব্ন হিশাম,* দারুত তাকওয়া, মিসর, ২০০৪।

৮. ইব্ন সা'আদ, *তাবাকাতুল কুবরা,* দারুস সাদির, বৈরূত, তাবি।

৯. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল *সহীহুল বুখারী,* কুতুবখানা রাশীদিয়া, দিল্লী, তাবি।

১০. 'আল্লামা শিবলী নু'মানী *সীরাতুন্নবী (উর্দূ),* দারুল হাদীস, মুলতান, পাকিস্তান, ২০০২।

১১. 'আবদুর রউফ দানাপুরী *আসাহুস্ সিয়ার,* কুতুবখানা, না'ঈমিয়াহ,, দেওবন্দ, ভারত, তাবি।

১২. ওয়ালিয়ুদ্দীন মুহাম্মদ আল-খতীব আত্-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ,* বশীর হাসান এন্ড সন্স, লোরচিটপুর রোড, কলিকাতা, তাবি।

১৩. 'আবদুর রহমান আহমদ ইব্ন শুয়া'য়ব *সুনানুন নাসাঈ,* হামীদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজর, ঢাকা, তাবি।

১৪. 'আবদুর রহমান ইব্ন খালদুন *তারীখু ইব্ন খলদুন,* দারুল ফিকর, বৈরূত, ২০০০।

১৫. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর, তাহকীক মুস্তফা সায়্যিদ ও তারিক সালিম *তারীখু আত-তাবারী,* আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, মিসর, তাবি. ।

১৬. আবূ-হাসান 'আলী বিন মুহাম্মদ আল-জাযারী, তাহকীক, খায়রি সা'ঈদ *আল-কামিল ফিত্-তারীখ,* আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, মিসর, তাবি।

১৭. জালালুদ্দীন সুয়ূতী *তারীখুল খুলাফা,* দারুল ফাজর লিত-তুরাস, মিসর, ২০০৪, ২য় সংস্করণ।

১৮. আবূ মুহাম্মদ আল-হুসায়ন ইব্ন মাস'উদ *তাফসীরু আল-বাগাভী,* ইদারাতুত তা'লীফাত, আশরাফিয়া, মুলতান, পাকিস্তান, তাবি।

১৯. মুহাম্মদ 'আলী সাবূনী *সাফওয়াতুত তাফাসীর,* দারুস-সাবুনী, মিসর, তাবি।

২০. মুহাম্মদ সানায়ুল্লাহ্ 'উসমানী *তাফসীরুল মাযহারী,* যাকারিয়া বুক ডিপো, সাহারানপুর, পাকিস্তান, তাবি।

২১. 'আল্লামা ফযল শিহাবুদ্দীন সায়্যিদ *আত্-তাফসীরু রুহুল মা'আনী,*

Dhaka University Institutional Repository

	মাহ্মূদ আলূসী, তাহকীক ড. সায়্যিদ মুহাম্মদ আস্-সায়দানী ও আস্-সায়্যিদ ইবরাহীম ইমরান	দারুস সাদির, মিসর, ২০০৫
২২.	মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী	***তাফসীরু আত-তাবারী,*** দারু ইহ্ইয়াইত তুরাস, আল-'আরাবী, বৈরূত, ২০০১
২৩.	ড. মুহাম্মদ হুসায়ন আয-যাহক্ষী	***আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন,*** মাকতাবাতু মুস'আব ইব্ন উমায়র আল-ইসলামিয়াহ, বৈরূত, ২০০৪
২৪.	ইমাম জালালুদ্দীন আবূ বকর আস-সুয়ূ্তী	***আল-জামি'উস সগীর,*** আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, কায়রো, মিসর, তাবি।
২৫.	মুহাম্মদ 'আলী সাইস	**তারীখু আল-ফিকহুল ইসলামী,** দারুল কুতুবুল 'ইলমিয়াহ, বৈরূত, লেবানন, তাবি।
২৬.	ইব্ন হাজার 'আসকালানী	***আল-ইসাবা,*** মাকতাবাতু মিসর, মিসর, তাবি।
২৭.	ইসমা'ঈল বিন কাসীর	***আল-বিদায়া ওয়ান নিয়াহা,*** মাকতাবাতুস-সাফা, মিসর, ২০০৭।
২৮.	ড. মুহাম্মদ সুহায়ল তাকূশ	***আত-তারীখুল ইসলামী,*** দারুল মা'আরিফ, দেওবন্দ, ভারত, ২০০৫
২৯.	আবূ বকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক নীসাপুরী, তাহকীক, ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আ'যামী	***সহীহ ইব্ন খুযায়মা,*** আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরূত, ১৯৭৫
৩০.	ইমাম 'আবদুল্লাহ বিন আহমাদ নাসাফী	***তাফসীরুল মাদারিক,*** কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, তাবি।
৩১.	ইসমা'ঈল বিন কাসীর	***তাফসীরু ইব্ন কাসীর,*** দারুল মুফীদ, বৈরূত, ১৯৮৮
৩২.	আহমদ বিন হাম্বল	***আল মুসনাদ,*** দারুল হাদীস, মিসর, ১৯৯৫
৩৩.	মুহাম্মদ 'আবদুল হাই লাখনোভী,	***ফাতওয়া-ই-লাখনোভী,***

Dhaka University Institutional Repository

	তাহকীক, ড. সালিহ মুহাম্মদ ‘আবদুল হক	মাকতাবাতু ‘উসমানিয়াত, কানসী রোড, পাকিস্তান, তাবি।
৩৪.	মুহাম্মদ বিন ইসমা‘ঈল ইসফাহানী, তাহকীক, ইসামুদ্দীন আস্-সাবাবাতী ও ইমাম আস-সায়্যিদ	*সুবুলুস সালাম,* দারুল হাদীস, মিসর, ২০০৪
৩৫.	মুহাম্মদ ‘আবদুল মা‘বুদ	*তারীখে মদীনা মুনাওয়ারা (উর্দূ),* মাকতাবা রাহমানিয়া, লাহোর, পাকিস্তান, তাবি।
৩৬.	আবূ হামীদ মুহাম্মদ গাজ্জালী	*ইহ্ইয়াউ ‘উলূমুদ্দীন,* দারু ইব্ন হায়সাম, মিসর, ২০০৪
৩৭.	আহমদ বিন ‘আলী ইব্ন হাজার ‘আসকালানী	*ফাতহুল বারী,* মাকতাবাতুস্ সাফা, মিসর, ২০০৩
৩৮.	শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী	**হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা,** গাউসিয়া পাবলিকেশন্স, চক বাজার, ঢাকা, ১৯৫২
৩৯.	মুহাম্মদ বিন ‘আলী আশ-শাওকানী	*নায়লুল আওতার,* দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর, ২০০৫
৪০.	আবূ জা‘ফর আহমদ বিন মুহাম্মদ আত-তাহাবী	*আত-তাহাবী,* আশরাফিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত, তাবি।
৪১.	যাকীয়ুদ্দীন ‘আবদুল ‘আযীম আল-মানযারী	*আত-তারগীব ওয়াত তারহীব,* দারু ইব্ন হায়সাম, মিসর, ২০০৩
৪২.	আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী	*সহীহ মুসলিম,* আল-মাকতাবাতু আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত, তাবি।
৪৩.	আবূ বকর জাবির আল-জাযায়িরী	*মিনহাজুল মুসলিম,* মাকতাবাতুস সা‘ফা, মিসর, ২০০১
৪৪.	মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান	*তানযীমুল আশতাত,* আল-হেলাল প্রকাশনী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ১৯৯৭
৪৫.	‘আলায়ুদ্দীন ‘আলী ইব্ন মুহাম্মদ	*তাফসীরুল খাযিন,* ওয়াহীদি কুতুব খানা, পেশওয়ার, পাকিস্তান, তাবি।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. জালালুদ্দীন সুয়ূতী — *তাফসীরুল জালালায়ন,* মুখতার এন্ড কোম্পানি, ইসলামী কুতুব, দেওবন্দ, ভারত, তাবি।

৪৭. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী — *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* দারুল কুতুবুল 'ইলমিয়াহ, বৈরূত, ১৯৯৮

৪৮. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর কুরতুবী — *তাফসীরুল কুরতুবী,* দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল 'আরাবী, বৈরূত, তাবি।

৪৯. নাসিরুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর বায়যাবী — *তাফসীরুল বায়যাবী (হাশিয়াসহ),* কুতুবখানা রাশীদিয়া, চক বাজার, ঢাকা, তাবি।

৫০. ইমাম মালিক বিন আনাস — *মুয়াত্তা,* আশরাফিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত, তাবি।

৫১. 'আবদুল্লাহ্ বিন বাহরাম আদ্-দারিমী — *সুনানু আদ্-দারেমী,* দারুল ফিকর, বৈরুত, ২০০৫

৫২. ইমাম সুয়ূতী, তাহকীক 'আলী মুহাম্মদ 'উমর — *তাবাকাতুল হুফ্ফায,* মাকতাবাহ ওয়াহ্হাবা কায়রো, মিসর, ১৯৭৩

৫৩. মুহাম্মদ বিন 'আবদুল্লাহ্ আল হাকিম আল-মিসরী — *আল-মুসতাদরাক,* দুরুল কুতুব, বৈরূত, ২০০২, ২য় সংস্করণ।

৫৪. ইব্ন 'ইমাদুশ শাফে'ঈ, তাহকীক, ইবরাহীম মুহাম্মদ বারূদী — *তাসহীলুল মাকাসিদ আয-যিয়ারুল মাসাজিদ,* দারুস সামিঈ', রিয়াদ, ২০০৭

৫৫. 'আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী — *আর-রাহীকুল মাখতুম,* দারুল ওয়াফা, মিসর, ২০০৫, ১৭ তম সংস্করণ।

৫৬. 'আল্লামা শাব্বীর আহমদ 'উসমানী — *ফাতহুল মুলহিম,* মাকতাবাতু আল-আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত, ১৯৯৯।

৫৭. 'আব্দুল কাদির জিলানী (র.) — *আল-গুনইয়াহ্,* মাকতাবাতু রওযাতুল কুর'আন, পেশওয়ার, পাকিস্তান, তাবি।

৫৮. সায়্যিদ কুতুব — *ফি-যিলালিল কুর'আন,* দারুশ-শুরূফ, বৈরূত, ২০০৩, ৩৪তম সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল — *আল-আদাবুল মুফরাদ,* আল-মিসবাহ, লাহোর, পাকিস্তান, তাবি।

৬০. 'আলায়ুদ্দীন 'আলী মুত্তাকী ইব্ন হিশাম — *কানজুল উম্মাহ্,* আল-মাকতাবাতুত তুরাসুল ইসলামী, বৈরূত, ১৯৬৯

৬১. আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া শারফুন্নবী — *রিয়াযুস্ সালেহীন,* দারু ইবনু হায়সাম, কায়রো, মিসর, তাবি।

৬২. হাফিয 'আলী ইব্ন 'উমর — *সুনানু দারা কুতনী,* দারুল কুতুবুল 'ইলমিয়াহ, বৈরূত, ২০০৩, ২য় সংস্করণ।

৬৩. হাফিয আহমদ মোল্লা জিউন — *নূরুল আনওয়ার,* এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, তাবি।

৬৪. মুহাম্মদ রিফ'আত কাসেমী — *মাসাইলে নামায (উর্দূ),* কুতুবখানা শানে ইসলাম, উর্দূ বাজার, করাচী, পাকিস্তান, তাবি।

৬৫. শায়খ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ — *নাহজুল বাগালাগাহ,* দারুল হাদীস, মিসর, ২০০৪

৬৬. মুহাম্মদ তা'মির ও 'আবদুল আযীয মুস্তফা — *আহাদীসুল কুদসিয়াহ্,* দারুত তাকওয়া, মিসর, ২০০০

৬৭. আবূ বকর আহমদ বিন হুসায়ন আল-বায়হাকী — *আস-সুনানুল কুবরা,* দারুল মা'আরিফা, বৈরূত, তাবি।

৬৮. ড. 'আলী মুহাম্মদ সাল্লাবী — *আস-সীরাতুন নববীয়াহ্,* মুয়াস-সাসাতি ইকরা, মিসর, ২০০৫

৬৯. মুহাম্মদ সুলায়মান মনসূরপুরী — *রাহমাতুল লিল 'আলামীন (উর্দূ),* মাকতাবা ইসলামিয়াহ, উর্দূ বাজার, পাকিস্তান, ২০০৬।

৭০. আবূ-'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আল-জাসসাস আশ-শায়বানী — *আল-মাবসূত,* ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমুল ইসলামিয়াহ, করাচী, পাকিস্তান, তাবি।

৭১. শিহাবুদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ্ ইয়াকূত ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল বুগদাদী — *মু'জামুল বুলদান,* দারুল কিতাবুল 'আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তাবি।

Dhaka University Institutional Repository

৭২. জালালুদ্দীন ‘আবদুর রহমান সুয়ূতী — *আল ইতকান,* কায়রো, মিসর, ১৯৫১, ৩য় সংস্করণ।

৭৩. শায়খ আহমদ বিন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর কুস্তালানী, (উর্দূ অনু.) মাওলানা মুহাম্মদ ‘আবদুল জাব্বার খান — *সীরাতে মুহাম্মদীয়া (উর্দূ),* ইসলামী কুতুব, উর্দূ বাজার, করাচী, পাকিস্তান, তাবি।

৭৪. ড. মুহাম্মদ সুলায়মান তাকূশ — *আত-তারীখুল ইসলামী আল-ওয়াজীয,* দারুল মা‘আরিফ, দেওবন্দ, ভারত, ২০০৫

৭৫. মুহাম্মদ বিন ‘ঈসা — *জামি’ তিরমিযী,* ইসলামী কুতুব, মুখতার এন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, ভারত, তাবি।

৭৬. ইমাম ফখরুর রাযী — *আত-তাফসীরুল কাবীর,* দারু ইহ্ইয়াউ আত-তুরাসুল ‘আরাবী, বৈরূত, তাবি।

৭৭. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ — *সুনানু ইবনু মাজাহ,* আশরাফিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত, ১৯৫৮

৭৮. মাওলানা মুহাম্মদ তাকী ‘উসমানী — *‘উলূমুল কুরআন (উর্দূ),* মাকতাবা দারুল ‘উলূম, করাচী, ১৯৯৬

৭৯. ইমাম আবূ ‘আবদুল্লাহ্ আল-হাকীম — *আল-মুসতাদরাক,* দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরূত, তাবি।

৮০. মুহাম্মদ আবূ যাহের — *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন,* আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়াহ, মিসর, তাবি।

৮১. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী — *সিয়ারু ‘আলামিন নুবালা,* মুকতাবাতু আস-সাফা, মিসর, ২০০৩

ইংরেজি ভাষার গ্রন্থসমূহ

1. Abdur Rahman Shad — ***Muslim etiqueties,*** Taj company, Delhi, 1999, Reprinted.

2. Philip. K. Hitti — ***History of the Arabs,*** Macmillan Education Ltd., London, 1970, tenth ed.

3. Ed. George Michell — ***Architecture of the Islamic world,*** Thomas and Hudson Ltd. London. 1995, Reprinted.

4. Ahmad Hasan Dani — ***Muslim architecture in Bengal,*** Asiatic Society Bangladesh, Dacca, Published in 1961

Dhaka University Institutional Repository

5. Ludwig W. Adamic — ***The A to Z of Islam,*** Vision Books pvt.Ltd., New Delhi, 2003

6. Micheal H. Hart, — ***The 100,*** Golden Books centres SDN., BHD., Kualalumpur, Malaysia, 2000 Reprinted,

7. Robert Helien Brand — ***Islamic Architecture,*** Edenburgh University press, George Square, Eden Burgh, 1994

8. Abdul Kader Tayob — ***Islam: a short introduction,*** One World, Oxford, 2006

9. Syed Mahmudul Hasan — ***Glims of Muslim Art and Architecture,*** Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1983

10. Maulana Muhammad. Ali — ***Mohammad the Prophet,*** Ahmadiyyah Anjuman'of Islam, Lahore, 1972, Fourth ed.

11. Sir William Muir — ***Mahomet and Islam,*** The Religious tract Society, 56 Paternoster Row, 63st. Paul. S Churchyard, 1887.

12. Syed Ameer Ali — ***The spirit of Islam,*** Low price publications, Delhi, 2002, Reprinted.

13. Mohammad Ali — ***The Prophet Mohammad,*** Cassel and Company Limited, London, 1947.

14. Thomas Patrick Hughes — ***Notes on Muhammadanism,*** Idarah-1-Adabiyat-1, Delhi, 1975, Reprinted.

15. Sir William Muir — ***The life of Mehomet***, Voice of India, New Delhi, 2000, 2nd reprinted.

16. Reynold A. Nicholson — ***The Mystics of Islam,*** Indigo Books, Ansari Road, Daryagonj, New Delhi, 2002.

17. Professor Abdul Qaiyum Natiq, Translated by Muhammad Reza Karmi — ***Sirat E-Mustaqeem,*** Alamin Publications, Delhi, 1992.

18. Karan Armstrong — ***Muhammad Prophet for our time,*** Harper Press, London, 2006.

19. Martin Lings — ***Muhammad his life based on the earliest sources,*** Millat book certres, New Delhi, India, No Dated.

20. Haykal — ***The life of Muhammad,*** New crescent Publisuing Co., Delhi, 2006, reprinted.

21. Abdul Latif Gauba — ***The Prophet of the desert,*** Adam Publishers and distributors, New Delhi, 1981.

22. Khuda Baksh — ***The History of Islamic Peoples,*** Idaratt-I-Adabiyat,-I-, Delhi, 1983, Re-printed.

23. G. W. Choudhury — ***Islam and the contemporary world,*** Acadamic Publishers, Dhaka, 1991.

24. Muhammad Hamidullah — ***Muhammad Rasulullah (Sm),*** Hurifa Publications, Arambagh, Karachi, Pakaistan, 1979.

25. Abul-Fazl Allami, Translafed by Colonel H.S. Jarret — ***The A-In-I Akbary,*** Low Price Publacations, Delhi, 1994. Re-printed.

26. Dr. Syed Mahmudul Hasan — ***Muslim Monuments of Bangladesh,*** Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1983.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার গ্রন্থসমূহ

১. ড. অনাদি কুমার মহাপাত্র — *বিষয় সমাজ তত্ত্ব,* কলকাতা: ইন্ডিয়া বুক কনসার্ন, ২০০৩

২. ড. রংলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ — *সমাজ বিজ্ঞান,* ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স মার্চ-২০০৩

৩. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান — *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৮, ২য় সংস্করণ।

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম — *ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ্,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭, ৩য় সংস্করণ।

৫. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ — *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ (সা.),* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর-২০০৫

৬. খুরশিদ আহমদ, অনুবাদ: মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার, — *ইসলামের অহ্বান,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন -১৯৯৫

৭. মিয়া মোহাম্মদ সেলিম — *বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ,* ঢাকা: নবেল পাবিলিশং হাউস, ২০০৫

৮. মোঃ আতিকুর রহমান — *বাংলাদেশ সমাজ ও পরিবেশ,* ঢাকা: অনার্স পাবলিকেশন, ২০০৫

৯. মুহাম্মদ শামসুর রহমান — *উদ্ভিদ পরিবেশ তত্ত্ব ও উদ্ভিদ ভূগোল,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

১০. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান — *গঙ্গাঋদি থেকে বাংলাদেশে,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

১১. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার — *বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা সমাজ জীবনে তার প্রভাব,* ঢাকা: ই.ফা.বা. ২০০০

১২. আব্দুল করিম — *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল,* ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৯

১৩. এ. কে. এম, নাজির আহমদ — *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন,* ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯

১৪. 'আল্লামা আলীমুদ্দীন নদিয়াভী — *শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়াহ্,* 'আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী-ঢাকা-২০০৭

১৫. হারুনুর রশীদ — *রাজনীতি কোষ,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রকাশকাল, ১৯৯৯

১৬. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান — *মসজিদের ইতিহাস,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩, ৩য় সংস্করণ।

১৭. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ — *মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল বুখারী (রা.) ও তাঁর জামি',* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০

১৮. মাও. শামছুল হক ফরিদপুরী, — *মসজিদ ও জীবন্ত মসজিদ,* ঢাকা: আল-আশরাফ প্রকাশনী,

১৯. মফিজুল্লাহ্ কবীর — *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, (পুনঃমুদ্রণ)।

Dhaka University Institutional Repository

২০. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম — *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, ২য় প্রকাশ।

২১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান — *বাংলাদেশের মসজিদ,* সুবর্ণ, ঢাকা-২০০১।

২২. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী — *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা,* উত্তরণ অপসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী ১৯৯৬, ৫ম সংস্করণ।

২৩. 'আল্লামা গোলাম আহমদ মোর্তজা — *ইতিহাসের ইতিহাস,* মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ রিসার্চ একাডেমী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৭, ৩য় সংস্করণ।

২৪. মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ — *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস,* ঐতিহ্য, ঢাকা-২০০২।

২৫. 'আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী — *ফাতওয়া ও মাসায়েল,* এম. এ. বারী আল-হাদীস প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিশিং হাউস, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা, ২০০০, ২য় সংস্করণ।

২৬. আবদুল মাওদুদ — *মুসলিম মনীষা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫, ৫ম মুদ্রণ।

২৭. আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন — *মেহরাবের তত্ত্বসার,* এম. এ. বারী, আলহাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা ১৯৮৫।

২৮. আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদিয়াভী — *রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাত,* আশা কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা, ১৯৯৫।

২৯. কাযী আবুল ফযল হাবীবুর রহমান — *আশারায়ে মুবাশ্‌শারা,* তাওহীদ পাবলিকেশন্স, বংশাল, ঢাকা, ২০০৭।

৩০. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ — *মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাজ্জালীর অবদান,* কাসেমীয়া প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০২, পুনঃমুদ্রণ।

৩১. আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী, — *খুতবাতুত তাওহীদ ওয়াস সুন্নাহ্,* আল-মাইমানা কম্পিউটার গ্রাফিক্স, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১৯৯৬।

৩২. মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম — *ইসলামী সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা,* খায়রুন প্রকাশনী, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১৯৯৭, ২য় প্রকাশ।

৩৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ — *মসজিদের বিধানাবলী,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৯।

৩৪. সদরুদ্দীন আহমদ চিশতী — *মসজিদ দর্শন,* আসাদ বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৭, ৪র্থ সংস্করণ।

৩৫. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী — *মসজিদ ও জীবন্ত মসজিদ,* আল-আশরাফ প্রকাশনা বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৩, ৫ম সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. ইব্‌ন হাজার আসকালানী, অনু, শায়খুল হাদীস আহমদুল্লাহ্ রাহমানী ও মাওলানা আবদুর রহমান — ***বুলুগুল মারাম,*** আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা, ১৯৮৯

৩৭. মাওলানা আমিনুল ইসলাম — ***তাফসীরে নূরুল কুরআন (বাংলা অনু),*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮, ২য় সংস্করণ।

৩৮. আবদুল কাদির সম্পাদিত — ***নজরুল রচনাবলী,*** বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, ২য় সংস্করণ।

৩৯. আ.ফ.ম. আবূ বকর সিদ্দীক — ***মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬

৪০. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুল রাজ্জাক — ***মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, ৩য় সংস্করণ।

৪১. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম — ***ইসলামে মসজিদের ভূমিকা,*** আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, ২য় প্রকাশ।

৪২. মাওলানা আবদুল খালেক — ***নামায,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪, ৪র্থ সংস্করণ।

৪৩. ড. খুরশিদ আলম — ***সমাজ ও সম্প্রদায়,*** মিনাভা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, ২য় সংস্করণ।

৪৪. মাওলানা মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, অনু, লোকমান আহমদ তামীমি — ***তারীখে ইলমে হাদীস,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০

৪৫. মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ — ***মুস্তফা চরিত,*** কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৮

৪৬. মোঃ আব্দুর রশীদ — ***ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭

৪৭. কবি আবূ তালেব মিয়া — ***বাংলাদেশের জ্ঞানী-গুণী,*** কবি আবূ তালেব মিয়া রিসার্চ সেন্টার, ভাঙ্গা, ফরিদপুর, ২০০৫

৪৮. দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ — ***জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ।

৪৯. অধ্যাপক নাজির আহমদ ও ড. রুহুল আমিন — ***মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস,*** আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৯

৫০. অধ্যাপক আইনুল বারী — ***আইনী তুহফায়ে সালাতে মুস্তফা,*** আহলে হাদীস লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৪

৫১. মাওলানা আশরফ আলী থানভী, অনু. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী। — ***বেহেস্তী জেওর,*** এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা ১৯৯০, ১০ম মুদ্রণ।

৫২. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী — ***হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস,*** এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা, ২০০০, পুর্ণমুদ্রন।

৫৩. ডা. লুৎফর রহমান, ড. মকবুল হোসেন সম্পাদিত — ***ধর্ম জীবন,*** ডা. লুৎফর রহমানের শ্রেষ্ঠ রচনা সমগ্র, তানিয়া বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. সৈয়দ আলী আহসান — *মহানবী (সা.),* আহমদ পাবলিশিং হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা ২০০১, ২য় সংস্করণ।

৫৫. গোলাম মুস্তফা — *বিশ্বনবী,* আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮ অষ্টবিংশতম মুদ্রণ।

৫৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ — *নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা,* কামিয়াব প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৫

৫৭. মোবাশ্বের আলী — *নজরুল প্রতিভা,* জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০০

৫৮. নূরুল হুদা সম্পাদিত — *জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন স্মারকগ্রন্থ,* ঢাকা, ১৯৯৬

৫৯. আবদুল মুকীত চৌধুরী — *নজরুল ইসলাম; ইসলামী গান,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭, ৪র্থ সংস্করণ।

৬০. মুনশী আবদুল মান্নান — *হাজার বছরের বাংলাদেশ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব,* ঝিনুক প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

৬১. কবি কায়কোবাদ — *আযান কবিতা,* আব্দুল মান্নান সৈয়দ কর্তৃক সম্পাদিত কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ঢাকা, ২০০৫, ২য় সংস্করণ।

৬২. আবূ সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান — *রাসূল (সা.)-এর বিপ্লবী জীবন,* খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

৬৩. শাইখ মুহাম্মদ ইসমা'ঈল পানিপথী, অনু. মহিউদ্দীন শামী — *ইসলাম প্রচারের ইতিহাস,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

৬৪. মাওলানা রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী — *খানায়ে কা'বা,* রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা, তাবি।

৬৫. আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান — *তাফসীরে মাজেদী (বাংলা),* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮

৬৬. সৈয়দ মানাযির আহমদ গিলানী, অনু. এম. সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন — *নবীউল খাতিম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

৬৭. মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনু, অনু. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান — *আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান,* আল-মাইমানা কম্পিউটার গ্রাফিক্স, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬৮. 'আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী — *নব্যুয়তে মুহাম্মদী,* আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা, ১৯৮৮, ২য় সংস্করণ।

৬৯. মূল ইব্‌ন কাসীর, অনু খাদিজা আখতার রেজায়ী — *সীরাতে ইব্‌ন কাসীর,* আল-কুর'আন একাডেমী, লন্ডন, ২০০৬

৭০. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা — *মহনবীর জীবন ও আদর্শ,* আশরাফিয়া বই ঘর, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৪

৭১. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম — *মদীনা শরীফের ইতিকথা,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৪, ৩য় সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

৭২. আব্দুর রহীম — *হযরত মুহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি,* শ্রী গীরিশ চন্দ্র কর্তৃক প্রকাশতি, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, ১৯১৭, ২য় সংস্করণ।

৭৩. আলহাজ মুহাম্মদ আযহার উদ্দীন আলকাদরী — *আরবের আলো,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১।

৭৪. এ.জেড.এম. শামসুল আলম — *মসজিদ পাঠাগার,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫, ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

৭৫. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম — *আল-আকসা মসজিদের ইতিকথা,* ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৮, ৩য় সংস্করণ।

৭৬. মঈন বিন নাসির — *প্যালেষ্টাইন থেকে বসুনিয়া,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭, ২য় সংস্করণ।

৭৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম — *মুসলমানদের পবিত্র স্থান,* আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম, বংশাল, জামে' মসজিদ, ঢাকা, তাবি।

৭৮. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার — *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ),* এন. সরকার পাবলিশিং এন্ড কোং, কোলকাতা, ২০০৬-০৭

৭৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ও অন্যান্য — *বাংলাদেশের ইতিহাস,* নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৬, দ্বাদশ সংস্করণ।

৮০. ড. আব্দুল করিম — *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল,* জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯।

৮১. ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী — *ভারতের ইতিহাস কথা,* নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০০০, নূতন সংস্করণ।

৮২. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), অনুবাদ ও সম্পাদনা, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান — *তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন,* খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন, বাদশাহ ফাহদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মুনাওয়ারা, তাবি।

৮৩. নাসির হেলাল — *বাংলাদেশে ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি; ইসলামী প্রেক্ষিত,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০১।

৮৪. আব্বাস আলী খান — *বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৭, ষষ্ঠ প্রকাশ।

৮৫. ড. এম.এ. রহিম, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (অনু) — *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৮, দ্বিতীয় পুণঃমুর্দ্রণ।

৮৬. এ.কে.এম. নাজির আহমেদ — *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৬, ২য় সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮৭. তোফায়েল আহমদ — *যুগে যুগে বাংলাদেশ,* নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯২

৮৮. ড. তারা চাঁদ, এস. মুজিবুল্লাহ্ (অনূদিত) — *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭, ৩য় সংস্করণ।

৮৯. অধ্যাপক কে. আলী — *বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের ইতিহাস,* আলী পাবলিকেশন্স, পাটুয়াটুলী, ঢাকা, ১৯৮১, পঞ্চদশ সংস্করণ, (পুর্ণমুদ্রণ)।

৯০. আবুল হাসান আলী নদভী, অনুবাদ গোলাম সোবহান সিদ্দীকী — *ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

৯১. রিচার্ড এম. ইটন, হাসান শরীফ (অনূদিত) — *ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৮

৯২. আবদুল করীম — *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

৯৩. সৈয়দ বজলুল হোসেন কাদেরী — *ঐতিহ্যের সোনার গাঁ,* তাজমহল মেশিন প্রেস, বাংলা বাজার ঢাকা, ১৯৯৮

৯৪. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম — *বাংলাদেশে ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৩১৪ বাংলা।

৯৫. আবদুল মান্নান তালিব — *বাংলাদেশে ইসলাম,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০

৯৬. ড. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার — *বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

৯৭. ড. এস. এম. রহিম, মোঃ আসাদুজ্জামান (অনূ) — *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, দ্বিতীয় পুণঃমুদ্রণ।

৯৮. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম — *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* খায়রূন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, ৭ম প্রকাশ।

৯৯. আব্দুল করিম — *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

১০০. অধ্যাপক রেজাউল করিম সম্পাদিত — *সোনার গাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান,* রহমান গ্রুপ অব ইন্ডাষ্টিজ, ঢাকা, ১৯৯৩

১০১. মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, নূরউদ্দীন আহমদ (অনূ) — *শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৯, ২য় সংস্করণ।

১০২. আবদুল মওদুদ — *মুসলিম মনীষা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫, ৫ম মুদ্রণ।

১০৩. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, অনুবাদ- মুশতাক আহমদ — *উপমহাদেশে আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

১০৪. 'আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী — ***আহলে হাদীস পরিচিতি,*** এম. এ. বারী আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯২, ২য় সংস্করণ।

১০৫. জুলফিকার আহমদ কিসমতি — ***বাংলাদেশের কতিপয় আলেম ও পীর মাশায়েখ,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫, ২য় সংস্করণ।

১০৬. আব্দুল মওদুদ — ***ওহাবী আন্দোলন,*** আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৫, ৩য় সংস্করণ।

১০৭. ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক — ***মুসলিম বাংলার সামাজিক চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,*** প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩

১০৮. মুহাম্মদ আবদুল কাইয়্যুম — ***ঢাকার ইতিবৃত্ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গতিধারা,*** বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৮

১০৯. এম. রূহুল আমিন — ***বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫, ২য় সংস্করণ।

১১০. *মসজিদ জরিপ প্রতিবেদন-২০০৮,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আগারগাও, ঢাকা, ২০০০।

১১১. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম — ***দাওয়ানে দীন; প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,*** বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৪

১১২. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী — ***হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস,*** এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা-২০০৪, পুণঃমুদ্রণ।

১১৩. ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন — ***ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত,*** গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫

১১৪. এ.জেড. এম. শামসুল আলম — ***মসজিদ পাঠাগার,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩

১১৫. মুহাম্মদ মার্মাডিউক পিকথল, অনু. সানাউল্লাহ্ নূরী — **ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা,** ঢাকা।

১১৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত — ***বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৮, ২য় সংস্করণ।

১১৭. কাজী মুহাম্মদ বুরহান উদ্দিন — ***মসজিদুন নববীর আদর্শে মসজিদ আবাদ ও জীবন্ত করার দিক নির্দেশনা,*** আর্চ কম্পিউটার, ফকিরাফুর, ঢাকা ২০০২

১১৮. মুহাম্মদ লুতফুল হক — ***ফুরকানিয়া মকতব পরিচালনার পদ্ধতি,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৩, ৫ম সংস্করণ।

১১৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত — ***মসজিদ পাঠাগার,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৩, দ্বিতীয় সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

১২০. ড. মীর মনজুর মাহমুদ — *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

১২১. মুহাম্মদ আতাউর রহমান; ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রূফ; কাজী আবু হোরায়রা — ***ইমামদের ক্ষমতায়ন*** মর্ডান হার্বাল গ্রুপ, ঢাকা, ২০০৮

১২২. মুহাম্মদ লুতফুল হক — ***মসজিদ পরিচালনা পদ্ধতি,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪

১২৩. শায়খুল হাদীস মাওলনা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, ড. এ.এইচ.এম. মুজতবা হোছাইন — ***হযরত মুহাম্মদ (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন,*** ইসলামিক রিসার্চ ইনিস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৯, ৭ম সংস্করণ।

১২৪. ড. আবদুল ওয়াহিদ — ***বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি,*** ঝিঙেফুল, ঢাকা, ২০০৭

১২৫. তারেক আব্দুল বারী — ***আমাদের সংস্কৃতির প্রসঙ্গ,*** ইসালামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮০

১২৬. কাজী আবূ হুরায়রা সম্পাদিত — ***গণ শিক্ষা,*** *ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪

১২৭. মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ্ — ***মাদ্‌রাসা মকতবের বিধানাবলী,*** বাতিল প্রতিরোধ লাইব্রেরি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৯

১২৮. মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেন — ***মানবীয় মূল্যবোধ ইসলামী শিক্ষা দর্শন-এর সম্পাদন,*** নাফি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭

১২৯. ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী, অনু. অব্দুল মতীন জালালাবাদী — ***ইসলাম মানবতার ধর্ম,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০

১৩০. সৈয়দ বদরুদ্দোজা — ***হযরত মুহাম্মদ (সা.). তাঁহার শিক্ষা ও অবদান,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭

১৩১. শাহ আব্দুল হান্না — ***ইসলামী অথ্যনীতি দর্শন ও কর্ম-কৌশল,*** আল-আমীন প্রকাশনা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৪, পরিবর্তিত সংস্করণ।

১৩২. ড. হাসান জামান, — ***সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭, ৩য় সংস্করণ।

১৩৩. ড. আব্দুল আমীন চৌধুরী — ***প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি,*** মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৯

অভিধানসমূহ

১. লেখকের নাম বিহীন — ***আল-মুনজিদ,*** আল-মাকতাবাতুশ-শারকিয়াহ, বৈরূত, ২০০৩, ৪০ তম সংস্করণ।

২. লেখকের নাম বিহীন — **আল-মু'জামুল ওয়াজীয,** ওযারাতু আত-তারবিয়াতু ওয়াত তা'লীম, মিসর, ২০০৪

৩. 'আল্লামা রাগিব ইসফাহানী — ***আল-মুফরাদাতু ফি গারীবিল কুর'আন,*** কাদীমী কুতুবখানা, পাকিস্তান, তারিখ বিহীন।

৪. Thomas Patrick Hughes — ***Dictionary of Islam,*** Adam Publishers and distributors, New Delhi, 2003, 2nd ed.,

Dhaka University Institutional Repository

৫. John Penrice — ***A Dictionary and Glossary of The Quran,*** Low Price, Publications, Delhi, 2002, Re-printed.

৬. মৌ. ফীরুযুদ্দীন — ***ফীরুযুল লুগাত (উর্দূ),*** মাদানী লাইব্রেরি, ঢাকা, তাবি।

৭. মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান কাসেমী — ***আল-কামূসুল জাদীদ (আরবী-উর্দূ),*** কুতুবখানা রাশীদিয়া, দেওবন্দ, ভারত, তাবি।

৮. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক — ***ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,*** বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০৫, ৬ষ্ঠ পুণঃমুদ্রণ।

৯. ইব্ন মানযূর — ***লিসানুল 'আরব,*** দারুস সাদির, বৈরূত, লেবানন, তাবি।

১০. 'আল্লামা মজদুদ্দীন ফীরুযাবাদী — ***আল-কামূসুল মুহীত,*** দারুল ফিকর, বৈরুত, ২০০৫

১১. Sailendra Biswas — ***Samsad English-Bangali Dictionary,*** Kolkata, 1906, Fifth ed.,

১২. Edward william lane — ***Arabic-English lexicon,*** Asian Educational Services, New Delhi, 1983.

১৩. A.S. Hornby — ***Oxford Advanced Learner's Dictionary.*** Oxford University Press, 1948, 7th ed.,

১৪. মুহাম্মদ বিন আবূ বকর 'আব্দুল কাদীর আর রাযী — ***মুখতারুস সিহাহ,*** দারুল হাদীস, মিসর, ২০০২

১৫. মাওলানা 'আবদুল হাফীয বিলইয়ারী — ***মিসবাহুল লুগাত (আরবী-উর্দূ),*** মাকতাবায়ে বুরহান, উর্দূ বাজার জামি' মসজিদ, দিল্লী, ১৯৮৬

১৬. 'আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান — ***লুগাতুল হাদীস (আরবী-উর্দূ),*** মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান, তাবি।

১৭. জাবরান মাস'উদ — ***আর রায়িদ,*** দারুল 'ইলমুল মালাইন, বৈরুত, ১৯৭৮, ৩য় সংস্করণ।

১৮. কাযী জয়নুল 'আবেদীন মিরাঠী — ***কামূসুল কুর'আন (আরবী-উর্দূ),*** দারুল ইশা'আত, উর্দূ বাজার, করাচী, পাকিস্তান, ১৯৯৪

১৯. ***The world book Dictionary,*** World book inc. a scott Fetzer company, Chicago, 2000

২০. মাওলানা আবুল ফাত্হ আল-'আযীযী — ***মিফতাহুল লুগাত (আরবী-উর্দূ),*** কুর'আন মহল, করাচী, পাকিস্তান, তাবি।

২১. John L esposito — ***The Oxford Dictionary of Islam,*** Oxford university press, New york,2003

২২. 'আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান — ***লুগাতুল হাদীস,*** মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা, মারকাজুল 'ইলম ওয়া আদব, করাচী, পাকিস্তান, তাবি।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. মুহাম্মদ 'আবদুর রহমান 'আবদুল মুন'ঈম — *মু'জামুল মুসতালিহাত ওয়া আলফাযিল ফিকহিয়াহ,* দারুল ফাযীলাহ, মিসর, তাবি।

২৪. Dr. Rohi Balbaki — *আল-মাওরিদ,* Dur-ul-ilm, Lilmalayin, বৈরূত, লেবানন, ২০০৫

২৫. আস-সায়্যিদ শরীফ আল-জুরযানী হানাফী — *আত-তা'রীফাত,* কাদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান, তাবি।

২৬. Ed. by. J. Milton, Cowan. — ***A Dictionary of Modern written Arabic*** Macdonald and event, London,1980, 2nd ed.,

২৭. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস — *সাংসদ বাংলা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ভারত, পুর্ণমুদ্রন-২০০৫

বিশ্বকোষ

১. Bos Worth and Others — ***The Encyclopaedia of islam,*** Leiden, E-J, Brill-1991

২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত — *দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়াহ (উর্দূ),* দানেশগাহ পাঞ্জাব, ১৯৮৪

৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত — *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৬

৪. ***The world bookEncyclopaedia,*** Ascott Fetzer Company, London, sedney, 1992

৫. Gordan D. New by — ***A Concise Encyclopedia of Islam,*** One world, Oxford, 2006

৬. Mireea Eliade Chicf ed. — ***The Encyclopaedia of rcligion,*** Macmillan Publishing Company, New york, London, 1987

৭. ***The New Encyclopaedia of Britannica*** U.S.A, 1994 15th ed.,

৮. সম্পাদনা পরিষদ কৃর্তক সম্পাদিত — *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫

৯. বুতরুস আল-বুসতানী — *দায়িরাতুল মা'আরিফ,* দায়িরাতুল মা'আরিফা, বৈরূত, তাবি।

১০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত — *সীরাত বিশ্বকোষ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৩

এম.ফিল ও পিএইচ.ডি থিসিস

১. মুহাম্ম রুহুল আমীন — *বাংলাদেশের মসজিদ; পরিকল্পনা ও উন্নয়ন,* পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮

২. ফাতেমা কাউসার — *কায়কোবাদ; কবি ও কবিতা,* পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৩. মোঃ হারুনুর রশীদ — **ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সমাজ কল্যানমূলক কার্যক্রমঃ একটি সমীক্ষা** এম.ফিল থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

৪. মোঃ আবুল কালাম আজাদ — ***আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*** পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬

জার্নাল, পত্রিকা ও সাময়িকী

১. ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও হাফিজ মুজতবা রিজা আহমদ — ***স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ঢাকা-২০০৮

২. আবূ হেনা মোঃ এম. এম. কামাল — ***প্রসঙ্গ মসজিদ,*** সাপ্তাহিক আরাফাত, ৪৩ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ২০০২

৩. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী — ***আল-ইমামত, স্মরণিকা*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১

৪. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী — ***আল-ইমামত, স্মরণিকা*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩

৫. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী — ***ইমাম, প্রশিক্ষণ সমাপনী স্মরণিকা, ৭৭৮ তম দল*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪

৬. মোহাম্মদ শামসুল হক — ***ইসলামী স্থাপত্য; তত্ব ও দর্শন,*** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, দ্বা-ত্রিংশ সংখ্যা, ১৯৮৮

৭. ডা. (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেদ — ***জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ স্মরণে,*** দৈনিক ইনকিলাব, ৭ নভেম্বর, ২০০৮

৮. মোসাঃ রেবেকা সুলতানা — ***ইকবালের জ্ঞান তত্ত্ব; একটি পর্যালোচনা,*** ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানু-মার্চ ২০০৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৯. অধ্যাপক মোঃ মতিউর রহমান — ***জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম,*** অগ্রপথিক; ২৩ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মে-২০০৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

১০. জাবীন হামীদ — ***মক্কার প্রেমময় প্রবেশ পথ,*** দৈনিক যুগান্তর, ১৪ নভেম্বর, ২০০৮

১১. আফতাব চৌধুরী — ***হজ্জ ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা,*** দৈনিক সমকাল, ৭ নভেশ্বর, ২০০৮

১২. লেখকের নাম বিহীন — ***স্বপ্নের মসাজিদের তিন ঘন্টা,*** দৈনিক যুগান্তার, ৩০-০৭-২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

১৩. এম জহিরুল ইসলাম — *বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব,* মাসিক মদিনা, ৪৪ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পুরানা পল্টন, ঢাকা, আগষ্ট, ২০০৮

১৪. এ.কে.এম. আব্দুল মান্নান — *বাংলায় ইসলামের আর্বিভাব,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৮৯, অক্টোবর, ২০০৭

১৫. সম্পাদকীয় কলাম — *মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণ শিক্ষা প্রকল্প বাংলাদেশ, ইতিবাচক ও উদ্যোগে পৃষ্ঠপোষকতা জরুরি,* নয়া দিগন্ত, বর্ষ ৪, সংখ্য ৩৪৪, ২০০৮

১৬. আব্দুল আওয়াল ঠাকুর — *মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণ শিক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়ন জরুরি,* দৈনিক ইনকিলাব, ১০/১১/২০০৮

১৭. মুফতী এনায়েত উল্লাহ্ — *মহানবীর সমাজ বিপ্লব,* *দৈনিক সমকাল*, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩৩৩, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

১৮. ড. মুহাম্মদ রইসুদ্দীন — *দূর্নীতি মুক্ত সমাজগঠনে ইসলামী শিক্ষার ভূমিকা,* সাপ্তাহিক আরাফাত, বিশেষ সংখ্যা, জুন, ২০০৭

১৯. Shah Abdul Hannan — ***Islamic Education, Movement Recemt history and objectives.*** The Guardian, December-2003, Dhaka.

২০. ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও ড. মোঃ ছানাউল্লাহ্ — *দূর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের আদর্শ:প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ,* দি ঢাকা ইউনিভারসিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, বর্ষ-২, সংখ্যা-১, জানু-জুন, ২০০৮ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২১. ড. মোঃ শামসুল আলম — *মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামের আদর্শ,* দি ঢাকা ইউনিভারসিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ, বর্ষ-২, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৮, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository